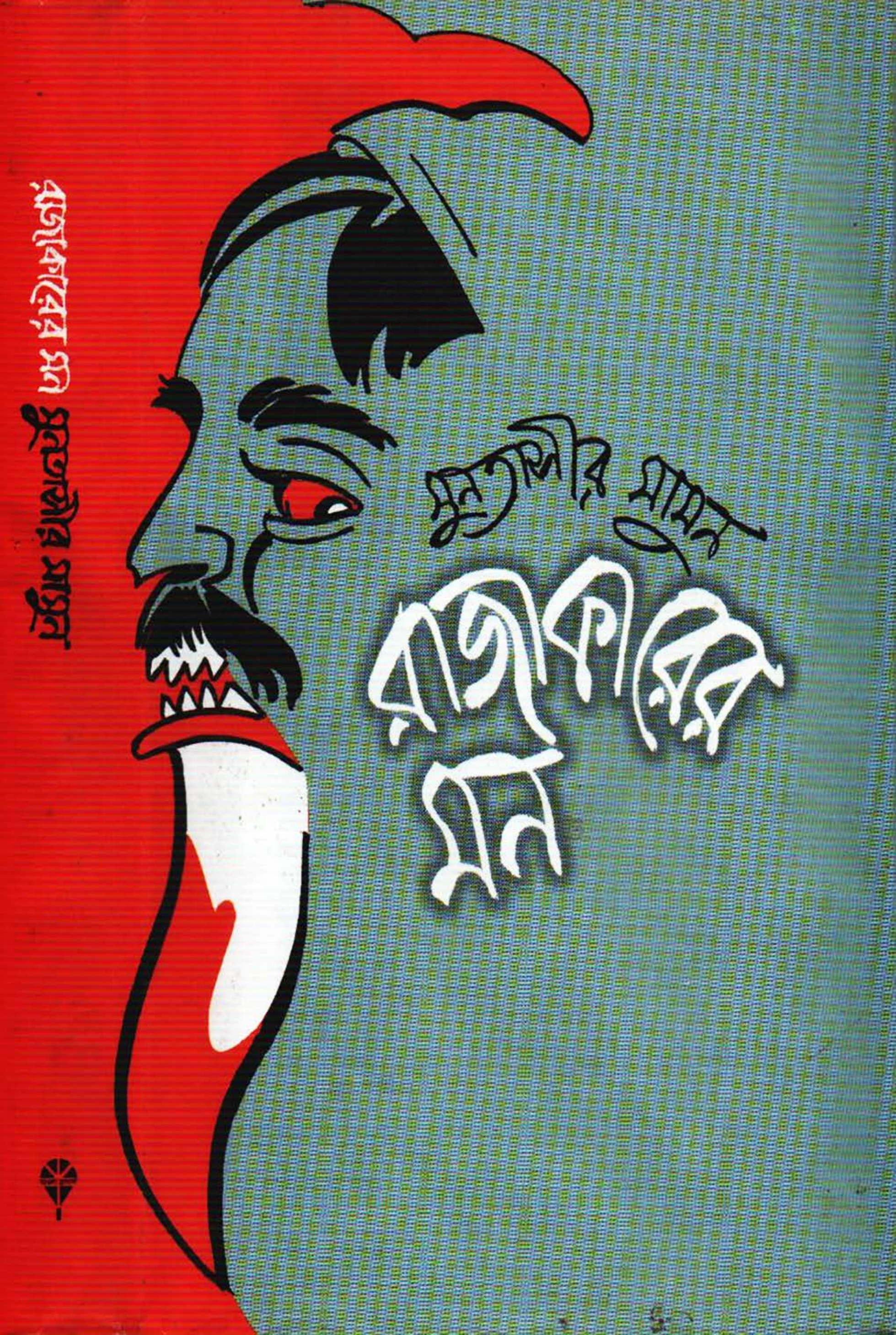
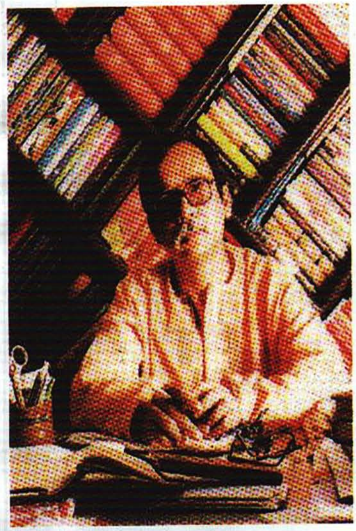

মুনতাসীর মামুন
রাজাকারের মন
রাজাকারের মন মুনতাসীর মামুন

রাজাকার বলে সম্বোধন করি আমরা অনেককে, বুঝিও যে কে রাজাকার বা কে রাজাকার নয়। কিন্তু, রাজাকারের মন কেমন তা নিয়ে কখনও ভাবিনি। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন রাজাকারদের রচনা দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন রাজাকারের মন, তাদের ভাবনা-চিন্তা, দর্শন। দেখিয়েছেন তারা কীভাবে কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটায় আর কীভাবেই বা সাধারণের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট থাকে। রাজাকারের মনোজগৎ নিয়ে বাংলাভাষায় এর আগে এত চমৎকার বিশ্লেষণ আর কোনো লেখক করেননি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গত তিন দশকে নানা ধরনের বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী দু'পক্ষ প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। বিশ্লেষণপূর্ণ কোনো রচনা রচিত হয়নি তাদের নিয়ে। ড. মুনতাসীর মামুন রাজাকার হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসায়েন, মুসলিম লীগ নেতা আয়েনউদ্দিন, শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে মুক্ত খালেক মজুমদার, জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান প্রমুখের আত্মজীবনী ভিত্তি করে ও অন্যান্য প্রামাণ্য দলিলপত্রের সাহায্যে রচনা করেছেন *রাজাকারের মন।*

এই গ্রন্থ শুধু গবেষক নয়, বাঙালিমাত্রেরই পড়া উচিত। কারণ এতে বিধৃত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চর্চায় *রাজাকারের মন* যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা।

ISBN 984 410 168 9



মুনতাসীর মামুন

জন্ম : ১৯৫১ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম. এ., পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। লেখালেখি করছেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ছাত্রজীবনে জড়িত ছিলেন ছাত্র আন্দোলনে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিটি সংস্কৃতি ও গণআন্দোলনে। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম ডাকসু নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক। একই সময়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি। তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় 'ডাকসু'র মুখপত্র 'ছাত্রবার্তা'। এ ছাড়া বাংলাদেশ লেখক শিবির ও বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও যথাক্রমে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুগ্ম সম্পাদক। ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তিনিও একজন। এ ছাড়াও তিনি জড়িত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

বাংলাদেশের লেখালেখির জগতে মুনতাসীর মামুন একটি বিশিষ্ট নাম। গল্প, কিশোরসাহিত্য, প্রবন্ধ, গবেষণা, চিত্র-সমালোচনা, অনুবাদ ইত্যাদিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সেই সাথে রাজনৈতিক ভাষ্যে অর্জন করেছেন বিশেষ খ্যাতি। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, ড. হিলালী স্বর্ণপদক পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৩) ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত।

স্ত্রী ফাতেমা মামুন একজন ব্যাংকার।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স



দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন ২০০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স্ লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 177 8

RAJAKARER MON (Perception of War collaborator's) by Muntassir Mamoon. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Quyyum Chowdhury. Price : Taka Two Hundred Only.

উৎসর্গ

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাথীদের

# ভূমিকা

রাজাকারের মন নিয়ে লেখার ইচ্ছে অনেক দিনের। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। সে সময় রাজাকারদের লেখা বেশ কিছু বইপত্রও সংগ্রহ করি। কিন্তু লিখব লিখব করে আর লেখা হয়ে উঠছিল না। গত বছর, 'দৈনিক জনকণ্ঠ' কিছু লেখার তাগিদ দিলে, হঠাৎ একদিন বইপত্তর গুছিয়ে বসি এবং লিখতে শুরু করি। একটানা সপ্তাহখানেক লিখে রচনাটি শেষ করি। এ রচনায় অনেক দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে। এর কারণ, এক, এসব বই এখন দুষ্প্রাপ্য; দুই, রাজাকারের মন কীভাবে কাজ করে তা তাদের লেখা পড়লে বোঝা সহজ হয়।

'জনকণ্ঠ'-এ রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই পাঠকরা যে আগ্রহ দেখান তা ছিল আমার ধারণার বাইরে। তাঁরা অনেক তথ্য ও বইয়ের সন্ধান দেন। যেমন, প্রকৌশলী গাজী শাহজাহান আমাকে পাঠিয়ে দেন সাজ্জাদ হোসায়েন-এর 'একাত্তরের স্মৃতি'। আমার সহকর্মী আবু মোঃ দেলওয়ার হোসেন সাদি আহমদের বইটির শুধু খোঁজ-ই নয়, জোগাড় করেও দিয়েছিলেন। নতুন এসব বই ও তথ্যের ভিত্তিতে পুরো রচনাটি পরিমার্জন করেছি। ফলে এর আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এ রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর, উল্লেখ করেছি, অনেকেই শুধু আগ্রহ নয় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ' পাতার আতাউর রহমান ও চন্দন সরকার যত্ন করে তা ছেপেছেন। আমি উপর্যুক্ত সবাইকে ও জনকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে উপদেষ্টা সম্পাদক জনাব তোয়াব খানকে ধন্যবাদ জানাই।

**মুনতাসীর মামুন**

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১.১.২০০০

# ১

'রাজাকার','দালাল', যোগসাজশকারী বা 'কোলাবরেটর', 'আল-বদর', 'আল-শামস' শব্দগুলির সঙ্গে ১৯৭১ সালের আগে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। দালাল শব্দটির সঙ্গে অবশ্য পরিচয় বাঙালির অনেক দিনের। তবে, ১৯৭১ সালে 'দালাল' বা 'দালালি' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন গ্রুপের গঠন, গ্রুপের সদস্যদের মন-মানসিকতার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে শব্দগুলির।

১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল কে? ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দালাল অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস অর্ডার ১৯৭২' জারি করা হয়। এতে দালাল বা যোগসাজশকারী বা কোলাবরেটরদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে—

"১। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা, সহযোগীতা বা সমর্থন করা।

২। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার পাকবাহিনীকে বস্তুগত সহযোগীতা প্রদান বা কোন কথা, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধমে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করা।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের চেষ্টা করা।

৪। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫। পাকবাহিনীর অনুকূলে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রচারনায় অংশ নেয়া এবং পাকবাহিনীর কোন প্রতিনিধি, দল বা কমিটির সদস্য হওয়া। হানাদারদের আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ নেয়া।"

উল্লিখিত সমস্ত গ্রুপই এর আওতায় পড়ে। যে অর্থে রাজাকার, কোলাবরেটর, আল-বদর বা পাকিস্তানপন্থী—সবাইকেই দালাল বলা হয়।

রাজাকার বাহিনী বা রাজাকারদের সংগঠন করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালে জুন মাসে রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে, রাজাকার বাহিনীর তিনিই স্রষ্টা। তারা যথেষ্ট খেদমত করেছে পাকিস্তানী বাহিনীকে, যে কারণে তাঁর বইটি তিনি তাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছেন।

আল-বদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পরপরই এটি গঠিত হয়। তবে, রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোন আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু, পাকিস্তানী বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। আল-বদর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ হানাদার বাহিনীই যুগিয়েছে। রাও ফরমান আলির নোটে আল-বদরদের উল্লেখ আছে। অবশ্য, সরকারিভাবে পাকিস্তানী বাহিনী তা অস্বীকার করেছে। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন বর্তমান জামায়াত ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তারা 'আল-বদর দিবস' পালন করে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নিজামী 'দৈনিক সংগ্রাম'-এ আলবদর বাহিনী সম্পর্কে লেখেন—

"...আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল-বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের সেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল-বদরের তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ, সেই সর্বগুণাবলী আমরা দেখতে পাব।"

"পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আল-বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম। তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।"

রাজাকারদের সঙ্গে আল-বদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে,

লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে, কিন্তু, আল-বদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিকেশ করে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা অনুধাবন করেছিল, যে ধরনের শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধতো ছিল একটি আদর্শগত লড়াইও। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাদেশ তত্ত্বে বিশ্বাসী যা পরে প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে। দালালরা ছিল পাকিস্তান তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তাদেরও বিভিন্ন পর্যায় ছিল। রাজাকারদের মন-মানসিকতা বুঝতে হলে পাকিস্তান তত্ত্ব বা প্রত্যয় এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ের খানিকটা ব্যাখ্যা দরকার। তা হলে বুঝতে পারব, কারা দালালি করেছে, কেন করেছে?

বাকি রইল আল-শামস। এরা আল-বদর ধরনেরই আরেকটি স্কোয়াড। হত্যাই ছিল যাদের মুল লক্ষ্য।

## ২

এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একধরনের স্বাতন্ত্র্য বোধ কাজ করেছে সেই ষষ্ঠ শতক থেকেই। ১৯৪৭-এর আগে এই আঞ্চলিকতা বোধ রূপান্তরিত হতে থাকে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদে। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বাঙালি হলেও আগে মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল। গত শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রদায় হিসেবে সে ছিল অধস্তন। একজন বর্ণহিন্দু একজন শূদ্রের সঙ্গে যে ব্যবহার করে একজন মুসলমানের সঙ্গেও সে ব্যবহারে কোন তারতম্য ছিল না।

আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন একটি প্রবন্ধে বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"মুসলমানদের এই পৃথক পরিচয় দাবি বাহ্যত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমাজ-পরিবেশে একটি প্রান্তিকীকৃত (marginalised) অর্থাৎ ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এর ফলে, উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জনসংখ্যার অবস্থানগত বাস্তবতা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে

পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে হিন্দুরা ছিল প্রায় সকল সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং মুসলমানরা ছিল ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়েছিল। মুসলিম লীগ ছিল নেতৃত্বে। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে বাঙালি মুসলিম লীগ নেতারা ছিল অধস্তন। অন্যদিকে, বাঙালি হিন্দুদের দেশত্যাগ বেশ একটা বড়সংখ্যক বাঙালি মুসলমানকে সুযোগ করে দিয়েছিল সম্পদের ভিত্তি গড়ার। রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল যাদের সুবিধাটি তারাই পেয়েছিল। এভাবে আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কায়েমি স্বার্থ। তবে, পাকিস্তানী আদর্শকে সামনে রেখে অর্থাৎ ধর্মকে ব্যবহার করে 'ইসলামপন্থী' বেশ কিছু দলের সৃষ্টি হয়, যেমন—জামায়াত ইসলাম, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি। মুসলিম লীগের সঙ্গে এদের লড়াইটা ছিল আদর্শ থেকে ক্ষমতা করায়ত্তের।

এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতির প্রশ্নেই দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৭-এর পর থেকে, যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অর্থনীতি। মধ্যবিত্ত তো বটেই, সাধারণ বাঙালির প্রসারণের সুযোগই সংকুচিত হয়ে গেল। ফলে, সাংস্কৃতিক সত্তায় স্বাধীনতা ও প্রসারণের দাবিতে এগিয়ে এল পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরেই অন্যান্য দল, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রধান।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সবসময় ইসলামকেই শোষণ ও কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। শাসকদের বিরদ্ধে কোন প্রতিবাদ হলেই তা দেখা হতো ইসলামদ্রোহী হিসেবে। সমীকরণটি ছিল এরকম—ইসলামের বিরোধিতা মানে ভারতকে সমর্থন। ইসলামের প্রতীক পাকিস্তান, হিন্দুত্বের প্রতীক ভারত। পাকিস্তানী শাসকদের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে হিন্দুত্ব সমর্থন। কেন্দ্রের অধস্তন বাঙালি সহযোগীরাও তা বিশ্বাস করত এবং প্রচার করত (যেমন মুসলিম লীগ, জামায়াত)। অধস্তন হলেও তারা তৃপ্তি পেত এই ভেবে যে, তারাও ক্ষমতার সহযোগী, কখনও কখনও অংশীদার এবং সে সুযোগে অর্থনৈতিক উপায়েরও সুবিধাভোগী। তবে, তাদের সবাই অর্থনৈতিক সুবিধার অংশীদার ছিল তা নয়, কিন্তু মনোজগতে যে আধিপত্য সৃষ্টি করেছিল দল তা ভাঙা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তান প্রত্যয়ে নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হলো। ধর্ম ছাড়াও শাসনের উপাদান হিসেবে যুক্ত হলো আমলা, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য। এর অর্থ, আমলাতন্ত্র, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্র কর্তৃক সিভিলসমাজ ও রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ লুটের প্রক্রিয়ায়

অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ করে পাকিস্তানবিরোধী)। এ আদর্শ, আরো অনেক বাঙালিকে যুক্ত করতে পেরেছিল শাসকদের সঙ্গে।

এই সামগ্রিক বঞ্চনার আবেগ পাকিস্তানের পরিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মনে সেই পুরনো আঞ্চলিকতার রেশ ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ একটি একক যা বাংলাদেশ। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা বা স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা তারই প্রতিফলন। ছয় দফা প্রত্যাখ্যাত হলে সৃষ্টি করা হয় 'পাকিস্তান'-এর বিপরীতে সোনার বাংলা মিথ। আঞ্চলিকতা বোধ উত্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্ন মেনে নিতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে সোনার বাংলা শ্মশান কেন? লিখেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর—"এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্গঠিত হয়েছে ইতিহাসের দিক থেকে মৌল এবং স্থায়ী এক প্রতিরোধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের মধ্যে। সোনার বাংলার এই নির্মাণের ফলে পাকিস্তানের কেবল কথা বলার অধিকার আছে এবং পূর্ব বাংলা/পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ কেবল নীরব, স্তব্ধ, মৌন, এই ধারণা যায় বদলে। এটি বদলে দেয় পরিস্থিতি এবং সাব অলটার্ন বাঙালিদের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করে দ্বৈরথের সম্মুখীন হয়ে, নিশ্চিতভাবেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস তত্ত্বের ভিত্তিতে।"

শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়। মানসিকভাবে বাঙালি প্রস্তুত হয়ে ওঠে দ্বৈরথের জন্য। অন্যদিকে, ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোজগতে পরিবর্তন আসা শুরু করলেও পাকিস্তান আদর্শের ধ্বজাধারীরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল মনোজগতে এবং কায়েমি স্বার্থ কেন্দ্রগুলিতে তাদের আধিপত্য কেউ ভাঙতে পারবে না, তা অটুট।

## ৩

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পাকিস্তান আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে বাংলাদেশ আদর্শ। পাকিস্তান আদর্শ যারা অটুট রাখতে চেয়েছিল তারা গুরুত্ব দেয় পেশিশক্তির ওপর। পরিণামে শুরু হয় তাদের ভাষায় 'গৃহযুদ্ধ'। বাংলাদেশ আদর্শের পতাকাবাহীদের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান আদর্শবাদীদের জন্য বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে যাঁরা নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা মানসিক কষ্টের শিকার

হলেও নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। তাঁরা মক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তান আদর্শের বিপর্যয় হিসেবেই দেখেছিলেন। কারণ, তাঁদের কাছে কখনও মনে হয়নি বাঙালি পরিচয়টি প্রথম, পাকিস্তানি পরিচয় আসে তার পরে।

রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা ফিরতে চায়নি। কারণ, পাকিস্তান আদর্শ ও কেন্দ্রের সেনাবাহিনীর শক্তি তাদের কাছে ছিল অজেয়। তাদের মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আদর্শ জয়ী হলে তাদের স্থান হবে বিপন্ন। যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতার অংশীদার বা কায়েমি স্বার্থের অংশীদার হয়েছিল সেটি থাকবে না। নতুন বাংলাদেশে তাদের স্থান থাকবে না। এরচেয়ে পাকিস্তানে অধস্তন হিসেবে ক্ষমতার সহযোগী হওয়া ছিল শ্রেয়। এখানে আদর্শ বা ধর্মের প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সেটি গৌণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কি মুসলমান ছিল না? বা ইসলামে বিশ্বাস করত না? তবে, ধর্মটিকে ঢাল হিসেবে রাখা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। তারা যা করেছে তা কি ইসলামি আদর্শে অনুমোদিত? ফলে, অস্তিত্বরক্ষার জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা করার করেছে। ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সাধারণ আল-বদরের মতো অস্ত্রহাতে ঘোরা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। ফলে, যার যার অবস্থান থেকে সে সে কাজ করে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানী দালালদের, দালালদের মধ্যে অবস্থাগত কারণে আবার বিভিন্ন গ্রুপের। এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জামায়াত ইসলাম ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘ। পাকিস্তানের অ্যাকাডেমিশিয়ান আব্বাস রশীদ 'পাকিস্তান মতাদর্শের পরিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন– "উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইউব খানের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সনাতনপন্থী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে, সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয় বরং তাদের স্থান ইতিমেধ্য দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামাত-ই ইসলামী। জামাত-ই ইসলামীর নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের কর্মী ও সদস্যরা শান্তিকমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট এই শান্তি বাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহ দমনে সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। আদর্শগত পর্যায়েও জামাত-ই ইসলামীর সমর্থন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ সামরিক বাহিনী স্বাগত জানিয়েছিল সর্বান্তকরণে।" তাই আমরা দেখি, আল-বদর ও আল-শামসদের মধ্যে জামায়াতের কর্মীই বেশি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের 'দৈনিক পাকিস্তানে'র সংবাদ অনুসারে "স্বাভাবিক

জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রচনাকারীদের দূরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।" এর সদস্যরা ছিল পাকিস্তান আদর্শের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এলিট, যারা অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে যায়নি। অন্যান্যের তুলনায় শান্তি কমিটির সদস্যরা ছিল বলা যেতে পারে 'নরমপন্থী'। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনায় বা অংশগ্রহণে তারা নিষ্ক্রিয় ছিলনা অনেক ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন পেশায় বা পদে থেকে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সেই সময়, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'কোলাবরেটর' হিসেবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন।

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজাকার'- ফারসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দরাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছিল রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী— "প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙ্গালী হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়তঃ গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়— এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়েই গঠিত হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী। আবু সাইয়িদ তাঁর 'সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আজম' গ্রন্থে জনৈক রাজাকারের পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছেন যেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

"This is to certify that Mr.Haroon-ur-Rashid Khan, S/o. Abdul Azim Khan, 36, Purana Paltan Lane, Dacca-2 is our

active worker. He is true Pakistani and dependable. He is trained Razakar. He has been issued a Rifle No-776 ... with ten round ammunition for self-protection.

Sd/- illegible
IN CHARGE
RAZAZKAR AND MUZAHID
JAMAT-E-ISLAM
91/92, Siddique Bazar, Dacca."

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

আবু সাইয়িদ জানাচ্ছেন, আল-বদর বাহিনীর গঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। "জামালপুর মহকুমায় আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান। .... আগষ্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।"

২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। জানাচ্ছেন সাইয়িদ, "এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একসিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আফরাফুজ্জামান সহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আল-বদর কমান্ডাররা অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মসলিশের শুরার সদস্য সামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল—

১। মোস্তফা শওকত ইমরান। ২। নূর মোহাম্মদ মল্লিক। ৩। এ. কে. মোহাম্মদ আলী। ৪। আবু মোঃ জাহাঙ্গীর। ৫। আশরাফুজ্জামান। ৬। আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস। ৭। সর্দার আবদুস সালাম।"

আল-বদরদের কার্যকলাপ সুবিদিত। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এভাবে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে।

## ৪

১৯৭১ সালেতো বটেই, তারপর তিনদশক পর্যন্ত, এ দেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি কীভাবে কাজ করে বা মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে সে ব্যাপারে গভীরভাবে কেউ চিন্তা করেছেন বলে জানি না।

আগেই উল্লেখ করেছি মুক্তিযুদ্ধের বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা স্বায়ত্ত-শাসনেরও বিরোধিতা করেছেন অনেকে ১৯৭১ সালের আগে। ঐ বিরোধিতা, যুক্তির খাতিরে অগ্রহণযোগ্য এমন বলা যাবে না। কিন্তু, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর এবং স্বাধীনতার পর এ যুক্তি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংবিধানের প্রথম পাতাতেই লেখা আছে—

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের (সংশোধিত পাঠ) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

এরপর স্বাধীনতাসংক্রান্ত কোন বিষয় আদালতের এখতিয়ারে পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু, বাংলাদেশ যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ সেহেতু এখানে এর উল্টোটাই ঘটেছে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতাপক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি আছে। এ প্রশ্ন অবশ্যই অনেকে করতে পারেন যে, স্বাধীনতালাভের পর একটি দেশে আবার স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হয় কীভাবে? পৃথিবীতে, এদেশেই একমাত্র সরকার ও বিরোধীদল একই সঙ্গে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির সঙ্গে নমনীয় ব্যবহার করে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতার বিপক্ষের পত্রিকাসমূহ অবাধে প্রকাশিত হয় এবং স্বাধীনতার বিপক্ষীয়রা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্‌গার করে যেতে পারছে। আলোচিত গ্রন্থসমূহ এর একটি উদাহরণ মাত্র।

শুধু তাই নয়, প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ পর্বের পাকিস্তান প্রত্যয়ের বিভিন্ন উপাদান আবার যুক্ত হচ্ছে রাজনীতিতে। বাংলাদেশ আদর্শের বিপরীতে সে বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। এই আদর্শের নাম দেয়া যেতে পারে পাক-বাংলা আদর্শ। এ আদর্শের যারা ধারক তাদের বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু, বাংলাদেশ আদর্শ তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না হীনম্মন্যতার কারণে। কায়েমি স্বার্থ যা সৃষ্টি হয়েছে গত ত্রিশ বছরে তা বজায় রাখতে গেলেও পাক-বাংলা আদর্শ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর প্রধান উপাদান পাকিস্তানে বিশ্বাস, ভারতকে ইহজগতের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা কিন্তু ভারতকে গোপনে সুযোগ দেয়া, ইসলাম ধর্মকে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে ব্যবহার করা, সামরিক আধিপত্যে বিশ্বাস ইত্যাদি। এই আদর্শের স্রষ্টা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা।

এদের পুনর্বাসিত করে জিয়াউর রহমান এই আদর্শের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন, পরে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তাঁকে অনুসরণ করেন। এঁরা এসব উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করেন কাকুল কালচার। কাকুলে যৌবনে তারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং তা মগজে গেঁথে গিয়েছিল। সেটিরও আবার ক্লোন তৈরিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। পাকিস্তান আদর্শের স্রষ্টাদের অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের দলে নতুন ক্লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ক্লোনরা যে সবাই সে আদর্শে বিশ্বাসী তা নয়। তারা বিশ্বাসী কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখা, স্বার্থের নতুন মানচিত্র তৈরি করায়।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানী অ্যাকাডেমিশিয়ান পারভেজ আলীরালী হুদোভয় ও আবদুল হামিদ নায়ার 'পাকিস্তানের ইতিহাস পুনর্লিখন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন– "দেশ বিভাগের ৩০ বছর পর পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুনর্জাগরণে এটাই প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়, রাজনৈতিক মতলববাজিই এখানে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের চিরস্থায়ী সামরিকীকরণের জন্য চাই একজন চিরস্থায়ী শত্রু। অনেক কারণেই পাকিস্তানের অন্যান্য প্রতিবেশীরা এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। অপরদিকে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকবর্গ এই পারস্পরিক শত্রুতা ও উত্তেজনাকে একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখে আসছে।"

এখানে সৃষ্ট পাকি ক্লোনরা ঠিক একই কাজ করছে কিনা সচেতন নাগরিক মাত্রই তা বিচার করতে পারবেন। গত বিশ বছরে এ দেশে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিই এর প্রমাণ।

এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হলে হয়তো কিছু জানা যেত। কিন্তু হয়নি এবং তথ্যের স্বল্পতাও লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করা এখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরাই এগুলি নষ্ট করে ফেলেছে বা ফেলছে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর পর, এ. এস. এম. শামসুল আরেফিন 'রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা' প্রণয়ন করেছেন যার প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা-বিরোধী যাঁরা আত্মজীবনী লিখেছেন এবং এখন পাক-বাংলা আদর্শের হয়ে কাজ করছেন তাঁদের গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ যার নাম—'রাজাকারের মন' বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, 'রাজাকারের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ'। সরল ভাষায়, একজন রাজাকার বা স্বাধীনতাবিরোধী কীভাবে বিচার করেছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বা বাংলাদেশ ? সে কি এখনও বিশ্বাস করে বাংলাদেশে ? তার গ্রন্থে সত্যের ভাগ কতটুকু ? কিইবা তারা লিখেছেন বা অধিকাংশই কেন লেখেননি, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এ গ্রন্থে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যাদের বই আলোচনা করেছি তাদের কেউ ছিল কোলাবরেটর, কেউ আল-বদর বা অন্যকিছু। কিন্তু আগেই বলেছি কাগজপত্রে বিভিন্ন বিভাগ থাকলেও মূলত এরা সব একই লক্ষ্যের অনুসারী। এই বিভাজন বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করতে পারে মাঝে মাঝে। আরেফিন নিজেও এ সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থ লিখতে গিয়ে। লিখেছেন তিনি—

"বিভিন্ন পরিচয়ে এদের ভাগে ভাগে না দেখিয়ে গড়পরতা সবাইকে 'দালাল' পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রয়াসের পেছনে একটা কারণও রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ যেটি তা হল, যে সব সরকারী কাগজের আলোকে এই তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে সেই সবের ছক অভিন্ন ছিল না। কোথাও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অপরাধের কারণ সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কোথাও শুধু বলা হয়েছে কোলাবরেটর অথবা দালাল অথবা পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী। কোন কোন তালিকায় তাদের পরিচয় এরূপও রয়েছে যে, "Arrested Razakars, All-Badars and Mujahids' অথবা, 'Arrested on as they were either members of Razakars, Al-Badars, Al-Shams or Mujahid organisation and also supported the Pak Army in killing innocent public, looting, arson etc."

এ পরিপ্রেক্ষিতে এক কথায়, মোটাদাগে স্বাধীনতাবিরোধীদের আমি 'রাজাকার' নামে অভিহিত করেছি। রাজাকার, আগেই উল্লেখ করেছি, যারা বাংলাদেশে ছিল এবং মানুষ এই নাম ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত। জাহানারা ইমামের 'ঘাতক দালাল নির্মূল' আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি আরো পরিচিত হয়ে সাধারণের ভাষ্যে চলে আসে। হুমায়ূন আহমেদের একটি নাটকের সংলাপ ছিল—'তুই রাজাকার'। এসব কারণে, স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি সে আলবদরই হোক বা দালালই হোক পরিচিত হয়ে ওঠে রাজাকার হিসেবে। জামায়াত ইসলাম, বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম অবশ্য সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা 'রাজাকার' ছিলেন না, ছিলেন 'রেজাকার'। হতে পারে রেজাকার শুদ্ধ, কিন্তু মানুষের কাছে অশুদ্ধ রাজাকারই পরিচিত। তাই আমিও রেজাকার-কে রাজাকারই লিখলাম।

## ৫

ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনীর গুরুত্ব অস্বীকার করা হয় না। তবে, উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার আগে সামগ্রিকভাবে তার বিচার বিশ্লেষণ

করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে লুসিয়েন গোল্ডম্যানের মন্তব্য অনুসরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, এই ধরনের রচনার অন্য একটি দিক আছে। তা হলো এই ধরনের রচনার মাধ্যমে আমরা কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social trait) জানতে পারি। আমরা জানতে পারি, লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থান নির্ধারণ করতে পারলেই একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক চালচলন, মূল্যবোধ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি রাজাকারদের আত্মজীবনীগুলি বিচার করেছি এবং গ্রহণ করেছি একটি সহজ পদ্ধতি। দেখাতে চেয়েছি লেখক কীভাবে ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করেছেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তা যথার্থ কি না সে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। যা সত্য নয় তা বলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, রাজাকাররা বিরোধীদের সম্পর্কে অতিরঞ্জন বা সত্য নয় এমন বক্তব্য রাখলেও নিজের সহযোগীদের সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক তথ্য দিয়েছেন। এদের বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ তেমন নেই হেতু এ বর্ণনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

আগেই উল্লেখ করেছি এ ধরনের বইয়ের সংখ্যা খুব কম। আমি যে-ক'টি বই সংগ্রহ করে আলোচনা করছি সেগুলি হলো—

১. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *দি ওয়েসটেস অফ টাইম, রিফ্লেকশন অন দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ ইস্ট পাকিস্তান*, নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

২. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *একাত্তরের স্মৃতি*, নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩।

৩. হামিদুল হক চৌধুরী, *মেমোয়ার্স*, হামিদ হালিমা ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৮৯।

৪. এ. কে. এম. এ. খালেক মজুমদার, *শিকল পরা দিনগুলো*, ১ম ও ২য় খণ্ড (প্রকাশনায় ঃ সাজ্জাদ খালেদ মুরাদ), ঢাকা, ১৯৮৫।

৫. মুহাম্মদ আয়েন উদ-দীন, *স্বদেশ সময় ও রাজনীতি*, (লেখকই প্রকাশক), ঢাকা, ১৯৯০।

৬. কে. এস. আমিনুল হক, *আমি আলবদর বলছি*। (প্রকাশক লেখক নিজে), কিশোরগঞ্জ, ১৯৮৮।

৭. সা'দ আহমেদ, *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাত'শ দিন*, (বেগম রিজিয়া সা'দ কতৃক প্রকাশিত), কুষ্টিয়া, ১৯৯০।

৮. আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, মাসুম পাবলিকেশন্‌স্‌, ঢাকা, ১৯৭৬।

৯. ডাঃ আবদুল বাসেত, '*গায়ের নাম মিঠাখালী*', '*হৃদয় আমার কাঁদেরে*', '*চক্রবৎ পরিবর্তনান্তে*', ঢাকা, ১৯৭৬।

## ৬

খুব সম্ভব আশির দশকের কোন এক সময়, মেডিকেল কলেজসংলগ্ন একটি ব্যাংকে গেছি। ম্যানেজার সাগ্রহে স্যুট-পরা এত ভদলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন। ঐ ভদ্রলোকের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন,

'ইনি সাজ্জাদ হোসায়েন।'

'কোন সাজ্জাদ হোসায়েন?' জিজ্ঞেস করি আমি।

'ঐ যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন।'

সাজ্জাদ হোসায়েন স্মিতমুখে আমার দিকে তাকিয়ে। না, আমি সালামও দিইনি, করমর্দনের জন্য হাতও বাড়াইনি। শুধু বললাম, 'ও'। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম।

সাজ্জাদ হোসায়েন নামটা শোনামাত্র আমার ক্রোধ হচ্ছিল। আরও মনে পড়ল, বেয়নেটবিদ্ধ হবার পর ঘরে এসে নাকি তিনি বলেছিলেন, 'একটি আদর্শের জন্য এতগুলি লোক প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, আর পাকিস্তানের জন্য সাতটি লোকও এগিয়ে আসতে পারে না?'

এই হলো সাজ্জাদ হোসায়েন যিনি হয়ত আজকের প্রজন্মের কাছে অপরিচিত। কিন্তু, আমাদের বা আমাদের আগের জেনারেশনের কাছে ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন একটি পরিচিত নাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান ছিলেন, রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। কিন্তু সেসব খ্যাতি ছাপিয়ে উঠেছে যে, তিনি একজন রাজাকার ছিলেন।

তাঁর কৃত অপরাধের জন্য বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল কঠিন। কিন্তু বেঁচে তো তিনি ছিলেনই এবং বাকি জীবনটা বিদেশে এবং দেশে বাংলাদেশের বিরোধিতা করেই কাটিয়েছেন। যদি ১৯৭১ সালের পর তাঁর কর্মকাণ্ড অব্যাহত না থাকত, অনুতপ্ত হতেন কৃতকর্মের জন্য তা হলে এ প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন হতো না। এবং যখন দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে তখন পুরনো ছাত্র হিসেবে হয়ত সালামও দিতাম। কিন্তু কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত তিনি হননি। সাজ্জাদ হোসায়েন যে তাঁর কৃতকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত ছিলেন না তার প্রমাণ বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা স্মৃতিচারণমূলক দু'টি গ্রন্থ– *একাত্তরের স্মৃতি* ও *দি ওয়েসটেস অফ টাইম*। দু'টি গ্রন্থেরই মূল বক্তব্য একই রকম তবে পরিকল্পনায় ভিন্নতা আছে। *একাত্তরের স্মৃতি*–তে ১৯৭১-৭২ সালের ঘটনাবলী প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যটিতে ১৯৭১-৭২ সময়কাল ছাড়াও তাঁর জীবনের নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজি গ্রন্থটি যেহেতু বিস্তারিত সেহেতু আমার রচনার মূল ভিত্তি হবে সেটি, তবে ইংরেজিতে যা নেই কিন্তু বাংলায় আছে তা উল্লেখ করা হবে।

প্রথমেই দেখুন কীভাবে তিনি ইংরেজি বইয়ের নামকরণ করেছেন। এর বাংলা কী হবে? 'সময়ের অপচয়'? তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে, ১৯৭১ সালটিকে (এবং ব্যাপক অর্থে স্বাধীনতার সময়কে) তিনি সময়ের অপচয় মনে করছেন। কারণ, তাঁর স্মৃতিকাহিনী মূলত ১৯৭১ সাল ও তাঁর কারাজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। মুক্তিযুদ্ধকে যিনি সময়ের অপচয় মনে করেন তাঁর মনোভঙ্গি বিশ্লেষণের খুব একটা দরকার পড়ে না।

বইটির পাতায় পাতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তিনি এমন বক্তব্যও রেখেছেন যা রাজাকার শিরোমণি গোলাম আযম বা আল-বদর নেতা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৭১ সালের পর প্রকাশ্যে রাখেননি। প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ সময়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকরাও তা করেননি। জ্ঞানপাপী যে সমাজের জন্য কত বিপজ্জনক তার একটি উদাহরণ প্রয়াত ডঃ হোসায়েন।

রাজাকারের মন বোঝার জন্য ব্যক্তির গড়ে ওঠার পরিবেশটিও বিশ্লেষণ করা দরকার। সাজ্জাদ হোসায়েনের জন্ম ১৯২০ সালে যশোরে। তাঁরা নিজেদের দাবি করেন মীরপুরের ফকির শাহ আলী বোগদাদীর বংশধর হিসেবে। হোসায়েন ঢাকা হাই মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থেকে ১৯৪১ ও ৪২ সালে অনার্স ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কলেজ জীবনে শিক্ষকতা শুরু, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন ১৯৪৮ সালে। ১৯৬৯ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি দালালি করার জন্য জাতিসংঘে যান, বক্তৃতা বিবৃতি দেন এবং অনুমান করা হয় যে, অনেক শিক্ষকের নিগ্রহের জন্যও তিনি দায়ী। ১৯৭১ সালে গ্রেফতার হন কিন্তু মুক্তি পান ১৯৭৩ সালে। সে থেকে ১৯৯৫ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরোধিতা করে গেছেন। বিশেষ করে এই সময়টিতে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছেন।

ছাত্রজীবনে সাজ্জাদ হোসায়েন 'কায়েদে আজম'-এর ভক্ত ছিলেন। সমর্থক ছিলেন দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগের। সেটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু হাই মাদ্রাসা থেকে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা এবং ১৯৫০ সালে পিএইচ ডি করার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া তাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। বৈশাখের খরতাপে তিনি স্যুট পড়তেন, হাতে থাকত ছাতি। কাঁটাচামচে খেতেন, যেন, ইংল্যান্ডেই আছেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন তাঁর "কঠোর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড কিন্তু তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও কঠোর ব্যক্তিত্বের নিচে কারো টুঁ শব্দ করার সাহস ছিল

না।" নিষ্ঠুর আচরণ করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। সায়ীদ লিখেছেন, "তার দেশ, সমাজ ও সাহিত্য মানদণ্ড সবকিছুই ছিল অপরিবর্তনীয় ও অনড়। কেবল শিল্প-সাহিত্যের বিষয়ে নয়, কোন কিছু একবার বোধের ভেতর গৃহীত হয়ে গেলে তিনি আর তাকে পাল্টাতে পারতেন না।" গভীরভাবে ছিলেন তিনি ধর্মে বিশ্বাসী, অন্যদিকে ব্রিটিশভক্তিতে ছিলেন আবার অবিচল। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব ও উদারনৈতিক ইংরেজি শিক্ষার দ্বন্দ্ব তিনি কখনোই ঘোচাতে পারেননি এবং এই দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে বৈপরীত্য, জটিলতা, সংঘাত সৃষ্টি করে তাকে যান্ত্রিক নিষ্ঠুর মানুষ করে তুলেছিল। পাকিস্তানের প্রতি অবিচল আনুগত্য ছাড়া আর কোনকিছুতেই তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন বলে মনে হয় না। অন্তত তাঁর বই পড়ে সেই ধারণাই হয়। কিন্তু, পাকিস্তানে কখনও বসবাস করতে যাননি। এ অঞ্চলের এলিটমহলে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন অর্থাৎ সুবিধা তা আবার ত্যাগ করতে তিনি চাননি। ১৯৭১ সালে যে পাকিস্তান সরকার তাঁকে অনুগৃহীত করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে এবং বিদেশ পাঠিয়েছিল—এটিই ছিল তাঁর জীবনের পরম পাওয়া। এই স্বীকৃতির জন্যই আজীবন তিনি 'বাংলাদেশ' প্রত্যয়ের বিরোধিতা করে গেছেন। একেকটি বিষয়ে একেকজনের বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু প্রায় পুরো জাতি যখন একদিকে বা যখন ১৯৭১ ঘটে তখন সে বিশ্বাসে অবিচল থাকা প্রশংসনীয় কোন ব্যাপার নয় এবং মানুষহত্যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকাও কোন ধর্মবোধের ব্যাপার নয়। এটি হয়ে ওঠে ক্ষমতা অর্জন ও ব্যবহারে তৃপ্তি তা যে কোন প্রকারেই হোক—এটিই রাজাকারদের মূল বিষয়। রাজাকাররা সবসময় ক্ষমতাবান বা অস্ত্রধারীদের পক্ষাবলম্বন করে। আর কৈশোর যৌবনের মাদ্রাসাশিক্ষা তাতে একরকম অন্ধতা যোগায়, অনড় এবং হিংস্র করে তোলে কোন কোন বিষয়ে।

ইংরেজি এবং বাংলা বইয়ের শুরুটা দুই রকম। বাংলা বই শুরু করেছেন তিনি রাজশাহীর ঘটনাবলী দিয়ে। তখন তিনি ছিলেন সেখানে উপাচার্য। ইংরেজি বই শুরু করেছেন কীভাবে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে ধরে নিয়ে বেয়নেটের আঘাতে ধরাশায়ী করে চলে গেল তার বিবরণ দিয়ে। এরপর জেল জীবন ও সহযোগী রাজাকারদের চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে ভিন্ন ভঙ্গিতে। কিন্তু বক্তব্যের বিষয় একই।

এ অধ্যায়গুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজাকারদের মন-মানসিকতা বোঝার জন্য। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলি পাকিস্তান কেন ভেঙে গেল তা বিশ্লেষণ করেছেন নিজের অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে। আমি এ প্রবন্ধে আলোচনা শুরু করব তাঁর ইংরেজি বইয়ের শেষাংশ থেকে।

সাজ্জাদ হোসায়েন মনে করেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ষড়যন্ত্র করেছে তিনটি ক্ষেত্রে—সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই বেশি, যা পরে পরিণত হয়ে ওঠে আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনে। বাঙালিদের জাগরণের (তাঁর ভাষায় ষড়যন্ত্রের) কারণগুলি কিন্তু ঠিকই তিনি চিহ্নিত করেছেন।

প্রথমেই তিনি সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। হোসায়েন ঠিকই ধরেছেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নির্যাস ছিল ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনের মধ্যে। সেজন্য বারবার তিনি ভাষা আন্দোলনকে আক্রমণ করেছেন। লিখেছেন তিনি, আরবী ফার্সীটা আমাদের শেখা উচিত ছিল বা উচিত। কারণ, তা হলে ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ থাকে। বাঙালি এ ভাষা শেখেনি। ফলে, সে ঐতিহ্যচ্যুত হয়ে গেছে। যদি বাঙালি উর্দু লিখত তা হলেও বাঁচত, কারণ, উর্দু ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উনিশ শতকে যখন বাংলায় ইংরেজি ভাষা চালু হয় তখন মুসলমান সমাজের চিন্তাটাও ঠিক একই রকম ছিল। ঐ সময় ছিল যারা বুদ্ধিমান এবং পার্থিব সুবিধার আকাঙক্ষী তারা কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে তরিক্কি করেছিল। যে সাজ্জাদ হোসায়েন যুক্তি দিচ্ছেন এ শতকের নব্বই দশকে, সেই সাজ্জাদ হোসায়েন আরবী ফার্সী জানতেন বলে আমি শুনি নি। হয়তো জানতেন অল্পস্বল্প। মাদ্রাসায় যারা পড়ে তারা কি আরবী জানে, না আরবী হরফ মুখস্থ করে? হোসায়েন নিজে মাদ্রাসা পাশ করে এসে কিন্তু ঠিকই ইংরেজি পড়েছেন। আচার, আচরণে কৃষ্ণ সাহেব হয়েছেন, আমরা যাকে 'ইসলামি লেবাস' বলি তা পরতে তাঁকে দেখিনি কখনও।

তারপর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের কাহিনী।

সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে, জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা করলেন, উর্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে এবং কী দুঃসাহস! ছাত্ররা তার প্রতিবাদ করে। এই যে বেয়াদবি এবং এর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো নেওয়া হলোই না বরং বিভিন্ন স্তরে একে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। এ স্তরগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ভাষার দাবি মেনে নেয়া থেকে শহীদ মিনার নির্মাণ পর্যন্ত—সব ক'টি স্তরই ছিল সরকারের আত্মসমর্পণ। এরকম বিষয় অন্তিমে পরিণত হলো আন্দোলনে। ১৯৯৪ সালেও ডঃ হোসায়েন বুঝতে পারেন নি কেন ভাষা আন্দোলন হলো। তিনি আরো আশ্চর্য হয়েছেন এই ভেবে যে, জামায়াতী ইসলামীরাও সেই সময় ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। তিনি বোধহয় জানতেন না যে, গোলাম আযমকে জামায়াতীরা 'ভাষা সৈনিক' হিসেবে আখ্যা দেয়। এর কারণ, বৃহত্তর সমাজের কাছে এক ধরনের স্বীকৃতি লাভ করা।

পাকিস্তানতত্ত্ব বিষয়টিকে ক্যামোফ্লাজ করা। সাজ্জাদ হোসায়েন অবশ্য সে চেষ্টা করেননি।

ডঃ হোসায়েনের মতে, এ ছাড়া বিদেশী চক্রান্ত তো ছিলই। বিদেশী হলো ভারত যা হিন্দুঅধ্যুষিত। তাদের এজেন্টরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। তাদের মাধ্যমে ভারতীয়রা (প্রচারণা) বোঝাতে পেরেছিল যে, উর্দু জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হলে বাঙালি দাস হয়ে যাবে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, কিন্তু এ কারণে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা মনে করেনি যে তারা দাস হয়ে যাবে। এখানকার বুদ্ধিজীবীরা এই সাধারণ চক্রান্তটি বুঝতে পারেনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর ভাষায়—"A myth was concocted almost overnight about a conspiracy against the Bengali language." শুধু তাই নয়, ২১ ফেব্রুয়ারি কালক্রমে "evolved into a mystic cult, combining the appeal of the occult with the attraction of a romantic myth." *একাত্তরের স্মৃতি*-তে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন– "১৯৪৭ সালে যারা এক রকম জোর করে আমাদের বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে বাধ্য করে এবং যারা তাদের রাষ্ট্রের ঐক্য এবং সংহতির খাতিরে নির্দ্বিধায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে তারাই সেদিন আমাদের শিখিয়েছিলো যে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেললেই আমরা সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে রক্ষা পাবো। অথচ দিল্লীর শাসন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগ দেয়ার কথা কেউ বলেন নি।" কিন্তু কেন বলবেন ? তারাতো ঔপনিবেশিক নিগড়ে বাধা ছিলেন না। কিন্তু রাজাকারদের যুক্তির ধরনই একরকম। এসবও নাহয় একজনের যুক্তি হিসেবে মেনে নেয়া যেত। কিন্তু, এই লোকটির মনোজগৎ যে কতটা পারভার্স ছিল তার প্রমাণ এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য। সাজ্জাদ মনে করেন, শহীদ মিনার হচ্ছে লিঙ্গের প্রতীক। তিনি হিন্দুদের শিবলিঙ্গকে বোঝাতে চেয়েছেন। শহীদ মিনারের এমন ব্যাখ্যা আর কোন রাজাকার এভাবে দেয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষা তাঁর পছন্দ নয়। পছন্দ উর্দু, ফার্সি, আরবি যা মুসলমানদের ঐতিহ্য। কিন্তু, এর কোন ভাষায় তিনি একটি বাক্যও রচনা করেননি।

পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের পরের পর্যায়টি তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন।

যারা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ছিল তাদের অনেকে সি এস পি হয়েছিলেন। এদের যে পরীক্ষা দিতে দেয়া উচিত নয় তা পাকিস্তান সরকারের মনে হয়নি। এরা সি এস পি হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, এ. কে. এম. আহসানের কথা যিনি কেন্দ্রীয় সচিব হয়েছিলেন কিন্তু পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না।

চৌধুরী খালেকুজ্জামানের পর ইস্কান্দার মির্জা হলেন গভর্নর। শহীদ মিনার তখনও অসম্পূর্ণ। কেন্দ্রের নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে তখনও তা দাঁড়িয়ে। বছরের পর বছর তরুণরা এতে জানাত শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই শ্রদ্ধা আর ষড়যন্ত্রকারীদের নিষ্ঠার কারণে ভাষা আন্দোলন বিকশিত হতে থাকে।

আযম খান গভর্নর হয়ে এলে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে আপস করতে চাইলেন। কেন্দ্রীয় শাসকদের ধারণা ছিল এ ধরনের আপস বাঙালিদের শান্ত রাখবে। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক ছুটির দিন ঘোষণা করলেন এবং পুরো বিষয়টি সমীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন যার সদস্য ছিলেন—শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, খাজা খয়ের উদ্দিন, সরকারের প্রতিনিধি জনৈক মুসা শরফউদ্দিন ও লেখক নিজে। কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাহমুদ হুসাইন।

শহীদ মিনারের নকশা করেছিলেন শিল্পী হামিদুর রহমান। সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে, হামিদুরের শিল্প জ্ঞান তেমন ছিল না। কল্পনা হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু শিল্পে তা রূপান্তরিত করার বোধ বা ক্ষমতা ছিল না। সরকারি প্রতিনিধি মুসা প্রস্তাব করেছিলেন শহীদ মিনারের জায়গায় একটি সুন্দর স্থাপত্যের মসজিদ বা মিনার শোভিত কিছু নির্মাণ করার। প্রস্তাবটি সাজ্জাদের পছন্দ ছিল। কিন্তু বাধা দিলেন জয়নুল। বললেন, এ ধরনের কিছু করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে এবং বিষয়টি আরো জটিল হয়ে উঠবে। শহীদ মিনারের ফ্রেসকোগুলি ডঃ মাহমুদ হুসাইনের পছন্দ ছিল না কারণ তা তুলে ধরেছিল "Scenes of unrelieved barbarity." কিন্তু কেউ এসবের প্রতিবাদ জানাল না। হামিদুর রহমানের পরিকল্পনাই গৃহীত হলো। এজন্য আক্ষেপ ছিল তাঁর মনে। মন্তব্য করেছেন তিনি, পৃথিবীর কোথাও এত কুৎসিত নির্দশন তিনি দেখেননি।

আলোচনার পর কেউ তাঁর পূর্বমত বদল করলে ডঃ হোসায়েনের চোখে তিনি পরিণত হয়েছেন বিশ্বাসঘাতকে। তাঁর আদর্শ, তাঁর আত্মীজীবনীতে যা স্পষ্ট তা হলো, নিজ আদর্শ তুলে ধরা এবং সে আদর্শের বিরুদ্ধে কেউ মত প্রকাশ করলে নির্ভয়ে তা তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে ছাত্রজীবনের নানা ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর 'কুৎসিততম' নিদর্শনটির পরিকল্পনা যখন গৃহীত হচ্ছে তখন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। ঐ সময়, প্রভাবের দিক থেকে ডঃ মাহমুদ হুসাইনের পরই ছিল তাঁর স্থান। নিশ্চুপ থাকার কারণ, স্টাবলিশমেন্ট শহীদ মিনার স্থাপন করতে চাইছে। সে কারণেই তিনি বিরোধিতা করেননি। এরকম ঘটনা তাঁর সারাজীবনই ঘটেছে। ঘটনাস্রোত যেদিকে ভারী সেদিকেই নিশ্চুপে থেকেছেন মনের সায় না থাকলেও। অন্তত প্রাক ১৯৭১ সময়ে। সুবিধাও নিতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে

পরে আরো উদাহরণ দেয়া যাবে। কিন্তু, তাঁর চরিত্রের এ দিকটি কেউ উল্লেখ করেননি।

কেন্দ্রীয় সরকার এখানেই থেমে থাকেনি। ডঃ হোসায়েনের ভাষায়, বিভিন্ন তোষামুদে ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা, যেমন—দাউদ, আদমজী প্রভৃতি, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন দুই অবাঙালি সচিব আলতাফ গওহর ও কুদরতউল্লাহ শাহাবের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

আইয়ুব খান নির্ভরশীল ছিলেন এই দুইজন আমলার ওপর। এঁদের ঝোঁক ছিল বামপন্থার দিকে। আলতাফ ছিলেন মুনীর চৌধুরীর বন্ধু। এ যোগাযোগের সুযোগ পুরো নিয়েছেন মুনীর চৌধুরীরা। আলতাফ তো লোক ভাল ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের ডেপুটি সেক্রেটারি থাকাকালীন তিনি "earned a notoriety as a womaniser, and had got into a scrape over an affair with a member of visiting Thai dancing troupe." সরকারকে অনেক টাকা খরচ করে এ কাণ্ড ধামাচাপা দিতে হয়েছে।

এই আলতাফ গওহর বাঙালি সাংবাদিকদের সাহায্য করেন। প্রেস ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সেখান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে 'দৈনিক পাকিস্তান' ও 'মর্নিং নিউজ।' এখানে জড়ো হতে থাকে ষড়যন্ত্রকারীরা। তাঁর আক্রোশটা অবশ্য দৈনিক পাকিস্তানের ওপরই বেশি। হয়তো সেটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতো তাই।

এ প্রসঙ্গে অবাক হয়ে লিখেছেন— "১৯৬৫ সালে যখন পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করছিলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিলো যে কোনো মূল্যেই এ অঞ্চলের লোক পাকিস্তানকে বিকিয়ে দেবে না, তা হলে সেই উচ্ছ্বাসের অর্থ ছিল কি ? এই যারা লক্ষ লক্ষ লোক পাকিস্তানের সেই সংকট মুহূর্তে গর্জে উঠেছিলো তারা কি সবাই একটা প্রহসনের অভিনয় করছিলো ? সেটা কি সম্ভব ?"

সাজ্জাদ হোসায়েন বিষয়টি বুঝতে পারেন নি কিন্তু পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় নি। পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকরা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধটি ছিল মাইল ফলক। বাঙালিরা তখন বুঝেছিল যে তারা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। এবং পাকিস্তানীরা যে এতদিন বলে এসেছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ন্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তানের উপর তা বাকোয়াজ। এবং প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর বিষয়টি বুঝতে পেরে পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে সাজ্জাদ হোসায়েন আরো লিখেছেন– "আর একটি প্রশ্ন আমাকে পীড়িত করেছে। বিরোধী দলের কথাবার্তা এবং বক্তৃতা শুনে অনেক সময় ধারণা হতো যে তাদের বিশ্বাস যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা ভারতের অচ্ছুৎ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের চেয়েও অধম একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এযে কত বড় মিথ্যা বলা নিষ্প্রয়োজন।" সাজ্জাদ হোসায়েনের কাছে এটি মিথ্যা মনে হয়েছে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকরা বলেছেন ব্যাপারটা সত্য। শুধু তাই নয় পঞ্চাশ দশকের কথা স্মরণ করে পাকিস্তানী জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিক লিখেছিলেন, ১৯৪৭ এর পর বাঙালিরা আবিষ্কার করে যে তাদের ভাগ্য নয় শুধু প্রভু বদলেছে।

কুদরতউল্লাহ শাহাব লেখকদের জন্য করলেন রাইটার্স গিল্ড। এর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিতে সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন। কুদরতউল্লাহ্ এমন প্রস্তাব এনেছিলেন যেখানে 'প্যারিটি' বা 'সাম্য' থাকত না। সাজ্জাদই নাকি প্রতিবাদ করে গিল্ডে 'প্যারিটি' আনেন। অথচ জসীম উদ্‌দীন বা গোলাম মোস্তফা তাঁকে সমর্থন করেননি।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন বর্ণনার পর্যায়ে এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর কথা উল্লেখ করছেন। সাজ্জাদের মতে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম যেখানে, সেই পশ্চিমবঙ্গেও তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি হয়নি যা হয়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। সাজ্জাদ হোসায়েন একথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কখনও রবীন্দ্রনাথের বিরাধিতা করা হয়নি। এখানে সরকার তা করেছিল দেখেই 'মাতামাতি' বা বিষয়টি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

ঐ প্রসঙ্গে সাজ্জাদ হোসায়েন যাননি বরং তিনি বলছেন, রবীন্দ্রবার্ষিকী পালনের পেছনে ষড়যন্ত্রকারীদের দু'টি উদ্দেশ্য ছিল—

১. মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সাংস্কৃতিক অমিল নেই তা প্রমাণ করা।

২. কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুদের ঘৃণা করে। তাই রবীন্দ্রনাথের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়। এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের অর্থ হলো বাঙালি ঐতিহ্য থেকে তাদের ছিন্ন করা।

কেন্দ্রীয় সরকার এতে বাধা দেয়নি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা তখন দুঃসাধ্য ছিল যা সাজ্জাদ লেখেননি। আসলে সময়টাই ছিল সংকটময়। এর বিস্তারিত বিবরণ আছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের *বিদায়! অবন্তী!* গ্রন্থে। তিনি এবং তাঁর বন্ধু মোশতাক এ কারণে গিয়েছিলেন অধ্যাপক আদুল হাইয়ের কাছে "সবার আগে তাঁর কথা মনে হয়েছিল দুটো কারণে। এক. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। দুই. সে সময় ঢাকার সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কাজেই তাঁর কাছে

আশ্রয়ের প্রত্যাশাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দেশ যে তখন কী গভীর আতঙ্কের নিচে কুঁকড়ে আছে তা বুঝলাম অধ্যক্ষ হাইয়ের কাছে গিয়ে। আমাদের বক্তব্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন প্রচণ্ড ধমকে উঠলেন যে আমরা হঠাৎই হকচকিয়েই গেলাম। তারপর তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ক্রুদ্ধ আদেশ দিতে দিতে এই বলে আমাদের শাসিয়ে দিলেন যে এ ব্যাপারে তাঁর নাম যেন কোনোভাবেই ব্যবহারের অপচেষ্টা আমরা না করি।" পরে, তাঁরা বিচারপতি মুর্শেদ, অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ও সরওয়ার মুর্শেদকে নিয়ে কমিটির রূপ দেন। উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করলাম তখনকার ভীতিকর অবস্থা বোঝাতে। সাজ্জাদ হোসায়েন যে কেন্দ্রীয় সরকারের তোষামোদের কথা বলছেন তা সর্বৈব মিথ্যা।

ইন্টারেস্টিং এই যে, সাজ্জাদ হোসায়েন নিজেও রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনে একটি লেখা দিয়েছিলেন। ১৯৯৪-তে সেই 'দোষ' স্খালন করতে গিয়ে লিখেছেন, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র তিনি বুঝতে পারেননি। পেরেছিলেন ঠিকই। কারণ, যে মুহূর্তে দেখেছেন, শতবার্ষিকী কমিটি উজ্জীবিত হয়ে উঠছে, সারাদেশে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন চলছে তখন তিনি এর থেকে বাইরে থাকতে চাননি। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ঠিকই লিখেছেন—"পাকিস্তানী যুগে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাকে স্তব্ধ করে দেবার পর, দীর্ঘ এক দশকের ব্যবধানে, পরোক্ষ ও অঘোষিত হলেও রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর আয়োজন ছিল ঐ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙালিত্বের দ্বিতীয় প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।"

সাজ্জাদ হোসায়েন এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা বিতর্কের। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্রকারীরা এগুতে চেয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৯৬৭ সালে। ঐ সময় খাজা শাহাবুদ্দিনের এক বক্তৃতা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সাজ্জাদ জানাচ্ছেন, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবে সরকার চেয়েছিল বেতারে যেন সরকারি আদর্শ বা পাকিস্তানী আদর্শের বিরোধী কোনো গান প্রচারিত না হয়। কিন্তু, হামিদুল হক চৌধুরীর 'পাকিস্তান অবজারভার' বিষয়টি বিকৃত করে ছাপে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রতিবাদ। জাতীয় পরিষদে মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন বলেন, এ নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। এই বক্তব্য ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ। ৪০ জন বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রসঙ্গীত সমর্থন করে বিবৃতি দেন। সাজ্জাদ হোসায়েন এটিকে তাঁর ভাষায় বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেননি। তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁরা পাঁচজন তিনটি বাক্যে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যার বক্তব্য ছিল পাকিস্তানী এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে পার্থক্য আছে। এ বক্তব্যে তাঁর ভাষা ধরলেও তাছিল নিতান্ত নমিত। কিন্তু এ

কারণে তাঁদের আইয়ুবের এজেন্ট বলা হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল এর পরপরই ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি. নিযুক্ত হন। তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী স্বাক্ষরদাতারা ছিলেন ইংরেজি বিভাগের কে. এম. এ. মুনিম, ইতিহাস বিভাগের ডঃ মোহর আলী, আইনের ডীন শাহাবুদ্দিন ও অঙ্কের এ. এফ. এম. আবদুর রহমান। এঁদের তিনজন পরবর্তীকালে রাজাকার হিসেবে 'খ্যাতিমান' হয়েছিলেন।

এ বিবৃতির ফলে, হোসায়েন লিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক গ্রুপ— পাকিস্তানের বা পাকিস্তানী আদর্শের প্রতি অনুগত, অন্যরা পাকিস্তানী আদর্শের বিরোধী। এ ঘটনার পর সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব আর তেমন থাকল না। অবাক হয়ে তাঁরা তখন দেখলেন, সংবাদপত্র, বেতার, টিভি—সবাই ষড়যন্ত্রকারীদের দলে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, নীলিমা ইব্রাহীম, রফিকুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

সাজ্জাদ হোসায়েন লিখেছেন, ১৯৬৭ সালে বর্ণমালা শুদ্ধিকরণ নিয়ে একই ব্যাপার ঘটল। শহীদুল্লাহ কমিটির প্রস্তাব এর আগে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে যায়। আবদুল হাই ও কবীর চৌধুরী এর বিরোধিতা করেন। আরেকটি কমিটিতে এনামুল হক ও মুনীর চৌধুরীও বিরোধিতা করেন। এঁদের ব্যবহারে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

তিনি লিখেছেন, বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে এই যে আন্দোলন তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু সভাসমিতি, ছাত্র ও পেশাজীবীর মধ্যে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক এতে মাথা ঘামায়নি। ১৯৫৮ সালে যদি ভাষার প্রশ্নে কোন রেফারেনডাম হতো, মনে করেন সাজ্জাদ হোসায়েন, তা'হলে এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিত।

এখন বিষয়টি নিয়ে দু'ভাবে প্রশ্ন তোলা যায়। কৃষক শ্রমিক যদি এতোই অসচেতন হয় তা'হলে পরবর্তীকালে গণআন্দোলনগুলিতে তারা সম্পৃক্ত হলো কীভাবে? বদরুদ্দীন উমর তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, শুধু ভাষার প্রশ্নে ভাষা আন্দোলন হয়নি। ভাষার প্রশ্নে বা অন্য প্রশ্নে যদি কেন্দ্রীয় সরকার আত্মবিশ্বাসী হতো তাহলে অবশ্যই রেফারেনডাম করতেন। গণআন্দোলন তো শুধু রাজনৈতিক প্রশ্নেই পরিব্যাপ্ত হয়নি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে সোনার বাংলা মিথটি উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। সাজ্জাদ হোসায়েন বহু তথ্য ঘেঁটে দেখিয়েছেন আসলে বাংলা কখনোই সোনার ছিল না। অঞ্চলটি গরীব, নাঙ্গা ভুখার দেশ। সবসময় মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত। তিনি আরো গবেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর বক্তব্যই ঠিক। তাঁর থিসিস হলো,

বাংলাদেশ যদি এরকমই হয়ে থাকে তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান তাদের শোষণ করলো কীভাবে? বরং পশ্চিম পাকিস্তান 'সোনার বাংলা' গড়ার আধুনিকায়নের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করেছে।

এ যুক্তি পড়ে মনে হলো আসলেই ডঃ হোসায়েনের মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণ ছিল না। 'সোনার বাংলা' ছিল না দেখেই তো 'সোনার বাংলা' মিথটির জন্ম। সেটি অন্য বিষয়। কিন্তু যখন ১৯৪৭-৭১-এর কথা আসে তখন ঐ সময়টুকুর কথাই আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুই প্রদেশের আর্থিক অবস্থান কী ছিল, দুই প্রদেশের আয় কী ছিল এবং ক্রমান্বয়ে তা কী হলো, এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তিনি এড়িয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগের সেই বিখ্যাত পোস্টার 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?'-তে প্রাচীন আমলের বাংলার উল্লেখ করা হয়নি। সমসাময়িক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের পার্থক্য দেখানো হয়েছিল। সাজ্জাদ হোসায়েন সে বিষয়টিতে না গিয়ে বলছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বিনিয়োগের ফলে শুরু হলো আধুনিকায়ন— আধুনিকায়ন আঘাত হানলো চিরাচরিত রীতিনীতির ওপর—হ্রাস পেতে লাগলো কায়েমি স্বার্থবাদী মহলের প্রভাব— ফলে এর প্রতিক্রিয়া হলো তীব্র, কারণ, মানুষের জীবনধারা বদলে যাচ্ছিল—

"A reaction against it developed in the form of xenophobia which really was a mask for the feeling of inferiority which the Bengalis experienced in relation to outsiders."

বাঙালি হীনম্মন্যতায় ভোগার বড় প্রমাণ ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েনের মতো কৃষ্ণ সাহেবরা যারা বাঙালি হয়ে ফিরিঙ্গি, সৌদি বা পাঠান সাজতে চান। আসল বাঙালি হীনম্মন্যতায় ভোগেনি দেখে লড়াই করেছে পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে, সৌদি, মার্কিন, চীনা সমর্থন পাঞ্জাবিদের পেছনে থাকা সত্ত্বেও।

এভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হলো। কিন্তু সাজ্জাদ হোসায়েন বলছেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদ আবার কি? এ ধরনের জাতীয়তাবাদ হতে পারে না, অন্তত উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর মতে, উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যা বিচার্য তা হলো— "Complex pattern of its history, feeling of group solidarity based on religion and historical memories are a stronger force than linguistic bounds." শুধু তাই নয়, তাঁর কাছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানের রীতিনীতিতে পার্থক্য আছে বলে মনে হয়নি। জ্ঞানপাপী না হলে বা বদ্ধ উন্মাদ না হলে এ মন্তব্য করা কঠিন। আসলে, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সাজ্জাদ হোসায়েনরা হেরে গেছেন, পাকিস্তান রাখতে পারেননি।

জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যা মন্তব্য করেছেন *একাত্তরের স্মৃতিতে* তা উল্লেখ করা প্রয়োজন–

"এ সমস্ত উপজাতি বা উপদলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। অন্যেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস না পেলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা এই জাতীয়তাবাদ মেনে নিতে পারেনি। মানতে গেলে তাদের বৈশিষ্ট্য একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবং একাত্তরের পর নতুন সরকার বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে যে সংকটের সৃষ্টি করে তার জের আমাদের এখনো পোহাতে হচ্ছে এবং এখন তো এটা সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছে।

তাই বলছিলাম যদি ঘটনাচক্রে এ অঞ্চল সত্যি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যা হবে অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার—তখন এই বিদ্রোহীরা নতুন এক জাতীয়তাবাদের হোতা বলে পরিচিত হবে এবং আজ যাদের বিদ্রোহী বলা হচ্ছে তারাই তখন হবে জাতীয় বীর।

যারা এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা অহরহ বলে বেড়ায় মনে হয় তাদের ধারণা যে ইতিহাসের গতি '৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এসে থেমে গেছে। কিন্তু এ যে কত বড় মূর্খতা তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে হলে এমন একটি চেতনার প্রয়োজন যার মধ্যে '৭১-এর হিংসা বিদ্বেষের কোনো চিহ্ন বর্তমান থাকবে না। এবং যে চেতনায় এ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর অধিবাসী মিলিত হতে পারে। আজগুবি কোনো বিজাতীয় কালচারের ভূত দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে এই চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে যারা বসবাস করছে তাদের নিজস্ব জীবন ধারা, যার মধ্যে ধর্মের প্রতিফলন স্পষ্ট, অবলম্বন করেই একটি জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বলতে আমি এ কথা বলছি না যে এ রকম চেতনা এখন একেবারেই নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক নানা উদ্ভট থিওরি আউড়ে এটাকে এমন এক বিপথে চালনা করার চেষ্টা করছে যা আমাদের স্বাধীনতার পরিপন্থী।"

একাত্তরে কি বাংলাদেশের জন্য আদিবাসী গারো, সাঁওতালরা যুদ্ধ করেনি ? যদি করেই থাকে তা হলে কীসের ভিত্তিতে বা আবেগে ? সাজ্জাদ হোসায়েন এ বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছেন। তাদের জাতিসত্তাকে অস্বীকারের চেষ্টা হয়েছে একথা স্বীকার্য কিন্তু এ প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে কার আমলে ? পাকি-বাংলা আদর্শের ধারক ও বাহক জেনারেল জিয়া ও এরশাদের সময়। বর্তমানে তা নিষ্পত্তির আয়োজন চলছে শান্তিচুক্তির আওতায়।

আসলে তিনটি অনুচ্ছেদে যে বিষয়টি মূল তা অনেকের চোখ এড়িয়ে যাবে। মূল বিষয়টি হলো, তাঁর ভাষায়–"বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে হলে এমন একটি চেতনার প্রয়োজন যার মধ্যে '৭১-এর হিংসা বিদ্বেষের কোন চিহ্ন বর্তমান থাকবে না। এবং যে চেতনায় এ রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর অধিবাসী মিলিত হতে পারে।" অর্থাৎ রাজাকারদের সব পাপ ভুলে

তাদের নিয়ে থাকতে হবে যেমনটি চেয়েছিলেন সামরিক শাসকরা। এবং এ তত্ত্বই সম্প্রতি আরো পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন চার দলীয় (বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট) জোটের প্রধান গোলাম আযম এ বলে যে, আমাদের ১৯৪৭ এর চেতনায় ফিরে যেতে হবে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডঃ হোসায়েন বলেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযোগ শুরু হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা এ বিষয়ক প্রশ্নগুলি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯৪৭-এর পরপরই দ্বি-জাতি তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেল। এর বড় প্রমাণ, আলাদা নির্বাচনী প্রথা বাতিল। এর বদলে এলো ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্ব। কামরুদ্দিন আহমদ এ বিষয়ে প্রথম বইটি লিখেছেন যার নাম *দি স্যোশ্যাল হিস্ট্রি অফ ইস্ট পাকিস্তান*। এর পর প্রকাশিত হলো বদরুদ্দীন উমরের *সংস্কৃতির সংকট*। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অনুরোধে তিনি বইটির সমালোচনা করেছিলেন। উমরের বিরুদ্ধে তিনি যেসব যুক্তি তুলে ধরেছিলেন সেগুলির উত্তর উমর দেননি কারণ উমরের মতে, এগুলি দুশো বছরের পুরনো যুক্তি। এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন ডঃ হোসায়েন এবং তিনি মন্তব্য করেছেন উমর সম্পর্কে— "He pretended dishonestly that he was no traitor, which was precisely what he was."

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুর রাজ্জাক ও মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ছিলেন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা। এঁরা সে সময় দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, ফলে, পাকিস্তান ভাঙার উপকরণগুলিই শাসনতন্ত্রে তারা সন্নিবিষ্ট করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী পরে এ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যান। তবে, আইয়ুব খান একটি ভালো কাজ করেছিলেন, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার প্রবর্তন।

যাঁরা পাকিস্তানী আন্দোলন বা দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে, তাঁরা বিশ্বাসঘাতক। বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি তাঁর ছাত্রজীবন ও শিক্ষকতা জীবনের বিবরণ দিয়েছেন এবং সেখানে কারা বিশ্বাসঘাতক তা দেখিয়েছেন। একথা উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল ছাত্র ও সাংবাদিক হিসেবে। ছাত্র থাকাকালীন *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় লেখা একটা চিঠিতে তিনিই প্রথম এ প্রত্যয়টি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন।

সাজ্জাদ হোসায়েন প্রথম চাকরি পান কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। সেখানে তাঁর জুনিয়র সহকর্মী ছিলেন সাহিত্যিক আবু রুশদ। তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও ছিলেন তিনি। আবু রুশদ সম্পর্কে একটি প্রশংসাসূচক বাক্যও খরচ করেননি সাজ্জাদ হোসায়েন। লিখেছেন, সাহিত্যিক হওয়ার চেষ্টা

করেছেন রুশদ, কিন্তু তাঁর সাহিত্য হয়নি। পাকিস্তান প্রত্যয়ের বিরোধী ছিলেন না রুশদ, কিন্তু এর জন্য কোন ঝুঁকি নিতেও রাজি ছিলেন না তিনি। এই যে মানসিক রিজার্ভেশন, একারণেই ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটনের দূতাবাসের পাকিস্তানী হিসেবে কর্মরত থাকার সময় তিনি বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। রুশদের ব্যাপারটি ছিল—"a case of real treachery."

আবু রুশদও ৪০০ পাতার আত্মজীবনী লিখেছেন। ইসলামিয়া কলেজ ছাড়া আর কোথাও সাজ্জাদ হোসায়েনের প্রসঙ্গ আসেনি, আত্মীয়তার কথাও নয়। তিনি শুধু ইঙ্গিত করেছেন, সাজ্জাদ কলকাতা ছাড়তে চাননি। সাজ্জাদ হোসায়েন, ইসলামিয়ায় তাঁর সহকর্মী আবদুল মাজেদ খানের উল্লেখ করেছেন যিনি ইসলামের ইতিহাস পড়াতেন। পরে তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাজ্জাদ হোসায়েনের সহকর্মী হন এবং গবেষক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলমান এবং ইসলামের ইতিহাস পড়ানো সত্ত্বেও মাজেদ খানকে পছন্দ ছিল না তাঁর। কারণ, পাকিস্তানের প্রতি এতোটা উচ্ছ্বাস ছিল না মাজেদ খানের। হোসায়েন তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন হিন্দু হিসেবে।

এরাই ছিল কুইসলিং। সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা— সব ক্ষেত্রেই আবির্ভাব ঘটছিল কুইসলিংদের। "We realize bitterly and poignantly that a tragedy of the greatest magnitude entailing the enslavement of our homeland through the machinations of a group of Quislings has occured."

অন্তিমে কুইসলিংরা সফল হলো। এটাই আক্ষেপ সাজ্জাদ হোসায়েনের। কুইসলিংরা সফল হলে তো তাদের নাম কুইসলিং থাকে না। তবুও সাজ্জাদ তাঁদের এ নামকরণই করেছেন। এরা বিভিন্ন 'ছোটখাট বিষেয়ের' (যেমন ভাষা আন্দোলন) অবতারণা করছিল যেগুলি পরবর্তীকালে প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়ে পাকিস্তানের বিপর্যয় ডেকে আনে। তাঁর ভাষায়—

"Call them what you will, bad luck, wrong judgement, lack of foresight, alienation from the public, failure to gauge the trends of popular feeling— these factors combinedly helped transform a minor incident into a major event in Pakistan national life, adding daily to the conspirators' strength, and paving the war for upheval of 1971."

এ প্রসঙ্গে *একাত্তরের স্মৃতি*-তে *'শিকড়ের কথা'* অধ্যায়টির কথা উল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণ সাহেব সাজ্জাদ হোসায়েন ইংরেজিতে বিষয়টি তেমনভাবে বোঝাতে পারেন নি যা পেরেছেন বাংলাভাষায়। দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি এ কারণে তা'হলে রাজাকারদের মনের গহীনে কী চিন্তা খেলা করে তা বোঝা সহজ হবে–

"উৎসের সন্ধানে গিয়ে সেই বর্বরতায় ফিরে যেতে হবে ? প্রাক ইসলামী যুগের বাঙালী সমাজের মধ্যে যদি বর্তমান বাংলাদেশের উৎসের সন্ধান করতে হয় তা হলে দেখা যাবে সেটা ছিলো আপেক্ষিকভাবে একটা বর্বর যুগ যখন এ অঞ্চলের অধিবাসীরা সভ্যতার অনেক কিছু সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। আমি দু'একটি ব্যাপার উল্লেখ করছি। সেই আদিম যুগে এ দেশের লোকেরা কী খেত আমি জানি না, তবে এ কথা সত্য যে মুসলমানী রান্না যাতে পেঁয়াজ, রসুন, এলাচি, দারচিনি ব্যবহৃত হয় যা এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত, তখন এ রকম রন্ধন প্রণালীর অস্তিত্ব ছিলো না। শিকড় বলতে কি আমরা সেই প্রাচীন যুগে ফিরে যাবো ? শুনেছি একদল তরুণ নাকি ১লা বৈশাখের দিনে পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে শিকড়ে ফিরে যাওযার পরিতৃপ্তি লাভ করে। এটাকে এক ধরনের বুদ্ধি বিকৃতি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ?....

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের উৎসের সন্ধান করতে গেলে বল্লাল সেন যুগের অধিবাসীদের মধ্যে সে উৎস পাওয়া যাবে না। এই সমাজের মতো মিশ্র সমাজ খুব কমই আছে। এ কথা সত্য যে এ দেশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো; কিন্তু ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবৈষম্য উঠে যাওয়ার ফলে এদের রক্তের সঙ্গে আরব ইরানী তুর্কী পাঠান ইত্যাদি বহু রকমের রক্ত মিশ্রিত হয়। এখনো বহু মুসলমান পরিবার আছেন যারা কুর্সিনামা দেখে বলতে পারবেন তাদের পূর্ব পুরুষ কোন শতাব্দীতে এ দেশের মাটিতে পা দিয়েছিলেন। এ সমস্ত প্রাচীন পরিবারের রক্তের মধ্যেও স্থানীয় রক্ত নিশ্চয়ই মিশেছে। সুতরাং শিকড় বলতে যারা একটা বিশেষ অর্থে প্রাক-ইসলামী যুগের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করছেন তাঁরা তো একটা সম্পূর্ণ বাস্তব বর্জিত স্বপ্নকে সত্য বলে মনে নিতে বলছেন। পদ্মা মেঘনা যমুনার মাছ যেমন এখানে সবই খায় তেমনি যে সমস্ত বস্তু বা অভ্যাস বিভিন্ন যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা রপ্ত করেছি তাও আমাদের সভ্যতার অঙ্গ।

শিকড় তত্ত্বের সমর্থকরা কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করেন, আর কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিতে বুঝাতে চান যে ইসলাম না এলে বাঙালীর ভাগ্যে নাকি কোনো বিড়ম্বনা ঘটতো না। এটা একটা আশ্চর্য 'থিওরি' বটে। প্রাচীন আচার পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে এদের নরবলি এবং সতীদাহ প্রথাও আবার প্রচলন করা প্রয়োজন হবে। উনিশ শতাব্দীর শেষ অবধি পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। ইংরেজরা সতীদাহ দমন করার উদ্যোগ নিলে ব্রাহ্মণরা আপত্তি জানিয়েছিলো এই বলে যে সরকার অন্যায়ভাবে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাপালিকের সাধনার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে নরবলির কথা আছে। এটাও তো একটা আদিম সংস্কার। এই কালচারে কি আমাদের ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ?

শুধু এখানেই শেষ হবার নয়। যারা দাবী করে যে তাদের পূর্ব পুরুষ যে ধর্মে এবং কালচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলো সেই ধর্ম এবং কালচারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তাদের একান্ত কর্তব্য তারা কি এ কথা ভুলে যায় যে অধিকাংশ হিন্দু যারা সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তারা মুসলিম সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। পাঠান বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দেয়। যদি আজ ইসলাম থেকে সরে দাঁড়িয়ে শিকড়ে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে তবে জাতিভেদের প্রথাও তো আবার পুনঃপ্রবর্তিত হতে হবে। আর এ সমস্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তি আবার অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে।

আসল কথা, যারা এ সমস্ত কথা বলে এবং এ জিনিস শুরু হয়েছে ষাটের দশক থেকেই–তারা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের মতলবে এ সমস্ত থিওরি আওড়ায়। ১৯৪৭ সালের বিভক্তি এরা মানতে রাজী নয়। এবং এ অঞ্চল স্বাধীন থাকুক এটাও তারা চায় না। পাকিস্তান আমলে এরা অনবরত প্রচার করেছে যে এখন আমরা পাঞ্জাবীদের অধীন। এবং প্যাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এলে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারবো। আবার এখন বলছে যে '৭১ সালে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় তারো কোনো মূল্য নেই। ওপার বাংলার সঙ্গে মিশে গেলেই নাকি আমরা সত্যি মুক্ত হবো।

'৭১ সালে ভারতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে বলা হতো না। কারণ ও কথা বললে এ দেশের জনসমাজ সাড়া দিতো না। তাই তখন বলা হচ্ছিলো যে ভারত আমাদের প্রকৃত বন্ধু। ভারতীয় সৈন্য এসে আমাদের রক্ষা করবে। ভারতে বাঙালী পাঞ্জাবী মারাঠা তামিল শিখ পার্সি বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী লোকেরা এক রাষ্ট্র গঠন করে বসবাস করতে পারে। তার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু পাকিস্তানে পাঞ্জাবী পাঠান সিন্ধি এবং বাঙালী এক রাষ্ট্র গঠন করে এমন একটি কর্ম করেছিলো যা শুধু হাস্যকরই নয়, রীতিমত এ্যাবসার্ড অর্থাৎ অযৌক্তিক। এই যুক্তিটি চিরকালই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে। ভারতে প্রধান ধর্ম হচ্ছে হিন্দুত্ব। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের মারাঠা এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া আর কোনো বন্ধন নেই। এই ধর্মও ইসলামের মতো ধর্ম নয়। উত্তর ভারতের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় আচরণের প্রভেদ অনেক। মুসলমান বলতে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে সে ব্যক্তি এক আল্লাহ এবং রসুলে বিশ্বাস করে সে রকম কোনো সর্বগ্রাহ্য বিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যে নেই। তবু অহর্নিশ আমাদের বলা হয়েছে যে কায়েদে আজম জিন্নাহ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নাকি পূর্বাঞ্চলকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করেছিলেন। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক যারা আমরা পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিলাম, আইন সভার সদস্য যাঁরা ৪৭ সালে

ভোট দিয়ে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলাম এরা যেনো রাতারাতি হয়ে গেলেন দেশদ্রোহী এবং সমাজদ্রোহী। এ সমস্ত কথা ভেবে '৭১ সালে যেমন মনঃপীড়া অনুভব করেছি এখনো করি। কিন্তু '৭১ সালের ২৫ মার্চের পর অধিকাংশ লোকই আওয়ামী লীগের প্রচারণা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল।"

আমার পড়াশোনা তেমন নেই বটে কিন্তু সামান্য কিছু বইপত্র ঘেটেছি। আমি কোথাও দেখিনি স্বাধীনতার পক্ষের কোন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন– "ইসলাম না এলে বাঙালির ভাগ্যে নাকি কোনো বিড়ম্বনা ঘটতো না।" একথাও কেউ লেখেননি যে "ওপার বাংলার সঙ্গে মিশে গেলেই নাকি আমরা সত্যি মুক্ত হবো।" মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের মানুষরা অর্থাৎ রাজাকাররা এভাবেই মনগড়া কথা বলে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়। যেমন, একজন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মসজিদে উলুধ্বনি শোনা যাবে। রাজাকাররা কখনই এ কথা বলে না যে, মুক্তিযুদ্ধের মূল বিষয় ছিল গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠা, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। সেটি করা গেল কি গেল না সেটি পরের বিষয়। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধের মূলেতো ছিল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি ? এটি কি মিথ্যা ?

সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে, আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য কখনোই আন্তরিক ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের 'কাল্ট' দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এতে শক্তি যুগিয়েছিল তাঁর মতে আরো কয়েকটি কারণ—

১. দু' দেশের ভৌগোলিক দূরত্ব।

২. জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বুঝতে কেন্দ্রীয় শাসকদের ব্যর্থতা।

৩. পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপ যা বিরক্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি করত।

৪. শত্রুরা অর্থনৈতিক বঞ্চনার যে মিথ্যা চিত্র তুলে ধরেছিল তা প্রতিহত করতে সরকারের অনিচ্ছা।

৫. অন্তিমে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ।

৬. সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, তাদের অগাধ বিশ্বাস যে পাকিস্তানের ভিত অনড়।

৭. শাসকরা বুঝতে পারেনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

এসব কারণ ছাড়াও কুইসলিংদের সফলতার কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা- গরিষ্ঠ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। কিন্তু, জেলে থাকার সময় তাঁর অন্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তা হলো, দেশের 'মুক্তির'

জন্য হাজার হাজার মানুষ (অর্থাৎ রাজাকাররা) প্রস্তুত ছিল। যাহোক কুইসলিংরা সফল হলো, কারণ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর চায়নি মানুষ, আর ভারত সে মনোভাবকে আরো দৃঢ় করে তুলতে পেরেছিল। তাঁর ভাষায়—

"It is a sad story of betrayal, treachery, foolishness, myopia, deception on one side and lack of forethought, unconcern, ignorance, want of sympathy, arrogance on the other. Combinedly they led to the cataclysm and tragedy of 1971, from which deliverance, if it comes at all, could be a slow process."

## ৭

এভাবেই সাজ্জাদ হোসায়েনের মনোজগতের বিকাশ ঘটেছে। এবং তার অনিবার্য ফল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হানাদার পাকিস্তানীদের সমর্থন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের তৎপরতা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হননি। ২০ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর ইংরেজি বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম— 'ডিসেম্বর ২০ তারিখে কীভাবে রক্ষা পেলাম।' তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী (তাঁর ভাষায় 'গ্যাংস্টার্স') তাঁর বাসায় ঢুকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় সায়েন্স এনেক্সে। সেখানে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক সম্বোধন করে পেটানো হয়। এক প্রস্ত পেটানোর পর 'গ্যাংস্টার'রা চলে যায়। তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল ময়মনসিংহের এক কলেজের ছাত্র। ছাত্রটি তাঁকে বলেছিল হঠাৎ করে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ মুক্তিযোদ্ধাদের অবাক করেছে, কারণ, মুক্তিবাহিনী জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সাজ্জাদ হোসায়েন লেখার সময় ভুলে গিয়েছিলেন যে, নভেম্বর থেকে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়েছিল এবং রাজাকার ছাড়া বাঙালিমাত্রই জানতেন আত্মসমর্পণ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। রাজাকারদের তখন আশা ছাড়া আর কোনো ভরসাই ছিল না। সাজ্জাদ হোসায়েন তখন তাকে বলেছিলেন কীভাবে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বাঁচিয়েছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়েও এসেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ তিনি আরেকটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন *একাত্তরের স্মৃতি*-তে। সেখানে তাঁর মূল বক্তব্য–তাঁর সহকর্মীদের সবসময় তিনি বিপদ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন এবং রক্ষা করেছেনও। কিন্তু ইংরেজি গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৭১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের

চাটুকারিতা ও হিপোক্র্যাসি ভোলার নয়। তারা ভয় পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু খালি ভয়-ই এই চাটুকারিতার কারণ ছিল না। তিনি বিশেষ করে নাজিম মাহমুদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নাজিম মাহমুদ ছিলেন নাস্তিক ও বামপন্থী কিন্তু মাথায় সারাক্ষণ টুপি পরতেন ও নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন।— "A born coward, he thought cap and prayer would be an ideal disguise for his pusillanimity."

এই একটি অনুচ্ছেদই যদি অন্যান্য বিবরণের সাহায্যে পরীক্ষা করি তা'হলে দেখবো, সাজ্জাদ হোসায়েন কী পর্যায়ে মিথ্যাচার করেছেন এবং সুবিধামতো কীভাবে শক্তির পক্ষে থাকতেন।

নাজিম মাহমুদ ১৯৭১-বিষয়ক একটি স্মৃতিকথা লিখেছেন, নাম— *যখন ক্রীতদাস ঃ স্মৃতি ১৯৭১*। বইয়ের নামকরণই বলে দেয় কীভাবে ১৯৭১ সালে তিনি দিনযাপন করেছিলেন। মাহমুদ ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা। সাজ্জাদ হোসায়েন তখন উপাচার্য। নাজিম মাহমুদ ছিলেন আবার ডঃ হোসায়েনের ছাত্র।

১৯৬৯ সালে যখন গণঅভ্যুত্থানে দেশ কাঁপছে, তখন সাজ্জাদ হোসায়েনের বাংলা প্রীতি উপচে উঠল। নাজিম মাহমুদকে তিনি এ বিষয়ে ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। নাজিম তখন বললেন—

"স্যার, এদেশে আপনি এক বিতর্কিত ব্যক্তি। সবাই ভাবে, আপনি বাঙলা বিরোধী। আপনি যখন তা' নন, আপনার সম্পর্কে অহেতুক সকলের এই ভুল ধারণা আপনার ভেঙে দেওয়া উচিত।"

ডঃ হোসায়েন আগ্রহী হয়ে উঠলেন। নাজিম মাহমুদ প্রস্তাব করলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে বাংলা ভাষা চালু করার। লুফে নিলেন উপাচার্য এ প্রস্তাব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়ে গেলো বাংলা ভাষা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও তা অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। সংবাদপত্রে সাজ্জাদ হোসায়েনের প্রশংসায় সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। নাজিম মাহমুদ লিখেছেন—

"ডঃ হোসায়েন হয়ত বুঝেছিলেন, বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁর এই সম্মান সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি বদলে দেবে। কিংবা কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর মতাদর্শ তখন হয়ত পালটে যাচ্ছিল, কে জানে। যেমন এই ঘটনার কিছুদিন আগে যশোরের সাগরদাঁড়ির মধুমেলায় এবং নওয়াপাড়া কলেজের অনুষ্ঠানে উদার মানবতা ও মুক্তবুদ্ধির পক্ষে তিনি বক্তব্য রাখেন এবং সকল মানুষের সব রকম সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি পরিহার করার আহ্বান জানান। তাছাড়া সত্তর সালের উনিশে জানুয়ারি রংপুর কারমাইকেল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে প্রদানের জন্য পুস্তিকায় তাঁর ভাষণ ইংরাজীতে মুদ্রিত

হলেও শেষ মুহূর্তে সেই ভাষণের তিনি বাংলা তর্জমা করেন এবং সমস্ত রাত জেগে স্টেনসিলে আমি হাতে লিখি সেই অনুবাদ। ইংরাজী ভাষণের সাথে সাথে বাংলা অনুবাদের সাইক্লোস্টাইল করা কপিও সমাবর্তনে বিতরণ করা হয়। ডঃ হোসায়েন বাংলায় ভাষণ দেন। তারপর পঁচিশে জানুয়ারি খুলনায় বি এল কলেজে এবং উনত্রিশে ও একত্রিশে জানুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন আয়োজিত হলো। সবখানেই ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ভাষণ ছিল বাঙলায়।"

২৫ মার্চের পর এই সাজ্জাদ হোসায়েন-ই বদলে গেলেন। নাজিম মাহমুদের ভাষায়—

"এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের কোনো এক সন্ধ্যায় রাজশাহী বেতার কেন্দ্র চালু হতেই ভেসে এলো ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের কণ্ঠস্বর। রাজশাহীতে হানাদার দখলদার পাকসেনাদের প্রশংসায় বাগোবাগো হয়ে তিনি বললেন, তাদের চেষ্টায় রাশাহীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানালেন, রাজশাহী শহরে পানি, বিদ্যুৎ, হাটবাজার,যানবাহন সবই নিয়মিত। তিনি আরো বললেন, ক্যাম্পাসত্যাগী শিক্ষক কর্মচারী প্রায় সবাই ক্যাম্পাসে ফিরেছেন, দু'একজন বাকি, আশা করা যাচ্ছে তারাও ফিরবেন দু'একদিনের মধ্যে। রাজশাহী সম্পর্কে মিথ্যা গুজবে বিশ্বাস না করার জন্য সবাইকে তিনি অনুরোধ জানালেন। ডক্টর হোসায়েন কি বন্দুকের নলের সামনে এতবড় মিথ্যে যেদিন উচ্চারণ কছিলেন? কিন্তু তাঁর পরবর্তী কার্যকলাপে তার সামান্যতম কোন প্রমাণও পাওয়া গেল না। এমনকি বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও তিনি বেতারে সংবাদপত্রে একরাশ মিথ্যে ছড়ালেন।"

নাজিম মাহমুদদের অনেকেই সেদিন উপাচার্যের কথায় ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছিলেন বা থেকেছিলেন, যে কারণে ডিসেম্বর ১৬ পর্যন্ত তাঁদের ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হয়েছিল যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি ঐ গ্রন্থে দিয়েছেন। নাজিম মাহমুদরা তখন বোঝেননি এবং এখনও অনেকে বোঝেন না যে, অনেকের মন বদলাতে পারে কিন্তু রাজাকারের মন বদলায় না।

ক্যাম্পাসে যখন হানাদার বাহিনী হত্যা ও ধর্ষণের রাজত্ব কায়েম করেছে তখন সাজ্জাদ বলেছিলেন নাজিম মাহমুদকে "যদি তুমি কোথাও ফাঁস করো, আমাদের জওয়ানেরা এইসব করে বেড়াচ্ছে, তাহলে তোমাকে কিন্তু বাঁচাতে পারবো না। সাবধান।" পরবর্তীকালে আরো একবার পাকিস্তানী জওয়ানদের দুষ্কর্ম ডঃ হোসায়েনকে গোপন করতে হয়। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। "নয়ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে চল্লিশজন জওয়ান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে ঢুকে যে নারকীয় দৃশ্য রচনা করে, তাও ভাইস

চ্যান্সেলরকে হজম করতে হয়। তিনি বললেন সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা রোকেয়া হলে ঢুকেছিল। কিন্তু কারা এই দুষ্কৃতকারী সে কথা মুখে উচ্চারণ তিনি করতে পারলেন না।"

স্বাধীন হওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দফতরে একটি তালিকা পাওয়া গেল। তালিকাভুক্ত ৩৯ জনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। "এ তালিকার রহস্য কি ভাইস চ্যান্সেলরের স্টেনো তৈয়ব আলীকে জেরা করতেই বেরিয়ে এলো সে কথা। ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এই তালিকা প্রস্তুত করে সামরিক দফতরে পাঠান এবং ওই চার ক্যাটিগারির অর্থ চার রকম দণ্ডের নির্দেশ।" অনুমান করে নিতে পারি, টিক্কা খানের দপ্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে তালিকা পাওয়া গেছে তাঁদের তালিকাও সাজ্জাদ হোসায়েনের পাঠানো। কারণ, ঐ তালিকায় উল্লেখিত অনেকের সম্পর্কে কটুকাটব্য করেছেন তাঁর গ্রন্থে। অ ছাড়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভীরুতা সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা ন্যায্য নয়। মুজিবুর রহমান দেবদাস তার উদাহরণ। এ বিষয়ক অনেক তথ্য নাজিম মাহমুদ ও অন্যান্যের গ্রন্থে আছে। বাহুল্য ভেবে উদ্ধৃত করলাম না। এখানেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এ কারণে যে তা হলে, একজন রাজাকারের মন বোঝা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে বোঝা যে কেন সবসময় তারা স্টাবলিশমেন্ট/সুবিধা/শক্তির পক্ষে থাকে। আদর্শটা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সুবিধা আদায়ের ঢাল হিসেবে।

*একাত্তরের স্মৃতি*-তে তিনি নয়মাসে তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন যা আবার ইংরেজি গ্রন্থে নেই। 'বিবৃতি' নামক অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, হেমায়েত হোসেন সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতিটিতে সবার স্বাক্ষর নিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি পাকিস্তানে বিশ্বাসী তাই তিনি স্বাক্ষর করেছেন এটি মেনে নেয়া গেল। কিন্তু তারপরই শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের সম্পর্কে তার মতামত দিয়েছেন–

"২৫শে মার্চের আর্মি এ্যাকশনের আগে যদিও কোনো রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ইয়াহিয়া সরকার ভাবেননি, তাঁরা অতি সত্ত্বরই টের পেয়েছিলেন যে জনসমর্থন পেতে হলে নেতৃবৃন্দের সহানুভূতির প্রয়োজন। তাই এই সময় নুরুল আমিন সাহেব এবং আরো অনেক নেতার স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রচার করা হয়। এগুলো যে তাঁরা আর্মির চাপের মুখে প্রচার করতে বাধ্য হন তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ফল হয় উল্টো। আর্মির ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের মনে আরো সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এই কারণে পিস কমিটিগুলোও দেশে শান্তি-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়নি। আর্মিও তাদের বিশ্বাস করতো বলে মনে হয় না। প্রায়ই শোনা যেতো যে তাদের সুপারিশ উপেক্ষা করে অনেক কিছু করা হয়, অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়, যার ফলে

পিস কমিটির প্রতি জনগণের মনে একটা করুণার ভাব সঞ্চারিত হয়। এরা আর্মির হাতের পুতুল, এই সন্দেহ বদ্ধমূল হতে থাকে। পিস কমিটিতে অনেক সৎলোক ছিলেন যাঁরা চেয়েছিলেন যে দেশে শান্তি ফিরে আসুক এবং এ দেশের অখণ্ডতা যেনো রক্ষা পায়। কিন্তু স্বাধীনভাবে তাঁদের কাজ করতে দেয়া হচ্ছিলো না-এ অভিযোগ বহু অঞ্চল থেকে শুনতে পাই।

আর্মির অবিশ্বাসের হেতু যে একেবারে ছিলো না, তা নয়। শুনেছি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন অনেক লোক ভালো মানুষ সেজে পিস কমিটিতে যোগ দিতো যারা আওয়ামীদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতো, অনেক তথ্য ফাঁস করে দিতো। এসব নিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, চারিদিক অবিশ্বাস ও সন্দেহে ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিলো। আমি এ কথা শুনেছিলাম যে, আর্মি যে রাজাকার নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তাদেরও কেউ কেউ অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতো। আবার এ কথাও শুনেছি, রাজাকার হয়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত শত্রুতার শোধ নিতো। এ সব ঘটনা সম্পর্কে কোনো কোনো সময় তদন্ত হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিও দেয়া হয়েছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়।"

দেখুন বাক্যটি "পিস কমিটিতে অনেক সৎ লোক ছিলেন যাঁরা চেয়েছিলেন যে দেশে শান্তি ফিরে আসুক...।" এ মন্তব্য কি সত্য ? রাজাকারদের সম্পর্কে নাকি তিনি অনেক কথা শুনেছিলেন। এর অর্থ রাজাকারদের কর্মকাণ্ড সত্য নাও হতে পারে।

এর পরের অধ্যায় 'প্রবাসী সরকার'। যাঁরা প্রথমে এতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে তিনি নানা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি–

১। "এ রকম আর একজন পরিচিত লোক যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখনও খুব বিস্মিত হয়ে ছিলাম। তিনি হলেন হোসেন আলী। ফরেন সার্ভিসের অফিসার, কোলকাতায় ডিপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তিনি নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে কোলকাতার পাকিস্তান মিশনটিকে কার্যত একটি ইন্ডিয়ান প্রচারণার কেন্দ্রে পরিণত করেন। হোসেন আলীকে চিনতাম ১৯৪৭ সাল থেকে। '৪৭ সালে আমরা যে ক'জন তরুণ শিক্ষক পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ অঞ্চল থেকে সিলেটের এম সি কলেজে যোগ দিয়েছিলাম হোসেন আলী তাদের অন্যতম। তার ডিগ্রী ছিলো কেমিষ্ট্রিতে। সিলেটের আম্বরখানায় আমি যে বাসা ভাড়া করেছিলাম প্রথম কয়েকদিনের জন্য তিনি সেখানে উঠে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে আরো ছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম। তিনি বাসায় রয়ে গেলেন। হোসেন আলী এক রিক্সাওয়ালার সাথে মেস করেন। এ সময় অর্থাৎ '৪৭ সালের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্য অনেক অফিসার রিক্রুট করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ছিলো না। কারণ তখনই কিছু

লোক ট্রেনিং এর জন্য নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিলো। এ প্রসঙ্গে বলা বোধ হয় প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী আই সি এস অফিসার একজনও ছিলেন না। সুতরাং শুধু ইন্টারভিউ করে কাউকে ফরেন সার্ভিসে, কাউকে এডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিসে, কাউকে অডিট সার্ভিসে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কলেজে কলেজে রিক্রুটমেন্ট টিম ঘুরে বেড়িয়ে লোক সংগ্রহ করেন। এইভাবে হোসেন আলী পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। আমি আগে থেকেই স্থির করেছিলাম যে, আমি শিক্ষকতা করবো। সে জন্য কোনো ইন্টারভিউ দিতে রাজী হইনি। সেই হোসেন আলী নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করলেন, এ আমি কখনো ভাবতে পারিনি।”

২। “আর একবার আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটে। সেটা করাচীতে। আমরা ইন্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ডের এক মিটিং-এ গিয়েছিলাম। কোনো এক ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অমার মতভেদ হয়। তাঁর কোনো এক যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে মুশকিলে পড়া গেলো। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন যে তাঁর কথায় বাধা দিলে তিনি আর মুখ খুলবেন না। আমি বিশেষ লজ্জিত হয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের সামনে তিনি ও রকম অসৌজন্যমূলক দৃশ্যের অবতারণা করবেন এ ছিলো আমার ধারণাতীত।.....

যাক সে কথা। আবু সাঈদ চৌধুরী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে ঢাকা ত্যাগ করেন সপরিবারে। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে জেনেভায় জুরিষ্টদের সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। পরিবারের সবাইকে কেনো নিয়ে গেলেন সেটা বুঝা গেলো যখন ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পর তিনি বিবিসিতে এক ইন্টারভিউতে বলেন যে, পাকিস্তান আর্মি তাঁর ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার শিক্ষক ও ছাত্রকে খুন করেছে। এরপর তিনি আর ঐ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করতে পারেন না। তাঁর এই চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। কারণ ভাইস চ্যান্সেলর পদের মর্যাদা পাশ্চাত্য জগতে খুব বেশী। তাঁর মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অতিশয়োক্তি করতে পারেন এটা ওরা ভাবতে পারে না। আশ্চর্যের কথা ২৫শে মার্চের ঘটনার পর শুধু বিদেশী পাকিস্তান বিরোধী প্রপাগান্ডার উপর নির্ভর করে আবু সাঈদ চৌধুরী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাতে সন্দেহ হলো যে পূর্বাহ্নেই তিনি টের পেয়েছিলেন যে দেশে একটা গৃহযুদ্ধ বাধবে এবং তিনি কোন পক্ষ গ্রহণ করবেন তাও আগে থেকেই স্থির করা ছিলো। আরো বিস্ময়ের কথা ২৫ তারিখের আগেই তিনি তাঁর ইস্তেফাপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনায় আমার মনে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা গৃহযুদ্ধ

ঘটাবে বলে আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। শুধু আর্মির এ্যাকশনের আকস্মিকতায় তারা কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়ে।"

'২৫ তারিখের আগেই তিনি তাঁর ইস্তেফাপত্র পাঠিয়েছিলেন।' মিথ্যাচার আর কাকে বলে!

এরপর পাকিস্তানের সমর্থনে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিনিধিদলকে যে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত করা হয়েছিল তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। পাকিস্তান যে বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে তাও তাঁর নজর এড়ায়নি। কিন্তু, কেন তারা বন্ধুহীন হয়ে পড়ছে বুদ্ধিমান সাজ্জাদ হোসায়েন তার কারণ বোঝেন নি সেটাই আশ্চর্য। এ বিষয়ে তিনি তাঁর অদ্ভুত মতামত ব্যক্ত করেছেন যা উদ্ধৃত করছি—

"লন্ডন এবং নিউইয়র্কের ঘটনায় আমার মনে একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে উঠছিলো। এখন আর সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। রাজশাহীতে যেমন দেখেছিলাম যে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করার জন্য ২৫শে মার্চের অনেক আগে কনট্রাকটর নিযুক্ত করা হয়, তেমনি কূটনৈতিক সার্ভিসেও বাংগালী অফিসার সবাই গৃহযুদ্ধ বাধলে কি করতে হবে সে জন্য তৈরি হয়েছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করাই সত্য যে, পঁচিশ তারিখ রাতের ঘটনার আকস্মিকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই এতবড় একটা আন্দোলন orchestrate করা সম্ভব হতে পারে না। সবাই যেনো জানতো কখন কী হবে এবং তার প্রতিরোধ কীভাবে করতে হবে। এইভাবেই আমাদের লন্ডন এবং নিউইয়র্কের প্রোগ্রাম ফাঁস করে দেয়া হয়। তার মানে লন্ডনে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁদের সঙ্গে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে কর্মরত কর্মচারীদের রীতিমতো যোগাযোগ ছিলো। দিল্লীর আমজাদ হোসেন, কোলকাতার হোসেন আলী, আবু সাঈদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের বাংগালী কর্মচারীরা মনে হচ্ছিলো একই মাষ্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করে চলেছেন। এই প্ল্যানের প্রয়োজনেই নানা প্রকারের উস্কানী দিয়ে আর্মিকে এ্যাকশনে নামতে প্ররোচিত করা হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অবরোধের আর কী অর্থ হতে পারে ? আর যে নির্বোধ আর্মি অফিসারদের উপর দেশ রক্ষার ভার ছিলো, তারা এই ফাঁদে পা দিয়ে পূর্বাপর কোনো ভাবনা না করে ২৫ তারিখের রাত্রে কতকগুলো নিরপরাধ এবং নিরীহ লোক হত্যা করে। এদের অধিকাংশের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংস্রব ছিলো না।"

ঢাকায় ফেরার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। টিক্কাখানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। টিক্কা তাঁকে 'দেশদ্রোহী' শিক্ষকদের তলিকা দিতে বলেন, কিন্তু সাজ্জাদ তা অস্বীকার করেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে এ বক্তব্য খাপ খায় না। খাপ খায় সেই বক্তব্য যা তিনি বলেছেন টিক্কাখান সম্পর্কে—

"একদিন জেনারেল টিক্কা খান অমাাকে ডেকে পাঠালেন, এই প্রথম জেনারেল টিক্কা খানের সাথে আমার পরিচয়। তাঁর সম্বন্ধে আগে অনেক আজগুবি কাহিনী শুনেছিলাম। এপ্রিল মাসেই আমার বড় মেয়ের শ্বশুর আমাকে বলেছিলেন যে টিক্কা খান নিজেকে সামরিক নির্মমতার জন্য প্রস্তুত রাখতে এতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তিনি জেনারেল আইয়ুব খানের অনুরোধেও বিয়ে করতে রাজী হননি। কারণ তিনি নাকি মনে করতেন যে সন্তান-সন্ততি হলে মানুষের মন কোমল হয়ে পড়ে।

এই প্রচারণা ছিলো সর্বৈব মিথ্যা। গবর্নমেন্ট হাউজেই টিক্কা খানের ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। শুনলাম তার কয়েকজন ভাই বোন আছে। তখন অবাক হয়ে ভাবলাম আমার মেয়ের শ্বশুর মিঃ আনসারী একজন উঁচু পদের পুলিশ অফিসার হয়েও কীভাবে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে টিক্কা খানের মধ্যে মানবতার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আমি টিক্কাখানের ২৫শে মার্চ তারিখের সামরিক অভিযানের সমর্থনের কথা বলছি না, তার নিন্দা বহুবার করেছি, কিন্তু টিক্কা খানকে দানব হিসাবে চিত্রিত করে যে ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি করা হয়েছিলো সেটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রচারণার ফল।"

পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকরাও টিক্কা সম্পর্কে এ ধরনের মূল্যায়ণ করেন।

পাকিস্তানের ক্রিকেটার কারদার সম্পর্কে বিস্তারিত একটি অধ্যায় আছে। কারদার যুক্ত ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে। সাজ্জাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কারদার তাঁকে অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

"পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন এ সম্পর্কে আপনার পরামর্শ চাই। পড়ে দেখি এটি ডক্টর আহমদ শরীফের একটি আবেদনপত্র। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে আর্মি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এই ভয়ে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। আবেদনপত্রে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তো দেশদ্রোহী নন বরঞ্চ ইসলাম সম্পর্কে সারা জীবন তিনি গবেষণা করেছেন এবং অনেকগুলো প্রকাশিত প্রবন্ধ বা রচনার নামও আবেদনপত্রে ছিলো। কারদার জানতে চাইলেন ডক্টর আহমদ শরীফ সত্যি সত্যি ইসলাম ভক্ত কিনা। এর জবাব দিতে যেয়ে মুশকিলে পড়লাম। আহমদ শরীফ পুঁথি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর রচিত পুঁথি ক্যাটালগ-এর ইংরেজী তরজমা আমিই করেছিলাম। সেখানে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলাম যে পুঁথি সম্বন্ধে ডক্টর আহমদ শরীফের চাইতে বেশী জ্ঞান আর কেউ রাখেন না বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কি ? ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিলো বলে আমার জানা ছিলো না। অবশ্য বাংলাদেশ পরবর্তী কালে ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি তিনি করেছেন বলে শুনেছি সে রকম

কোনো কথা পাকিস্তান আমলে তিনি বলতেন না, কিন্তু দেশের এ সংকট মুহূর্তে তাঁর ধর্মীয় মতামত নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য সরকারী কর্মচারীকে জানাতে গেলে তাঁর সমূহ বিপদ ঘটবে এই মনে করে আমি কারদারকে বলেছিলাম যে ইসলাম সম্পর্কে কে কখন কী বলেছে তা যাচাই করে যদি সেটাকে দেশপ্রেমের মাপকাঠি করা হয় তা হলে বহু লোকই বিপদে পড়বে। এ রকমের বাড়াবাড়ি করা মোটেই উচিত হবে না। শুনেছি পরে তাঁকে আর খোঁজাখুঁজি করা হয়নি।"

অধ্যাপক শরীফ বেঁচে নেই। সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে না। কারদার তাঁকে বলেছিলেন যা এখনও পাকিস্তানীরা বিশ্বাস করেন। তা'হলো, বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা চেয়েছিল তার জন্য হিন্দু শিক্ষকরাই দায়ী। সাজ্জাদ তা অস্বীকার করে বলেছিলেন—

"মোদ্দা কথা, শিক্ষায়তনে হিন্দু প্রাধান্যের কারণে ১৯৭১ সালে বিস্ফোরণ ঘটেছিলো বলে কারদার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মনে যে ধারণা ছিলো সেটা সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এঁরা যে বিশেষ খবর রাখতেন না এই ধারণা তার অন্যতম প্রমাণ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা হয়েছিলো এবং হচ্ছিলো সে কথা মোটেই অসত্য নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা এ জন্য অনেকখানি দায়ী। পাকিস্তানের ইতিহাস এবং পটভূমিকা আমরা তরুণদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারিনি এবং অনেকটা মনে করতাম এ রকম ব্যাখ্যার আর বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না। এটা যে কত বড় ভুল সে কথা ৬৯-৭০ সালে ভালো করে টের পাই। সে সময় বিলম্বে হলেও পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস সম্বলিত একটি পাঠ্য পুস্তক চালু করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখন পাকিস্তান বিরোধীরা ছাত্র সমাজকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি নামক এই বইটির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ ছিলো এক আশ্চর্য ঘটনা। দেশের ইতিহাস জানতে চাইবো না এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীর আর কোথাও এ ধরনের আন্দেলন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। শেষ পর্যন্ত প্রবল চাপের মুখে ইয়াহিয়া সরকার বইটি প্রত্যাহার করে নেন।

আমি কারদারকে বলি যে হিন্দু শিক্ষকদের প্রাধান্যের কারণে নয় আমাদের নিজেদের গাফলতির কারণে বর্তমান সংকটের উদ্ভব হয়েছে। যে তরুণেরা পাকিস্তান ধ্বংস করার উন্মত্তায় মেতে উঠেছিলো তাদের জানাই ছিলো না কেনো আমরা বর্ণ হিন্দু কবলিত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছি।"

এ অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছেন–

"আগষ্ট মাসে নির্দেশ এলো আমরা যেনো স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। পাকিস্তান আমলে প্রতিবছরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১৪ই আগষ্ট

উদযাপিত হতো। তবে এবার এ উদযাপনের বিশেষ তাৎপর্য ছিলো। টিএসসি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের সভা হয়। দু'-এক জন শিক্ষক বক্তৃতা করলেন। সভাপতির অভিভাষণে আমি বললাম যে স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এবং আমি আশা করি দলমত নির্বিশেষে সকলেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন। আমি জানতাম আমার প্রতিটি বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হতে পারে সে জন্যে ইচ্ছা করেই দেশের গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করিনি। শুধু সাধারণভাবে স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলেছিলাম। আশ্চর্যের কথা ১৯৭২-৭৩ সালে যখন আমরা কলাবরেটর আইনে আটকা পড়ি, আমার কার্যাবলী সম্পর্কে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের জনৈক শিক্ষক পুলিশের কাছে অভিযোগ করে যে, সে স্পষ্টভাবে শুনেছে যে আমি সবাইকে আর্মির সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলেছি। সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের এক হিন্দু শিক্ষক যিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনিও এই অভিযোগ সমর্থন করেন। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই ছিলো না। তবুও মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলাম এই ভেবে যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা কীভাবে এ রকমের মিথ্যা কথা বলতে পারলেন। আমি পাকিস্তান আদর্শবাদে বিশ্বাস করতাম এটা কোনো গোপন কথা নয়। ছাত্র জীবন থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনে সাথে জড়িত ছিলাম। '৪০সাল থেকে ঢাকা এবং কোলকাতার বহু পত্রিকায় এই সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছি এবং এই সূত্রে যে তরুণ সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলো, আমি নিজেকে তাদেরই অন্যতম মনে করতাম। আমারই চোখের সামনে আমাদের সেই বাস্তবায়িত স্বপ্ন ধূলিস্যাত হয়ে যাবে এটা আমরা কামনা করতে পারি সে তো ছিলো অসম্ভব। কিন্তু '৭১ সালে ১৪ই আগষ্টের অনুষ্ঠানে আমি পরিষ্কারভাবে আর্মির পক্ষে ওকালতি করেছিলাম এই অভিযোগ ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ রকম আরো অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়েছে যার মূলে লেশমাত্র সত্য নেই।"

তাঁর বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেছেন তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তারপরই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছেন। 'জ্ঞানপাপী' কী জিনিস এ মন্তব্যেই তা বোঝা যাবে–

"শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা, পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্র এদের কারো প্রতি কোনো রকম মমতা বা আনুগত্য রাখা চলবে না–এ শিক্ষাই আওয়ামী লীগ থেকে প্রচার করা হচ্ছিলো। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিজ-এর এক নাটকের কথা মনে পড়ে। থীবস নগরে রাজা ক্রেয়ন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এটিওক্লিস নামে এক ব্যক্তি। তিনি দাবী করেছিলেন যে থীবস-এর সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু তার ভাই পলিনাইসিস এ দাবী সমর্থন করেননি। তিনি ছিলেন ক্রেয়ন-এর পক্ষে। দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দুই জনই মারা পড়েন। ক্রেয়ন ঘোষণা করেন যে

পলিনাইসিসকে সসম্মানে সমাহিত করা হবে এবং এটিওক্লিস-এর শব কাক-শকুনকে বিলিয়ে দেওয়া হবে। রাজার এ ঘোষণার পর কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পেলো না। বিরুদ্ধাচরণ করলো ক্রেয়নের পুত্রের বাগদত্তা এন্টিগনি। এসে ছিলো এটিওক্লিসের বোন। সে স্থির করলো যে রাজার আদেশ অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড হবে সত্য কিন্তু ভাইয়ের প্রতি তার এমন একটি কর্তব্য রয়েছে যেখানে সে কোনো রাষ্ট্রের আদেশ মানতে বাধ্য নয়। মৃত ভ্রাতাকে সমাহিত করা তার কর্তব্য। কারণ এটা চিরন্তন নীতি, যার বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের থাকা উচিত নয়। মৃত্যু ভয় না করে এন্টিগনি এটিওক্লিসকে সমাহিত করে এবং পরে তার নিজের মৃত্যুদণ্ড হয়।

সফোক্লিজ যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো যে সভ্যতার মূলে এমন কতকগুলি চিরন্তন মূল্যবোধ থাকে যা লংঘন করতে গেলে মানুষ পশুরও অধম হয়ে যায়। অথচ '৭১ সালে বহুবার শুনেছি যে স্বাধীনতার স্বার্থে নাকি খুন ডাকাতি ব্যভিচার সবকিছুই বৈধ। পিতামাতা শিক্ষক কেউ বিপরীত মত অবলম্বন করলে তাকে খতম করে দেশ উদ্ধারের যে চেস্টা এ সময় শুরু হয়েছিলো তার জের আমরা কখনো কাটাতে পারবো কিনা সন্দেহ।"

লিখেছেন তিনি–"ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক বুদ্ধি-শুদ্ধি সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা ছিল না।" কিন্তু, ইয়াহিয়া খানের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ এবং তাঁকে তিনি কীভাবে আপ্যায়িত করে সন্তোষ লাভ করেছিলেন তার বিস্তারিত গদগদ বিবরণ আছে। এ অধ্যায়ে তিনি রাজাকারদের কর্মকাণ্ড যে ভাবে সমর্থন করেছেন তা মনে রাখার মতো–

"মিলিটারি দেশে আরো তিন প্রকার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সৃষ্টি করে। এক দলের নাম ছিলো রাজাকার, দ্বিতীয় দলের নাম আলবদর এবং তৃতীয় দলের নাম আলশামস। এদের বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং দেওয়া হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রাজনীতিকদের কোনো ভূমিকা ছিলো না। এ কথা সত্য যে বহু আদর্শবাদী যুবক যারা বুঝতে পেরেছিলো যে পূর্ব পাকিস্তানে যে সংঘর্ষ বেধেছে সেটা কোনো গৃহযুদ্ধ নয়, ভারতীয় আগ্রাসনের একটা দিক মাত্র, তারা এ সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা এগিয়ে এসেছিলো ভারতীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। পুল, রাস্তা ব্যাংক, গুদাম, কল-কারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারা দেবার দায়িত্ব এদের উপর ন্যস্ত হয়। অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এরা এ দায়িত্ব পালন করে। অনেকে বোমা এবং গুলিতে প্রাণ হারায়। কোনো কোনো স্থলে আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষে এদেরও গোলাগুলি ব্যবহার করতে হলে শত্রুপক্ষদের লোকও নিহত হয়। এবং এই কারণে তখন কোলকাতা থেকে প্রচার করা হয় যে স্বেচ্ছাসেবক তিনটি দলই আর্মির দালাল এবং এদের প্রধান কাজ হচ্ছে নৃশংসভাবে আওয়ামী লীগের সদস্যদের খতম করা। বিদ্রোহী বাহিনী যেমন অনবরত ব্যক্তিগত শত্রুতা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে

বহু নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে খুন করেছে তেমন কোনো বাড়াবাড়ি রাজাকাররা করেছে বলে আমরা তখন শুনিনি। তবে দুর্ঘটনা যে একবারে হয়নি সে কথা হলফ করে বলতে পারবো না। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের পর আওয়ামী লীগ এবং এর সমর্থকরা রাজাকারদের যেভাবে খুনী এবং ডাকাত বলে চিহ্নিত করেছিলো–যে অভিযোগ এখনও শুনছি তার কোনো ভিত্তি নেই। যে কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় সে হলো যে যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো তাদের লক্ষ্য ছিলো দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা।"

এ পর্যায়ে স্বাধীনতার মুহূর্তে তাঁর মনোভাব কী হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন। না., এ বিবরণটিতে তাঁর অনুভূতিই তিনি প্রকাশ করেছেন। মিথ্যাচার করেননি। সুতরাং রাজাকারের মন বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দেখবেন, এখনও যে সব রাজাকার বেঁচে আছে তারাও এ ধরনের মন্তব্য করে। সাজ্জাদ হোসায়েন লিখেছেন–

" ১৫ তারিখ রাত্রে আরো ভাবি যে, যে পরিবর্তন আসছে তাতে আমার নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনো স্বস্তিই পাচ্ছিলাম না। নয় মাসে চারদিকে প্রতিহিংসার আগুন যেভাবে জ্বলে উঠেছিলো তাতে দেশের এবং সমাজের কোনো মঙ্গল হতে পারে এ কথা বিশ্বাস করা ছিলো আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাছাড়া আরেকটা কথা ভাবি, এই তথাকথিত মুক্তিবাহিনী যদি নিজেরা যুদ্ধ করে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো তাতেও অগৌরবের কিছু আমার চোখে পড়তো না। বিচ্ছিন্নতাকে আমি সহজে মেনে নিতে পারতাম না সত্যি কিন্তু তা হলেও মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে পারতাম যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু যা হতে যাচ্ছিলো সেতো বিদেশী একটি রাষ্ট্রের সাহায্যে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা মাত্র। ইন্ডিয়ান আর্মি এই দেশকে যুদ্ধে পরাজিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে এটা দখল করতে আসছিলো। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বা যারা এখন নিজেদের বাঙালী বলতে শুরু করেছিলো তাদের গৌরবের কি থাকতে পারে? এরা ইচ্ছা করে একটা বিদেশী শক্তির কাছে দেশকে তুলে দিতে যাচ্ছিলো এবং এর নাম দিয়েছিলো স্বাধীনতা। শুনেছি এখনো কোলকাতায় নাকি পূর্ব পাকিস্তান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই-। ইন্ডিয়া বিজয় লাভ করেছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে কৌশলে ইন্ডিয়া বিজয় লাভ করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তারও প্রশংসা আমি করতে পারি। কিন্তু পাকিস্তানী হিসাবে এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না।

আরও মর্মাহত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু অধিবাসী, সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে

মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তার মধ্যে বীরত্বের কিছু ছিল না। যুক্ত বাংলায় যেমন সংখ্যাগুরু হয়েও মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যেত, এখানেও তাই। অথচ এটাকে বলা হচ্ছিল বাঙালীর সাহস ও বীরত্বের আদর্শ।"

ফিরে আসি পুরনো প্রসঙ্গে। সেদিন গভীর রাতে তাঁকে সায়েন্স এনেক্সের একটি কক্ষে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তিনি জানতে চেয়েছিলেন কী তাঁর অপরাধ। মুক্তিযোদ্ধারা জবাব দিয়েছিলেন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর হত্যা ও নভেম্বরে রোকেয়া হলে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের জন্য তিনি দায়ী। তাঁর অস্বীকৃতি মুক্তিযোদ্ধারা মিথ্যা হিসেবেই নিয়েছিলেন।

তাঁর মনে হয়েছিলো, একনায়কী রাষ্ট্রে যে ধরনের শাস্তি দেয়া হয় তাঁকে সে ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে সময়কার আবেগ ও অবস্থা বিবেচনা করলে, মুক্তিযোদ্ধারা যে তখনই তাঁকে হত্যা করেনি বরং সংযম দেখিয়েছিল তাই আশ্চর্য। পাকিস্তানিরা নয়মাস যা করেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে তা তাঁর কাছে একনায়কত্ব মনে হয়নি, মনে হয়েছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে সেটি তাঁর কাছে আশ্চর্য লেগেছে। এটিই রাজাকারি মনের বৈশিষ্ট্য। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এ ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তা যুক্তিযুক্ত। তিনি লিখেছেন—

"দেশাদ্রোহিতার শাস্তি দিতে ক্ষিপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু, শিক্ষক হিশেবে শ্রদ্ধা দেখিয়েই হয়ত তাঁকে শেষ পর্যন্ত গুলি করে হত্যা করেনি। বেয়নেট দিয়ে সামান্য খুঁচিয়ে গুলিস্তানের সামনের কামানের পাশে ফেলে রেখে যায়। এই সৌজন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সবসময়েই রাজাকারদের প্রতি দেখিয়ে গেছে। এতটাই দেখিয়েছে যে, জাতির সঙ্গে শত্রুতা করে যারা জনগণের অসীম দুঃখ-দুর্দশা ঘটিয়েছে তাদের বিচারটুকু করতেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু রাজাকাররা একটি ঘটনাতেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই সৌজন্য দেখায় নি।" বারবার রাজাকারদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের কারণেই আজ জাতি বিভক্ত। রাজাকারদের সাফল্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধ অসম্পূর্ণ থাকার কারণ এখানেই নিহিত।

## ৮

১৫ ডিসেম্বর উপাচার্য ভবন থেকে সাজ্জাদ হোসায়েন চলে আসেন ১০৯ নং নাজিমুদ্দিন রোডে তাঁর নিজের বাসায়। সেই সময় একটি মিনিস্টার গুজব

শোনা যাচ্ছিল যে, পাকিস্তান পরাজিত হতে যাচ্ছে। কিন্তু, তারা আশা করে যাচ্ছিলেন। 'ভায়োলেন্স'-এর সাহায্যে একটি রাষ্ট্র গঠন করা যায় এটি কখনও তাঁর মনে হয়নি। লক্ষ করুন ভায়োলেন্স শব্দটি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কোন কর্মকাণ্ডকে তাঁর ভায়োলেন্স মনে হয়নি।

গ্রেফতারকালীন অবস্থায় তাঁর মনে হচ্ছিল, এখান থেকে বেঁচে গেলেও বাকি জীবনটা বাঁচবেন কীভাবে?

"How could I live in the midst of the debris which the fall of Pakistan had thrown up around me.... what could a person like me like after the fall of Pakistan?"

ভোরের দিকে তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর ধারণা ছিল তাঁকে গুলি করে মারা হবে। চোখ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে গাড়িতে তোলা হয়েছিল। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা তাঁর ধারণা ছিল না। এক জায়গায় গাড়ি থামানো হলো। এবং বেয়নেট দিয়ে আঘাত করা হলো। পড়ে গেলেন তিনি এবং জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফিরল। এক পথচারী দয়াপরবশ হয়ে চোখের বাঁধন খুলে দিলে দেখলেন গুলিস্তানের কামানের সামনে পড়ে আছেন। ছোটখাটো একটা জটলা হয়ে গিয়েছিল তাঁর সামনে। অনেককে বললেন, সাহায্য করতে, একটু বাড়ি পৌছে দিতে। কিন্তু কেউই রাজি নয়। পাশে দেখেন ডঃ হাসান জামানও শুয়ে আছেন। বেশ খানিকক্ষণ পর একজন রিকশা করে পৌছে দিল তাঁকে বাড়িতে। যেতে যেতে দেখলেন, হাসান জামান হেঁটে যাচ্ছেন বায়তুল মোকাররমের দিকে।

বাসায় ফিরলেন ডঃ হোসায়েন বিধ্বস্ত হয়ে। কিন্তু, বাসায় থাকাটা নিরাপদ ছিল না। ভারতীয় বাহিনী তাঁকে আবার বাসা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে রাখে মেডিকেল কলেজের কেবিনে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে দেখে যেত এবং কেন তাঁকে হত্যা করা হলো না তা নিয়ে আফসোস করত। এরি মধ্যে একদিন একজন তরুণ এসে তাঁকে বললো, "আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছি।" কারণ, চারদিকে ভারতীয় বাহিনী থাকলে কীভাবে স্বাধীনতা বজায় থাকে? এটিই প্রশ্ন হোসায়েনের। ঐ সময় আমরাও তো দেশে ছিলাম। আমাদের কি তা মনে হয়েছিল একবার ভেবে দেখুন তো। একথা তাকে আদৌ সে সময় কেউ বলেছিল কি না জানি না। তবে, রাজাকারি চিন্তার কোন তরুণ ছাড়া আর কেউ ওরকম ভাবতে পারে বলে মনে হয় না।

তখন এ অবস্থায়ও তাঁর মনে হয়েছে, 'গৃহযুদ্ধ' শব্দটি কেউ ব্যবহার করে না। সবাই বলে মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানী বাহিনীকে বলে হানাদার বাহিনী। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা, আশ্চর্য! জিন্নাহ, আইয়ুব খান, কবি ইকবালের নামে রাস্তাঘাট, ইমারতের নামকরণ বদল হলো। সূর্য সেনের মতো 'সন্ত্রাসীর' নামে হলো হলের নামকরণ! ইসলামিক

ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম কবি নজরুল কলেজ হওয়ার অর্থ— "Sad reflection on the level of culture among elite." সাজ্জাদ হোসায়েনের কাছে মনে হয়েছে এ ধরনের নামকরণ জনগণের স্পিরিট পরিবর্তন করবে না। তাঁর মতে, ইসলামি নাম বদল হলো কিন্তু খ্রিস্টান বা হিন্দু নাম তো বদল হলো না, যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন বা নটরডেম কলেজ। ইসলামের বিরুদ্ধে এই বৈষম্য নাকি আওয়ামী লীগের একাংশকেই ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে কতজন শহীদ হয়েছিলেন এবং কতজন নির্যাতিত হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মন্তব্যটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করছি তাতে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে তারা বিচার করেছে—

"বাস্তবিক পক্ষে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন'মাসে ক'জন নিহত হয় তার কোনো জরিপ হয়নি। একদিকে যেমন বলা হলো যে পাকিস্তান আর্মি ৩০ লক্ষ বাঙালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, অন্যদিকে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে ৩ লক্ষ নারীর ইজ্জতও তারা নষ্ট করেছে। এবং প্রথম প্রথম এসব নির্যাতিত মেয়েদের পুনর্বাসন এবং বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে এ আশ্বাস দেওয়া হয়। এসব বীরাঙ্গনাকে গ্রহণ করতে তরুণরা যাতে ইতস্ততঃ না করে সে পরামর্শ তারা পেয়েছিল। এক পর্যায়ে এদের জন্য ঢাকায় এক আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। তখন শুনেছি শত খোঁজখবর করেও এ রকম বীরাঙ্গনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। দেশের বিভিন্ন পতিতালয় থেকে দু'একজন মেয়েকে এখানে হাজির করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত যখন দেখা গেলো যে এ রকম বীরাঙ্গনার সংখ্যা একশতেও উঠছে না তখন চুপচাপ করে এ প্রকল্প পরিত্যাগ করা হয়। এ সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য শুনিনি। তবে শেখ মুজিবের আমলে যেমন এখনও তেমন পঁচিশে মার্চ বা ১৬ই ডিসেম্বর সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে তিন লক্ষ মা বোনের নির্যাতনের উল্লেখ থাকে।

আর্মির হাতে কেউ মারা পড়েনি বা কোনো মেয়ে নির্যাতিত হয়নি, এ রকম উদ্ভট দাবী আমি করছি না। কিন্তু কথা হচ্ছে সংখ্যা নিয়ে। গ্রামে গ্রামে সুষ্ঠুভাবে জরিপ করলে নিহত এবং নির্যাতিতের সঠিক সংখ্যা অবশ্যই বের করা যেতো। কিন্তু সরকার জরিপ করার সাহস পায়নি। কারণ কোনো রূপ জরিপ করলে তার মধ্যে নাম ধাম উল্লেখ করে ত্রিশ লাখের প্রমাণ পাওয়া যেতো না। ছ' বছর স্থায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান বোমায় বৃটেনে ষাট হাজার নরনারী নিহত হয়। জার্মানীতে বেসামরিক লোকজন যারা মিত্র শক্তির বিমান আক্রমণে নিহত হয়েছিলো তাদের সংখ্যা তিন লাখ। এসব আমার মনগড়া কথা নয় বইপত্রে যে সমস্ত তথ্য সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে তার মধ্যেই এসব হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন ওঠে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো প্রলয়ংকরী একটা দুর্যোগে যেখানে মৃতের সংখ্যা এই সেখানে বাংলাদেশের

গৃহযুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক নিহত হলো কি রূপে ? আমি আগেই বলেছি যে এদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিশেষ করে যারা পাকিস্তান বিরোধী কোনো ভূমিকায় জড়িত ছিলো তারা এ সম্বন্ধে কোনা পুনর্বিচার করতে রাজি নয়। ব্যক্তিগতভাবে অনেকে স্বীকার করেন যে ত্রিশ লাখের কথা একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ এর বিরোধিতা করতে এখনো সাহস পান না।

যে সমস্ত তরুণ-তরুণী ইতিহাস জানে না, '৭১ সালে যাদের জন্ম হয়নি বা তখন যারা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেনি তারা ধরে নিয়েছে যে ত্রিশ লক্ষ এবং তিন লক্ষ হিসাবের মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন নেই। এর ফলে বিশ বছর পরও পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারছে না। কারণ স্বাভাবিক করার কথা বললেই একদল লোক এদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঐ ত্রিশ লক্ষ ও তিন লক্ষের কথা। আমরা এখনো একাত্তর সালের গৃহযুদ্ধের ফলে যে বিষবাষ্প সৃষ্টি হয়েছিলো তার ধকল কাটিয়ে উটতে পারিনি।"

বাংলাদেশেও কি বর্তমান নব্য রাজাকাররা এ ধরনের মন্তব্য করে না ? তারা কি বলে না, মুক্তিযুদ্ধ ছিল "নিতান্তভাবে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের যুদ্ধজনিত একটা ঘটনা মাত্র।" যেমনটি লিখেছিলেন কৃষ্ণ সাহেব অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসায়েন।

## ৯

বিশ্বাসঘাতক এবং চাটুকার কারা? অবশ্যই যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। বিশ্বাস-ঘাতকতা ও তোষামোদি চতুর্দিকে— ইংরেজি বইয়ের এ অধ্যায়ে প্রধানত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি ভেবে অবাক হয়েছেন যাঁরা একসময় পাকিস্তানের সমর্থক ছিল তাঁরা এখন কীভাবে বাংলাদেশ সমর্থন করে?

প্রথমে তিনি আলোচনা করেছেন সৈয়দ আলী আহসান সম্পর্কে। পুরো বইতে এই একজনের সম্পর্কেই তাঁর আলোচনা সঠিক। এটি কি এ কারণে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর আত্মীয় ছিলেন, নাকি এই প্রবাদটিই সঠিক যে রতনে রতন চেনে? তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে, নারায়ণগঞ্জে এক আত্মীয়ের `বাসায় সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে দেখা। আলী আহসান বলছিলেন, সামনে যা ঘটবে তা পাকিস্তানের জন্য শুভ নয়। হোসায়েনের

ভাষায়—

"He was known to be a wily, rather unscrupulous but extremely astute person."

'কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম অব পাকিস্তানের' সংগঠক ছিলেন আলী আহসান। যখন প্রমাণিত হলো, এটি সি আই এর টাকায় চলে তখন তা ভেঙে দেয়া হয়। আলী আহসান দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিষেধ করার দাবি জানান। এসব তথ্যের কোনটিই ভুল নয়। প্রায় ১৯৭১ পর্যন্ত সৈয়দ আলী আহসানের যে জীবনধারা তাতে ১৯৭১ ব্যতিক্রম। ১৯৭৫-পরবর্তী জীবনের সঙ্গে মিল আছে প্রাক্ ১৯৭১-এর। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, সৈয়দ আলী আহসান ঘটনাচক্রে মুক্তিযুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যদি ১৯৭৫ সাল-পরবর্তী তাঁর জীবনের সঙ্গে প্রাক্ ১৯৭১-এর মিল না থাকত তাহলে এ মন্তব্য করতাম না। দেখুন, এখনও তিনি সত্য নয় এমন মন্তব্য কত নির্দ্বিধায় করেন। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'যখন সময় এল' (১৯৭২)-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— "পাকিস্তান আমলে সমগ্র পাকিস্তানে একটি সাংস্কৃতিক একতা নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল। আমি তার বিরুদ্ধে ছিলাম এবং আমার বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখায় আমি সে কথা বলেছি। সেখানেই সজীবতার প্রশ্ন আসে সেখানেই বৈচিত্র্য এবং পার্থক্যের চিহ্ন ধরা পড়ে। আমরা পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মানুষকে এই বৈচিত্র্য মেনে নিতে বলেছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এই বৈচিত্র্য মেনে নিতে সাহসী হয়নি। যার ফলে বাংলাদেশের মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন করতে হল।" এখানে উল্লেখ্য, সাজ্জাদ হোসায়েনের আরেক কাজিন নেজামে ইসলামের কামরুল আহসানকেও ঐ সময় রাজাকার হিসেবে গ্রেফতার করা হয়।

ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক ছিলেন ভিন্ন ধরনের। হোসায়েন জানাচ্ছেন, ১৯৭০ সালে, করাচিতে ডঃ মল্লিক তাঁকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলেছিলেন। সাজ্জাদ হোসায়েনের মন্তব্য এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, অথচ পাকিস্তান না হলে মল্লিক লেকচারারই থাকত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি সংগঠন করেছেন অথচ পি-এইচ ডি করেছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের ওপর। "What a fall! What a tragedy! And what blindness!" পাকিস্তান না হলে তিনি (সাজ্জাদ হোসায়েন) কোথায় থাকতেন এবং কী পদমর্যাদায় তা অবশ্য উল্লেখ করেননি।

ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর বিরুদ্ধেও তাঁর ক্ষোভের অন্ত নেই কারণ তিনি ভি. সি. হবার পর সাজ্জাদ হোসায়েন সম্পর্কে কোন আগ্রহ দেখাননি। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রবল। হোসায়েন

ছিলেন তাঁর ছাত্র, পরে তিনি অধ্যাপক রাজ্জাকের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অধ্যাপক রাজ্জাক ছিলেন মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ্‌র সমর্থক। এ কারণে, তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ১৯৫০ সালে অধ্যাপক রাজ্জাক ইংল্যান্ড গেলেন, সাজ্জাদ নিজেও গিয়েছিলেন কিন্তু আশ্চর্য! দেখা গেল প্রথমজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে ফিরেছেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া উচিত যা তাকে বিস্মিত করে, শকড্ হন তিনি। হোসায়েন তাঁর শিক্ষককে বলেছিলেন, মাত্র ১৭ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। হোসায়েন লিখেছেন, এরপর অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর সঙ্গে কখনও কথা বলেননি।

প্রাক্ ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ সমর্থন করেনি কোন বাঙালি মুসলমান? সে পরিপ্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। শেখ মুজিবও মুসলিম লীগ করেছেন। ডঃ হোসায়েনের বক্তব্যের রেশ ধরেই বলা যায়, হিন্দুদের অত্যাচারের কারণে যদি পাকিস্তান হয় তা'হলে পাঞ্জাবিদের অত্যাচারের কারণে বাংলাদেশ হবে না কেন? এ যুক্তি রাজাকাররা বোঝেনি। যে অধ্যাপক রাজ্জাকের প্রচুর নিন্দা করেছেন তিনি বইতে, সেই অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছিলেন— "সাজ্জাদকে আমি অবশ্য স্নেহ করতাম। তবে কতকগুলো ব্যাপার আছিল সেখানে তাকে কথা শোনানো যাইত না।"

[সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ, ১৯৯৩]

## ১০

জেলের ভেতর রাজাকারদের সঙ্গে ১৯৭৩ পর্যন্ত তাঁর দিনগুলি কেমন কেটেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন সাজ্জাদ হোসায়েন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

জেলে না যাওয়ার আগে কেউ বোঝে না জেল কি জিনিস। জেল যে নরক, একথা কেউ বলে না, বলে জেল থেকে ফেরত আসার পর। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনও ব্যতিক্রম নয়। তাঁর চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'নরকের ভেতর'। সেই নরকের বর্ণনা করেছেন তিনি বিস্তারিতভাবে। তাঁর বিশেষ ক্ষোভ ছিল এই যে, রাজাকারদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। তাঁর মনে হয়েছে, জার্মানিতে নাজিরা যেমন বর্বরতা চালিয়েছিল, এখানেও তা চলছে।

জেলের ভেতর ছোটবড় সব ধরনের রাজাকাররাই ছিল। সাজ্জাদ হোসায়েনের সঙ্গে যাদের মোলাকাত হয়েছে তাদের বিররণ তিনি দিয়েছেন। প্রথমত তাঁর মনে হয়েছে, জেলের মতো নরকে যেসব রাজাকার আছে তাদের

সঙ্গে যে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে ঐ সব 'চমৎকার তরুণরা' ক্রিমিনালে পরিণত হবে। রাজাকারদের সবাই তাঁকে জানিয়েছিল, মুক্তি পেলে মুক্তিযোদ্ধাদের তারা দেখে নেবে। জেলে তাদের ঢোকানো হয়েছে এজন্য তারা ক্ষুব্ধ নয়। তারা পরাজিত হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে কেন? কেন পাকিস্তান তত্ত্ব তাদের প্রয়োগ করতে দেয়া হচ্ছে না? এটাই ছিল তাদের ক্ষোভ।

সাজ্জাদ হোসায়েনের মনে হয়েছিল, শেখ মুজিবও হিটলারের মতো 'ফাইনাল সলিউশন' ছাড়া আর কিছু চান না। তিনি একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছিলেন যা তখন বিশ্বের দাতব্যের ওপর নির্ভরশীল। শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, যোগাযোগ সব বন্ধ, কিন্তু মুজিব বলছিলেন, এগুলি সব চমৎকার 'অ্যাচিভমেন্ট'।

বলার অপেক্ষা রাখে না এবং ঐ সময়ের কাগজপত্র দেখলেও বোঝা যাবে 'প্রফেসর সাহেব' ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা লিখে যাচ্ছিলেন। বলে রাখা ভালো, রাজাকারদের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যা পরে আরো উদাহরণসহ আলোচনা করা হবে। শেখ মুজিব 'ফাইনাল সলিউশান' চাইলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতেন না। এবং ঐ সময়কার অবস্থা মুজিবের সৃষ্টি নয়, হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সৃষ্টি। শেখ মুজিবের মহানুভবতার জন্য সাজ্জাদ হোসায়েনের মতো হার্ডকোর রাজাকাররা বেঁচে গেছেন যা পরে জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়েছে। মুজিব 'ফাইনাল সলিউশন' চাইলে আজও পর্যন্ত রাজাকাররা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ দেশে-বিদেশে লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারতেন না।

জেলখানার অনেক দালালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল (তিনি 'কোলাবরেটর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন) তবে, সবার চালচলন দৃষ্টিভঙ্গি একরকম ছিল না। অনেকের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, আমি এখানে শুধু কয়েকজনের কথা উল্লেখ করবো।

শাহ আজিজ, তাঁর মতে সুবিধাবাদী। সবসময় দল বদল করেছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘক্ষণ তিনি কাঁদতেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত এক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় কাঁদতেন। মুসলিম লীগ নেতা, রাজশাহীর আয়েনউদ্দিন রাতের শেষযামে উচ্চস্বরে কাঁদতেন। কেন এতো উচ্চস্বরে কাঁদতেন? আয়েনউদ্দিনের মতে, যাতে খোদার করুণা হয়। সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে, তাঁদের অধিকাংশেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। থাকলে এতো কান্নাকাটি করতেন না। অনেকের কথা শুনে মনে হতো, আওয়ামী লীগের প্রচারণায় তারা প্রভাবান্বিত। প্রায়ই তারা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের কথা বলতেন। তাঁর মতে—

"....their lack of principle or conviction, their selfishness, the narrowness of their outlook, their inability even in jail to agree upon anything throw a revealing light upon the factors which had tended to the disintegration of Pakistan."

তারা ছিল, তাঁর মতে ক্ষুদ্র মানুষ। ঘটনাবলীর কারণে যাদের 'বিগ ইস্যুস'-এর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর চেয়ে দৃঢ়চেতা হলেও যে একাত্তরের ঘটনাবলী রোধ করা যেতো তা' নয়। কিন্তু কেন নয়, এর উত্তর তিনি দেননি এবং এ উত্তরের মাঝেই নিহিত পাকিস্তানের মৃত্যু ও বাংলাদেশের জন্ম। জ্ঞানপাপী হেতু তিনি এ উত্তরের মুখোমুখি হতে চাননি।

৬৫ বছরের খান সবুর সম্পর্কে তিনি নানা ধরনের যৌনবিকৃতি, অনাচার, চোরাচালানে জড়িত থাকার কথা শুনেছেন। তাঁর মতে, এর অর্ধেকও যদি সত্য হয় তা' হলে খান সবুর রাজনৈতিক নেতা হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু, খান সবুরের এসব ঘটনা রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন এমনকি বাইরের লোকজনও জানত। হোসায়েনের মন্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, যতদিন সবুর ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন তাঁর কাছে এগুলি বিশেষ কোন ঘটনা মনে হয়নি। খান সবুর জেলে আসার পর মনে হয়েছে এগুলি গুণাবলী নয়।

সাজ্জাদ হোসায়েনের পছন্দ হয়েছিল ফজলুল কাদের চৌধুরীকে, আজীবন যিনি পাকিস্তানের সেবা করে এসেছেন। তবে, তিনি দুঃখ পেয়েছেন যখন ফ. কা. চৌধুরী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সমর্থন করেছিলেন। এ ঘটনা শোনার পর "lowered Mr. Chowdhury in our eyes and saddened us." এটি ছিল চৌধুরীর একমাত্র দোষ। সাজ্জাদ প্রশ্ন তুলেছেন, কংগ্রেসের কোন নেতা কি এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারতেন? না, বরং নিজ আদর্শের জন্য তাঁরা কারাজীবন বা ফাঁসিকাষ্ঠ বেছে নিতে কুণ্ঠিত হতেন না। এই একবার সাজ্জাদ হোসায়েন নিজের অজান্তে 'হিন্দু'দের প্রশংসা করেছেন।

সাজ্জাদ হোসায়েনের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, জামায়তে ইসলামের শফিকুর রহমানকে, যিনি তাঁর মতে, ছিলেন বিনীত, ধার্মিক। অন্যদের তাঁর মনে হয়েছে, হিপোক্র্যাট।

উল্লেখ্য, তাঁর কাছে নিজেকে ছাড়া সবাইকে তুচ্ছ মনে হয়েছে, যে দু'জনকে ভালো লেগেছে তাদের একজন সাম্প্রদায়িক, জোর করে দখল করা সম্পত্তির মালিক। অপরজন রগকাটা রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে মানুষের একমাত্র গুণ বলে বিবেচিত হয়েছে পাকিস্তানের নীতির প্রতি অনুগত কি না।

জেলে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন জনের আলাপ হতো। আলাপ করে তাঁর ভালো লেগেছে পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নর মালেক-কে। মালেকের সঙ্গে আলাপ

করে তাঁর মনে হয়েছে, মালেক মন্ত্রিসভার যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এর ব্যর্থ হওয়ার কারণ এর 'মেডিওক্রেটি'। "The minister did not drew crowds ; their speeches inspired no idealism, their action produced no thrills."

সাজ্জাদ হোসায়েন বিশেষ ভক্ত খাজা খয়েরউদ্দিনের, যাঁর পিছে ব্যয় করেছেন তিনি একটি অধ্যায়। খাজা খয়ের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাই আইয়ুব খানের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু পাকিস্তানকে 'গৃহযুদ্ধের' মাধ্যমে ধ্বংস করতে চাননি। হোসায়েনের ভাষায়, 'হাজার হাজার' লোক তাঁর বক্তব্য সোনার জন্য কাঠগড়ায় ভিড় করেছিল কারণ ঐ বক্তব্য তাদের পছন্দ হয়েছিল। এ ছিল তাঁর মতে, আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, স্বৈরাচারের বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ। খাজা খয়েরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্মানিত হওয়ার জন্য নাকি হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। খাজা খয়েরের বিচার কথা শোনার পর তাঁর মনে হয়েছিল, মানুষের মন থেকে শোনার বাংলার মোহ কেটে যাচ্ছে। খাজা খয়ের ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হোসায়েনের মনে হয়েছে ভোটে কারচুপি না হলে খাজা খয়ের জিততেন, এবং তাঁর আরো মনে হয়েছে দেশ যেভাবে 'অ্যানার্কি ও প্যাগানিজম'-এর দিকে এগুচ্ছে সেক্ষেত্রে খাজা খয়েরই একমাত্র লোক যিনি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। আরো অনেক রাজাকারের কথা তিনি আলোচনা করেছেন, যাদের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের গুণাবলী খুঁজে পেয়েছিলেন এবং যারা এখন হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর যুক্তিগুলি শোনার মতো। রাজাকারতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে এসব মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুখলেসুর রহমান নামে একজন ছিলেন যিনি তেজগাঁয় একটি এতিমখানা করেছিলেন। রহমান ধর্মভীরু কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি 'ambivalent' তিনি ১৯৭১ সালের ট্যাজেডির নিন্দা করে পাকিস্তানি বাহিনী সম্পর্কে 'ক্রেডেস্ট' গল্পগুলি বলতেন। আওয়ামী লীগ একটি 'মিথ' তৈরি করেছিল। সেটি হলো পাকিস্তানিরা লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করেছে, হাজার হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। রহমানের এক ভক্ত তাঁকে বলেছিল, চাটগার এক ক্যাম্পে ৬০০ নগ্ন মহিলা পাওয়া গেছে। সাজ্জাদের প্রশ্ন, ঘটনাটি যদি সত্য হয় তা' হলে আওয়ামী লীগ তা কেন প্রচার করেনি যেক্ষেত্রে তারা বারবার বলছে, দুইলক্ষ মহিলা নির্যাতিত হয়েছে? এরকম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তো বিশ্বপ্রেসকে ইমপ্রেস করত। সাজ্জাদ হোসায়েনের এই ব্যাখ্যা শুনে মুখলেসুর রহমান বুঝলেন যে, আওয়ামী লীগ মিথ্যা বলছে।

সাজ্জাদ খানিকটা গর্ব করে লিখেছেন যে, ঢাকা জেলে এতো শিক্ষিত লোক আর আগে কখনও জড়ো হয়নি। এদের মধ্যে বিচারপতি থেকে ছাত্র

সবই ছিল। জেলের কর্মকর্তারা এতে নিশ্চয় অশান্তি বোধ করত। তাঁর ভাষায়—

"Hole them as they might, they knew, they were not criminals and intellectually and socialy much superior to themselves as well as to present ruling clique."

সাজ্জাদ, জেনারেল নিয়াজির মতো হানাদার বাহিনীর সেনাপতিদের প্রশংসা করেছেন। তাদের 'দৃঢ়তা' তাঁকে মুগ্ধ করেছে। রাজাকারদের অধিকাংশ ছিল মাদ্রাসার ছাত্র। এদের তিনি প্রশংসা করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে প্রশংসা করেছেন। লক্ষণীয় যে, তিনি নিজে কিন্তু মাদ্রাসা ত্যাগ করেছিলেন এবং নিজ সন্তানদের মাদ্রাসায় পড়াননি। একজন রাজাকার তাঁকে জানিয়েছিল, ১৯৭১ সালে সে আগরতলা গিয়েছিল ছদ্মবেশে এবং নিজের চোখে দেখেছে কীভাবে দাড়িওলা মুসলমানদের পাকিস্তানের সমব্যথী মনে করে ধরে এনে কালীর সামনে বলি দেয়া হতো। এ অভিজ্ঞতা সে রাজাকারের মন আরো ইস্পাতদৃঢ় করে তুলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে যারা দখল করেছে তাদের থেকে মুক্ত করতে। আসলে বলতে হয়, মুক্তিযুদ্ধ রাজাকারদের কাছে এমন ঘটনা যে, এর বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে ফ্যান্টাসির আশ্রয় নিতেও তাদের বাধেনি। এবং এ বিরোধিতা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে একবারও তাদের মনে হয়নি এ ধরনের ফ্যান্টাসি সৃষ্টি তাদের সৃষ্ট পুরো কাহিনীকেই নস্যাৎ করে দেয়।

সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁদের সমালোচনা করেছেন যাঁরা প্রাক্ ১৯৭১ পাকিস্তানের ভক্ত ছিল কিন্তু ১৯৭১-এর পর হোসায়েনের কাছে মনে হয়েছে তাঁরা আর যথেষ্ট পাকিস্তানভক্ত নন। যেমন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ।

তাঁর মতে, আইয়ুব আমলে প্রিন্সিপালের নির্জলা আইয়ুব-স্তুতি তাঁর পরিবার পরিজন থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব সবাইকে অপ্রস্তুত করেছে। আজীবন তিনি মুসলিম লীগ করেছেন কিন্তু এখন বলছেন, আওয়ামী লীগ তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেছে। অথচ, এর বিপরীতে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কথা ধরা যাক। তিনিও ছিলেন পাকিস্তানের দৃঢ় সমর্থক কিন্তু কখনও তা নিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। ব্যক্তির এমন ব্যক্তিত্বই প্রয়োজন।

দেওয়ান আজরফের ভূমিকাও তাঁর ভালো লাগেনি। ইব্রাহীম খাঁর মতোই তাঁর ভূমিকা। ইব্রাহীম খাঁর মেয়ে খালেদা এদিবও একই ভূমিকা পালন করেছেন। অথচ—"who had earned a notoriety in the Pakistani period as a woman of easy virtue, who used her sexual charm to seduce politicians."

দেখা যাচ্ছে, হোসায়েন তাঁর ক্ষোভ পূরণে ব্যক্তির চরিত্রহনন করতেও দ্বিধা করেননি। ওবায়দুল্লাহ মজুমদার বা মোনায়েম খানের মতো খাস

রাজাকারদেরও তিনি সমালোচনা করেছেন। কারণ, মজুমদারদের মতো অনেকে ১৯৭২ সালে বলতেন, ১৯৭১ সালে তাঁরা ভুল করেছেন। তিনি বিমোহিত হয়েছেন মাদ্রাসার ছাত্রদের আচার আচরণে। অকুণ্ঠিত প্রশংসা করেছেন তাদের। তাঁর ভাষায়, তাদের "cool poise, their impertorbable courage, their indomitable optimism were encouraging omens. These young men were determined no to let their ideals die."

সাজ্জাদ হোসায়েন মনে করেন, তাঁরা ভুল করেননি। ভুল করেছি আমরা বাঙালিরা। ভুল করেনি মাদ্রাসা পাশ রাজাকারারাও। ১৯৭১ সালে একমাত্র প্রশ্ন ছিল দল বড় না দেশ (জন্মভূমি) বড়। বা প্রাক্-১৯৭১ সালে যে রাজনীতি করেছেন তা ঠিক না ১৯৭১ সালে মানুষ যা চাচ্ছিল তা ঠিক? মানুষের জন্য রাজনীতি করলে তো শেষোক্তটিই সঠিক। এসব সংকটময় মুহূর্তে যিনি বা যাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেন তিনি বা তাঁরা এগিয়ে যান, বাকিরা নিক্ষিপ্ত হয় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ভাগ্যেও তা ঘটেছিল। নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন আস্তাকুড়ে।

## ১১

আজ থেকে এক দশক আগে প্রকাশিত হয়েছে হামিদুল হক চৌধুরীর *'মেমোয়ার্স'* বা স্মৃতিকথা। বর্তমান প্রজন্ম নিশ্চয় তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। সুতরাং তাঁর পরিচয় খানিকটা তুলে ধরা দরকার। উল্লেখ্য, তিনি যখন তাঁর স্মৃতিকথা লেখেন তখন তাঁর বয়স নব্বই। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেনারেশনের কাছে তাঁর পরিচয় বিভিন্ন রকম। এ প্রজন্মের যাঁরা একটু খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, তিনি বাংলাদেশের অন্যতম ইংরেজি দৈনিক 'বাংলাদেশ অবজারভারের' প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় সিনেমা সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'রও ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠাতা। যাঁদের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে তাঁদের কাছে হামিদুল হক চৌধুরী পরিচিত হানাদার পাকবাহিনীর অন্যতম সহযোগী হিসেবে যাঁকে জিয়া আমলে ফেরত দেয়া হয় নাগরিকত্ব ও সহায়-সম্পত্তি। আমাদের আগের জেনারেশন বা আমাদের বাবা-চাচারা হামিদুল হক চৌধুরীকে চেনেন মূলত একজন প্রভাবশালী মুসলিম লীগার হিসেবে, ভারত বিভাগের সময় যিনি র‍্যাডক্লিফ কমিশন থেকে ন্যায্য দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পাকিস্তানে তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

হয়েছেন এবং একসময় অপসারিত হয়ে 'অবজারভার'-এর মালিক হিসেবে দিনযাপন করেছেন। একজন মানুষের এতোগুলি পরিচয় তাঁর কৃতিত্বই তুলে ধরে, তা যে-ধরনের কৃতিত্বই হোক না কেন। চার্চিল যেমন বলেছিলেন, সমালোচিত হতে আপত্তি নেই কারণ আলোচিত হচ্ছি তো। সে পরিপ্রেক্ষিতে হামিদুল হক চৌধুরী একজন সফল ও কৃতী পুরুষ বটে।

এতটুকু পর্যন্ত হলে ঠিকই ছিল। কিন্তু, মুশকিল বাধিয়েছে ১৯৭১। চৌধুরী লিখেছেন, ১৯৭০ সালে তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধব তাঁকে স্মৃতিকথা লেখার অনুরোধ জানান। ১৯৭২ সালে প্যারিসে তিনি তা লেখা শুরু করেন। তা'হলে মাঝখানের বছরটিতে কী করলেন? ঐ সময় তিনি পাকি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে নিজের দেশ ও মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। এবং, তাঁর সারাজীবনের যা 'অর্জন' তা এক বছরেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। হানাদার বাহিনীর দালাল হিসেবে তিনি নাগরিকত্ব হারিয়েছিলেন। বসবাস করছিলেন বাইরেই। জেনারেল জিয়া রাজাকার পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করলে দেশে ফিরেছিলেন এবং নিজের আত্মজীবনী লেখা শেষ করেছিলেন। স্মৃতিকথায় তিনি তাই তুলে ধরতে চেয়েছেন যা তাঁর কাছে মনে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ।

নব্বই বছর বয়সে হামিদুল হক চৌধুরী ৩৮৬ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আত্মজীবনী লিখেছেন। আর কোন রাজাকার এত দীর্ঘ আত্মজীবনী লেখেননি। সেদিক থেকে বিচার করলেও *মেমোয়ার্স* আলোচনার দাবি রাখে। এ আত্মজীবনী আদালতের সামনে দেয়া জবানবন্দীর মতো। বইটি পড়ে মনে হয় জনাব চৌধুরী অনেক বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান। কিন্তু কেন? কারণ, দীর্ঘ ন'দশক পর তাঁর মনে হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তাঁর কিছু বলা দরকার। এবং একজন দক্ষ আইনজীবীর মতো তিনি তাঁর বিবৃতি দিয়েছেন। হামিদুল হক চৌধুরীর জবানিতে আমি প্রথমে সংক্ষেপে তাঁর জীবনকাহিনী ও বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করবো।

## ১২

নোয়াখালী জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রাম রমনগরে এ শতকের শুরুতে হামিদুল হক চৌধুরীর জন্ম। তাঁর দাদা মহাজনি কারবার করে বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। বিশেষ করে নুনের ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে তিনি অনেক অর্থ

উপার্জন করেছিলেন। তাঁর বিত্ত ডাকাতদের প্রলুব্ধ করেছে এবং কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছে সেই বাড়ি। চৌধুরীর পিতাও কিছুদিন চালিয়েছিলেন মহাজনি ব্যবসা। হামিদুল হকের পিতা বিয়ে করেছিলেন দু'বার। প্রথম পত্নীর গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। সমসাময়িক যুগের তুলনায় তাঁর পিতা ছিলেন উদারভাবাপন্ন। কবি নবীনচন্দ্র সেন যখন নোয়াখালীতে কর্মরত তখন তাঁর পিতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কবির এবং তিনি তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের জন্য। এ কারণে চৌধুরীর পিতা বাড়িতেই বাসিয়েছিলেন স্কুল। সেই স্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন তাঁর বড় ভাই আজিজুল হক ও চাচাতো ভাই আরিফুর রহমান। পরে স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন আজিজুল হকের ছোট নুরুল হক। ১৯০৮ সালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর পিতার। হামিদুল হকের বয়স তখন মাত্র সাত। তাঁর অনেক ভাইবোনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন নয়জন।

এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় তাই হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চাচারা দখল করে নিয়েছিল সব সম্পত্তি। তখন মা-ই সংসারের হাল ধরে তাঁদের বড় করেছেন। হামিদুল হক চৌধুরী এজন্য কৃতজ্ঞ তাঁর মায়ের কাছে। আত্মজীবনীতে একটি আলোকচিত্র আছে—বৃদ্ধ বয়সে চৌধুরী তাঁর মায়ের 'ক্লেমাস্ক' গড়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আত্মজীবনীতে তাঁর ব্যক্তিগত ছবি ও স্ত্রী- কন্যাদের ছবি ছাড়া আত্মীয়স্বজনের কোনো ছবি নেই, এমনকি তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন যে দু'ভাই তাঁদেরও কোন ছবি নেই বইতে, যদিও মুদ্রিত ছবির সংখ্যা ত্রিশ। জনাব চৌধুরীর মন-মানসিকতার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় এ থেকে।

প্রথম দিকের অধ্যায়ে হামিদুল হক চৌধুরী উনিশ শতকের শেষ দিকের বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। এতে সমাজের, বিশেষ করে মুসলমানদের একটি খণ্ডচিত্র পাই। জানতে পারি কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য। যেমন, এ শতকের প্রথম দিকেও আলু, টমেটো বা কপি কি জিনিস বাংলাদেশের মানুষ তা জানত না।

হামিদুল হক চৌধুরীর বড় দু'ভাই তখন পূর্ববঙ্গের বাইরে পড়াশোনা করতেন। সবচেয়ে বড় ভাই আজিজুল হক রাজনৈতিক কারণে বি. এ. পাশ করতে পারেননি কিন্তু তাঁর মেধা দেখে তাঁকে পুলিশের ডি. এস. পি. হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর প্রথম পোস্টিং ছিল ঢাকায় এবং তারপর মুন্সিগঞ্জে। হামিদুল হককে তিনি নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে রেখে পড়াবেন বলে। কিন্তু ভাবীর পীড়নে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এ পর্যায়ে হামিদুল হক চৌধুরী একটি ভুল তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, মুন্সিগঞ্জের এস. ডি. ও. থাকতেন ব্রিটিশ বণিক ও নীলকরদের নির্মিত একটি

দুর্গে। আসলে তা নয়, ঐটি ছিল মীর জুমলার নির্মিত মোগল যুগের দুর্গ—ইদ্রাকপুর দুর্গ।

তার পরের ভাই নুরুল হক প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে আরো অনেক মুসলমান যুবকের মতো গিয়েছিলেন আলীগড়ে পড়তে। এবং সেখানে বি. এ. পড়ার সময় রাজনৈতিক কারণে, মওলানা মহম্মদ ও শওকত আলী এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সঙ্গে বাধ্য হন আলীগড় ছেড়ে আসতে। তারপর নুরুল হক আইন পড়া শুরু করেন কলকাতায়। আইন পাশ করে শুরু করেন ওকালতি। আইন পড়ার সময় নুরুল হক মুন্সিগঞ্জে বড় ভাইয়ের ওখানে বেড়াতে গেলে ছোট ভাই হামিদুলকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়।

হামিদুল হক চৌধুরী স্পষ্টভাবে না বললেও বোঝা যায় যে, এ শতকের বিশ ত্রিশের দশকে মুসলমান সমাজে নুরুল হক ছিলেন পরিচিত এক ব্যক্তিত্ব। না হলে রাজনৈতিক কারণে তাকে শওকত আলী বা খালিকুজ্জামানের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে কলেজ ছেড়ে চলে আসতে হতো না। নুরুল হক যখন আইন-ব্যবসা শুরু করেছিলেন তখন নবাব সলিমুল্লাহ তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে আসতে। কারণ, নবাব চেয়েছিলেন তাঁর আইনগত উপদেষ্টা ছাড়াও মুসলিম রাজনীতির বিকাশে নুরুল হক যেন তাঁকে সাহায্য করেন। নুরুর হক প্রথমে আসতে না চাইলেও পরে নবাবের পীড়াপীড়িতে রাজি হয়েছিলেন। ঢাকায় স্থিত হয়ে বসার আগেই নবাব পরলোকগমন করলেন। নবাবের ইংরেজ ম্যানেজার নবাবের অঙ্গীকারকৃত সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দিতে চাইলেন না। ইতিমধ্যে হামিদুলও ১৯১৭ সালে এসে ভর্তি হয়েছেন কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯১৮ সালে নুরুল হক চলে এলেন কলকাতায়। হামিদুলও ম্যাট্রিক পাশ করে এসে ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চে। তারপর, প্রেসিডেন্সীতে সুযোগ হলে প্রেসিডেন্সীতে এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেন বি. এসসি. ১৯২৫ সালে। তার পরের বছর ল' কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৯৩০ সালে ভাই নুরুল হকের অধীনে শুরু করেছিলেন আইনব্যবসা। এ পর্যায়ে ছাত্রজীবনের বর্ণনা, আয়-ব্যয়ের হিসাব আছে যা সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রয়োজনীয়। তবে, এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, হামিদুল হককে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ব্যাপারে তাঁর ভাই নুরুল হকের অবদান প্রভূত যা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। হামিদুল হক চৌধুরীর দু'তিনজন আত্মীয়ের কাছে জেনেছি, তাঁর ভাই নুরুল হকের সময় থেকেই তাঁদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছিল। শুধু তাই নয়, এ পর্যায় পর্যন্ত বর্ণনায় তাঁর পরিবার-পরিজন, ভাইবোন কারো কথাই আসেনি। কেন জানি তিনি এদের সবাইকে অস্বীকার

করতে চেয়েছিলেন, নুরুল হকের কথাও বাধ্য হয়েই যেন বলতে হয়েছে। এ থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ মন-মানসিকতার বিষয়টিও আঁচ করা যায়।

## ১৩

১৯১৯ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যেসব ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন হামিদুল হক চৌধুরী, তাঁদের বর্ণনা দিয়েছেন এরপর। এঁদের মধ্যে আছেন সুভাষ বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, সোহরাওয়ার্দীর ওপরই পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন তিনি বেশি। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২৩ অথবা ১৯২৪ সালে। ওয়েলেসলি স্ট্রিটে মুসলিম ইন্সটিটিউটে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। হামিদুল হক চৌধুরী বক্তৃতা দিচ্ছেন, হঠাৎ সেখানে কয়েকজন চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে প্রবেশ করলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ঢুকেই তিনি বক্তৃতা দিতে চাইলেন। বক্তৃতা দিতে দিতেই চৌধুরী তাঁকে বললেন অপেক্ষা করতে। সোহরাওয়ার্দী তা না শুনে মঞ্চে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে শেষ হলো মিটিং।

রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর উত্থান সম্পর্কে তিনি দু'টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি, কলকাতার বিখ্যাত গুণ্ডা মিনা পেশোয়ারির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অন্যটি, হগ মার্কেটে এক অচেনা ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁকে মুসলমান দাবি করে কবর দেবার আয়োজন, যে কারণে প্রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী পরিবারকে অপদস্থ করার জন্য তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা শুনেছিলেন আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, নামের শেষে সোহরাওয়ার্দী শব্দটি ব্যবহার শুরু করেছিলেন পারিবারিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য। হামিদুল হকের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তির জানা উচিত ছিল, সোহরাওয়ার্দীর দাদা ছিলেন ওবেদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী যিনি ছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ। সুফি তরিকার ভক্ত বিধায় সোহরাওয়ার্দী নামটি যুক্ত করেছিলেন তিনি নিজ নামের সঙ্গে। তাঁকে বলা হতো খাঁটি ভদ্রলোক। কারণ মৃত্যুর সময় তাঁর পরিবারের কাছে দাফনের পয়সাও ছিল না।

হামিদুল হক চৌধুরী আদালতে ফজলুল হকের জুনিয়র হিসেবেও কাজ করেছিলেন। কিন্তু হক সাহেবের কার্যকলাপ তাঁর পছন্দ হয়নি। যেমন, চৌধুরী হয়ত মক্কেলের সঙ্গে এক ধরনের ফি ঠিক করে পাঠালেন ফজলুল হকের

কাছে; ফজলুল হক হয়ত তখন তা কমিয়ে নিলেন। এ ধরনের আচরণ চৌধুরীর কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়ে হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ রেখেছেন। জানিয়েছেন, এ সময় তিনি গভীরভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভালো কথা। কিন্তু রাজনীতিতে তিনি এলেন কীভাবে তার কোন বিবরণ কিন্তু তিনি দেননি। কেউ কি কোনকিছু না করে রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে বা জড়াতে পারে? মনে হয়, হামিদুল হক চৌধুরী, তাঁদের কোন বিবরণ রাখতে চান না যাঁদের সাহায্যে তিনি এসেছিলেন রাজনীতিতে। তবে মনে হয়, প্রধানত তাঁর ভাই নুরুল হকের মাধ্যমেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করে প্রভাবশালী হতে পেরেছিলেন।

তবে এ প্রসঙ্গে স্মৃতিকথার ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন তা উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন, "রাজনৈতিক জীবনে আমার অনেক সমর্থক এবং বন্ধু ছিলেন আবার রাজনৈতিক অনেক প্রতিপক্ষ এবং শত্রুও ছিলেন। জীবনের শুরুতে বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি কারণ আমি ছিলাম ভালো শ্রোতা।"

পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে থাকে তখন তিনি হয়ে উঠলেন, "more assertive and perhaps lost much, not cultivating the virtue of patience and accomodation. Though I never understood many with whom I had worked closely in politics, yet I somehow carried on with them. I considered ideas as being more important than becoming too vocal. In politics I had a life of constant struggle for my ideas and objectives. Much of the time I had to fight alone making more than ones normal share of enemies."

এ বক্তব্য প্রায় সঠিক। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌছার জন্য তাঁকে একা সবসময় যুদ্ধ করতে হয়েছে এ বক্তব্য কতটা ঠিক? আদর্শটা কী ছিল? ১৯৪৭. এর আগে পাকিস্তান হাসিল। এবং সেক্ষেত্রে হামিদুল হক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তিত্ব ছিলেন না বা তাঁর আলাদা কোন বক্তব্যও ছিল না। আর লক্ষ্য? লক্ষ্য ক্ষমতায় থাকা। ক্ষমতায় থাকতে না পারলেই চৌধুরীর মনে হয়েছে, তাঁর 'সঠিক বক্তব্য' কেউ অনুধাবন করতে পারছে না। হামিদুল হক চৌধুরী বর্ণিত পরবর্তী ঘটনাগুলিতে আমরা সেই ইঙ্গিতই পাই।

রাজনীতিতে প্রথমে 'নিরপেক্ষ' থাকলেও পরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে, কারণ, "আমি খুব শীঘ্রিই দেখলাম, খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে যে গ্রুপ তার সঙ্গে আমি ভালো কাজ করতে পারি বা সেখানে নীতিগত বা অন্য যে-কোন বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারি।" ফজলুল হকের ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন এ কারণে যে, তিনি একবার ফজলুল হকের

পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিতব্য 'কুকুর দৌড় প্রতিযোগিতা' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চাঁদা তোলার জন্য ফজলুল হকের কিছু ভক্ত এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল।

এর মধ্যে হলো কলকাতায় দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য তিনি তখন অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। আর সোহ্‌রাওয়ার্দী এ দাঙ্গা দমনে পালন করেছিলেন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। এ অধ্যায়ে এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন, '"মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী লীগ হলো। তারপর কিছু হিন্দুকে নেয়ার জন্য মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হলো।" জনাব চৌধুরী দাঙ্গা দমনে তাঁর ভূমিকার কথা যা-ই লিখুন না কেন, এ মন্তব্যে তাঁর মন-মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারত বিভক্ত হলো, কারণ, ক্যাবিনেট মিশন ব্যর্থ হলো। এবং তাও কংগ্রেসের জন্যে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন চৌধুরী। লিখেছেন তিনি, কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে যেমনটি করেছিল, ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগও ঠিক একই কাজ করেছিল। ১৯৭১ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তারা ঘোষণা করেছিল শাসনতন্ত্র তৈরি করবে, অন্যেরা কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না। এ ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভুট্টোকে। তারই পরিণাম পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের সৃষ্টি।

র‍্যাডক্লিফ মিশন যখন ভারত বিভাগে ব্যস্ত তখন মুসলিম লীগ থেকে হামিদুল হক চৌধুরীকে ভাগ-বাঁটোয়ারা দেখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি কারো সাহায্য সহযোগিতা পাননি। অবশ্য প্রধান উপস্থাপক ছিলেন জনৈক অবাঙালি ওয়াসিম যিনি "শুনানি শুরু হবার পরের দিনই ভেঙে পড়ে বললেন, এ কাজ আমি পারবো না কারণ আমার পক্ষে এই ভূগোল, নদীর নাম কিছুই মনে রাখা সম্ভব নয়।" চৌধুরী বাংলার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন দিল্লিতে, লিয়াকত-জিন্নাহর কাছে। কাউকে পাননি। ফলে, পূর্ব বাংলার বা বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ দেখার জন্যে কেউ রইলেন না। এগিয়েও আসেননি কেউ হামিদুল হক চৌধুরী ছাড়া। ঐ সময়, দুঃখ করে লিখেছেন তিনি, সোহরাওয়ার্দী বা অন্যান্যের সহযোগিতা পেলে পূর্ববঙ্গের সীমানা আরো বৃদ্ধি পেত। অথচ যাঁরা বাঁটোয়ারার সময় নিষ্ক্রিয় ছিলেন বা কোনো রকম সাহায্য সহযোগিতা করেননি তাঁরাই পরে মায়াকান্না কেঁদেছেন বাংলাদেশের জন্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "বাঙালিরা খুব কমই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দেখিয়েছে।" ফজলুল হক সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "মুসলমান বাংলার জন্য যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দরকার ছিল তা তাঁর ছিল না। মানুষের সমস্যা বোঝার ক্ষমতাও তাঁর তেমন ছিল না। সবসময় তিনি তাঁর তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে চাইতেন।"

দেশ ভাগ হলো, হামিদুল হক চৌধুরী ঢাকায় এলেন, প্রাদেশিক মন্ত্রী হলেন অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পারতেন। হননি, কারণ পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল তাঁর কাম্য। বরং ফজলুর রহমানকে পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রে যিনি পরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। লিখেছেন চৌধুরী, "আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভার নিলাম এ কারণে যে, ভাবলাম, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও কনসেপ্টে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারব। ক্যাবিনেট গঠন করা হয়েছিল তাতে সত্যিকারের কোন ট্যালেন্ট ছিল না। "ইন ফ্যাক্ট নান ওয়াজ এভেইলেবল আউটসাইড।"

পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও পূর্ববঙ্গবাসীর সমর্থন পেয়েছিল। লিয়াকত আলি এ ব্যাপারটি পছন্দ করেননি। আর যিনি ফজলুর রহমানকে রাজনীতি ও মন্ত্রিত্বে সহায়তা করেছিলেন তিনিও তখন চলে গিয়েছিলেন বিরুদ্ধে। ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্র-প্রদেশে শুরু হলো মনকষাকষি। হামিদুল হক যাতে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারেন সেজন্যে সচেষ্ট হলেন লিয়াকত আলি। অথচ হামিদুল হকেরই যোগ্যতা ও কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার। কারণ, পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় হামিদুল হক ছিলেন উচ্চকণ্ঠ যা পছন্দ ছিল না লিয়াকতের। এবং যে নাজিমুদ্দিনের প্রতি তাঁর ছিল এতো শ্রদ্ধা তিনিই হাত মেলালেন লিয়াকত আলির সঙ্গে। রাজনীতিতে এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে হতাশ করেছিল। ১৯৪৯ সালের মধ্যে তিনি প্রকাশ করলেন অবজারভার। কিন্তু পূর্ববাংলার মুখ্যসচিব আজিজ আহমদ, খাজা পরিবার, সবাই লাগল তাঁর বিরুদ্ধে। অবজারভার শুরু থেকে কেন্দ্র-প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে লিখছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মন্তব্য, প্রথম থেকেই যদি এদিকে নজর দেয়া হতো তা হলে এই ট্র্যাজেডি আর ঘটত না। পঁচিশ বছরের অদূরদর্শী নীতি দেশকে ভেঙে দিয়েছে। পাকিস্তান যারা ভাঙতে চেয়েছে তারা সরকারের এই ভুল নীতিকে ব্যবহার করেছে।

তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধ আরো তীব্র হলো। লিয়াকতের এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে চৌধুরী তাঁর প্রশাসনিক নীতি, লেখা, বক্তৃতায় বাঙালির আত্মস্বার্থ বিকাশে সচেষ্ট। কেন্দ্র পূর্ববাংলার শিল্পায়নে বাধা দিচ্ছিল এবং বড় বড় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীও তাতে যোগ দিয়েছিল।

এরপর বর্ণনা করেছেন অবজারভার প্রকাশের ঘটনা ও এর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের একাংশ ও ঢাকার খাজা পরিবারের চক্রান্ত। উর্দু পত্রিকাও বের করেছিলেন তিনি। ভাষা আন্দোলনের সময়, তাঁর ভাষায়, "আমি কোনো পক্ষ

নিইনি।" আবদুল গণি হাজারী সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁকে তিনিই চাকরি দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন, উন্নতির সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেই হাজারী পরে শেখ মুজিবের সহযোগিতায় অবজারভার অধিগ্রহণ করে নিজেই কর্তা হয়ে বসেছিলেন। স্বাধীনতার পর শত্রুসম্পত্তি হিসেবে অবজারভার অধিগ্রহণ করায় খুব ক্ষুব্ধ হামিদুল হক চৌধুরী। তাঁর মতে, তিনি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ছিলেন দেখে এমনটি হয়েছে। সেই সময় কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে পনেরো থেকে বিশ গুণ। হামিদুলের এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, অবজারভার কর্মচারীদের তিনি কীভাবে শোষণ করতেন। কারন ১৫/২০ গুণ বেতন বাড়াবার পরও অবজারভারের ক্ষতি হয়নি।

১৯৪৯ সালে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হলো কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি সরকার। লিখেছেন তিনি—

"একজন পূর্ব বাঙালিকে কেন্দ্র করে 'প্রডার' অধীনে আমারটিই ছিল একমাত্র মামলা এবং মর্নিং নিউজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার আগে সাধারণ মানুষ জানতো না যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমার মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য আছে। কিন্তু মামলা চলাকালে সাধারণ মানুষের মনে এ মামলা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল কারণ তারা পূর্ববঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিল। সাধারণ মানুষের মতো রাজনৈতিক নেতারা এটা অনুধাবন করেনি। ব্যক্তিগত ঈর্ষা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।"

এরপর আলোচিত হয়েছে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা। ১৯৫০-৫৫ সালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সোহরাওয়ার্দী প্রায় সবসময়ই নিজ স্বার্থে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কিন্তু হামিদুল হক চৌধুরী কখনও এমনটি করেননি।

১৯৫৫ সালে হামিদুল হক চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর পীড়াপীড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। শর্ত ছিল তাঁকে অর্থ মন্ত্রণালয় দিতে হবে। কিন্তু শপথ নেয়ার পর দেখা গেলো তাঁকে দেয়া হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। ইস্কান্দার মীর্জার কারণে এটি করা হয়েছিল। কী আর করা! পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চালাতে লাগলেন, সঙ্গে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ। শাসনতন্ত্র প্রণীত হলো। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। আওয়ামী লীগ নাকি বাধা দিতে লাগল। এর মধ্যে একটি ইঙ্গিত আছে। তা হলো আওয়ামী লীগের এ বাধা আমলাতান্ত্রিক শাসনকেই দীর্ঘায়িত করছিল।

শাসনতন্ত্র পাশ হলো। ইস্কান্দার মীর্জা প্রেসিডেন্ট হতে চান। কথা ছিল তা হবে পূর্ববাংলা থেকে। কিন্তু মীর্জা জানালেন তিনি পূর্বাঞ্চলেরই কারণ তিনি মীর জাফরের বংশধর (কথাটি বোধহয় সত্যি, অন্তত তাঁর পরবর্তী আচরণ তাই বলে)। আইয়ুব খান সে সময় থেকেই বলছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান,

পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে বেরিয়ে যেতে পারে। আইয়ুব খানের অবসর নেয়ার সময় হলে তাঁর চাকরির মেয়াদ বাড়াবার বন্দোবস্ত করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী। এই সময় শুরু হয় সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ থামাবার ও শান্তিচুক্তি প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা ছিল হামিদুল হক চৌধুরীর।

এরপর শুরু হলো আইয়ুবি রাজত্ব। চৌধুরীকে আইয়ুব যতভাবে পারলেন করলেন অপদস্থ। আস্তে আস্তে রাজনীতি থেকে সরে যাচ্ছিলেন বা জোর করে তাঁকে রাজনীতিচ্যুত করা হচ্ছিল। ১৯৬৯ সালে আবার 'ড্যাক' গঠিত হলো। তিনি ফিরে এলেন রাজনীতিতে। '৭১ পর্যন্ত ছিলেন রাজনীতিতে। কিন্তু কী সে রাজনীতি? শোনা যাক তাঁর জবানিতে।

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে তাঁকে ডেকেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন ইয়াহিয়াকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অগ্রাধিকার দিতে। শাসনতন্ত্র তৈরি করবেন সেসব বুদ্ধিজীবী যাঁদের ওপর আছে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। কিন্তু চৌধুরীকে হতাশ করে ইয়াহিয়া জানালেন নির্বাচিতরা প্রণয়ন করবে শাসনতন্ত্র। তিনি না দমে ইয়াহিয়াকে বললেন পুরনো রাজনীতিবিদদের দিয়ে একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করতে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের কথা তুলেছিল কিন্তু এর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মূলত তারাই দায়ী। ১৯৭০-এর নির্বাচনে শেখ মুজিব তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন যা তিনি চাননি। 'পূর্বদেশ' ও 'অবজারভারের' মাধ্যমে দেশসেবা করতে চেয়েছেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়— তাঁর ভাষায়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, সরকার পারল না তা নিয়ন্ত্রণ করতে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে কোন জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত ছিল না। আওয়ামী লীগ ছিল না দূরদর্শী। তাদের উচিত ছিল যেভাবেই হোক পার্লামেন্টে বসে তাদের কাজ করে নেয়া। কিন্তু তারপর কি হলো? ৩১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসবের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তারপর হঠাৎ তাঁর বর্ণনার আকার হয়ে গেলো বাদামের খোসার মতো ছোট। লিখেছেন তিনি— ১৯৬৯-৭১-এর রাজনৈতিক অবস্থার অবনতি এবং বিশৃঙ্খলা মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল অর্থনীতির ওপর। কলকারখানা প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির। সরকার অকার্যক্ষম। কৃষকরা ফসল পর্যন্ত তুলতে পারল না ঘরে। চারদিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। অন্যদিকে, সেনাবাহিনীর কার্যক্রম বিভিন্ন দেশে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আন্তর্জাতিক জনমত এতো শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠল যে পাকিস্তানকে খাদ্যসহ সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার কথা হলো। ব্যাপারটা বেশ প্যারাডকসিক্যাল, কারণ পূর্ব পাকিস্তানই ছিল প্রধানত বিদেশী খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল এবং তা বন্ধ হয়ে গেলে পূর্ব পাকিস্তানীদের বেশি কষ্ট পেতে হতো।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে খাদ্য অষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। সরকার কিছুই করতে পারছিল না। তাদের সমস্ত ক্রেডিবিলিটি ফেলছিল হারিয়ে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় দুর্যোগ এড়াতে চৌধুরী সরকারকে পরামর্শ দিলেন জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়নের জন্য এমন সব লোককে বাইরে পাঠানো দরকার যাদের সঙ্গে সরকারের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। তারপর— "যখন আমাকে কয়েকটি দেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান হলো তখন আমি জানালাম সরকারের পক্ষে আমি কিছু বলব না বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব না এবং অবস্থা পর্যালোচনা ক্ষেত্রে আমার মূল্যায়ন হবে স্বাধীন। জুন ১৯৭১ সালে তাই যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অন্যান্য দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম।"

বিদেশ ভ্রমণ কালে অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে চৌধুরী হাত মিলিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন সমর সেনকে। বলেছেন তাঁকে, ভারতের উচিত নয় পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো। তারপর করাচি ফিরে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁকে জাতিসংঘে যেতে হবে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে। তিনি প্রতিনিধিদলের তালিকা দেখলেন, পছন্দ হলো না। তালিকার পরিবর্তন করতে বললেন সরকারকে। সরকার রাজি নয়। তাই তিনি আর গেলেন না জাতিসংঘে। "ভারতীয় এবং রুশরা যখন দেশ ভাঙ্গতে দৃঢ়- সংকল্প" তখন তিনি লন্ডনে। আর আওয়ামী লীগ হয়ত দেশ ভাঙতে চায়নি কিন্তু "ক্ষমতার হাতছানি উপেক্ষা করা মুশকিল।" আরো লিখেছেন— "যদি ভারতীয় বাহিনী ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে দখল করে না নিত তাহলে পাকিস্তানের আইনগত অস্তিত্ব থাকত। ১৯৭১ সালে, পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক বিশৃঙ্খলার কারণে, ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জয় করে নেয় ঢাকা।"

হামিদুল হক চৌধুরীর ভাষায় এভাবে সৃষ্টি হলো বাংলাদেশের। কী আর করেন তিনি, চলে গেলেন করাচি। তাঁর সরকারের মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ যিনি তাঁকে জড়িয়েছিলেন দুর্নীতির মামলায় সেই আজিজ আহমেদ এবার তাঁকে বেশ সমাদর করলেন। আইনব্যবসাও জমে উঠল। তারপর একসময় ফিরে এলেন বাংলাদেশে। বিচারপতি সাত্তার একসময় তাঁর জুনিয়র ছিলেন। সাহায্য করলেন তিনি। সেই থেকে জনাব চৌধুরী সেখানেই ছিলেন, সহায়-সম্পত্তি ফিরে পেয়েছেন এবং অবসর সময়ে স্মৃতি-কাহিনী রচনা করেছেন। তবে, চৌধুরী তখনও বাংলাদেশের আইনগত ভিত্তি স্বীকার করেননি।

এবার অতি সংক্ষেপে দেখা যাক তাঁর মূল বক্তব্য কী—

১. আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম, সেজন্য তিনি গ্রহণ করেছেন আইন ব্যবসা। রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন কিন্তু সবসময় রাজনীতি বিচার করেছেন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে।

২. তাঁর সমসাময়িক যাঁরা রাজনীতি করতেন, কেউ তাঁর সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, বুদ্ধিবৃত্তিক সামান্য ভিত্তিও তাঁদের ছিল না। সবসময় ছিলেন তাঁরা হানাহানিতে ব্যস্ত। এ. কে. ফজলুল হক, আবুল হাশিম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান— সবাই ছিলেন ছোট মাপের লোক।

৩. তিনি কখনও মন্ত্রিত্ব চাননি। কিন্তু বারবার মন্ত্রিত্বের বোঝা চেপেছে তাঁর ঘাড়ে। তবে মন্ত্রিত্ব নিতে যখন বাধ্য হয়েছেন তখন অর্থ মন্ত্রণালয়কেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৪. তিনি সবসময় পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান এবং জনগণের কথা ভেবেছেন। ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিভাগ তাঁকে মর্মাহত করেছে, পরবর্তী কালে পশ্চিম পাকিস্তানী ঔদাসীন্য তাঁকে আহত করেছে। সবসময় তিনি পূর্ববঙ্গের পক্ষে বলেছেন, যে কারণে, পাকিস্তানী আমলে তাঁকে মন্ত্রিত্ব হারাতে ও নাজেহাল হতে হয়েছে।

৫. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এ কারণে, প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ তো সবসময় বাধা দিয়েছে, পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে আমলাতান্ত্রিক শাসন বিস্তারে।

৬. আওয়ামী লীগ আসলে পূর্ববাংলার জন্য কিছুই করেনি। এ দলের নেতা শেখ মুজিবরের তেমন কোনো গুণাগুণ ছিল না।

৭. ১৯৬৯-৭১ সালে পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে, আওয়ামী লীগের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য শুরু হয়েছিল বিশৃঙ্খলা। পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দিল খাদ্যাভাব। পূর্বাঞ্চলে যাতে সাহায্য অব্যাহত থাকে সেজন্য তাঁকে যেতে হলো বিদেশে। এরি মধ্যে ভারত পাকিস্তানকে করে ফেলল দু'টুকরো।

৮. তাঁকে থেকে যেতে হলো পাকিস্তানে। পরে তিনি আবার ফিরে এলেন ঢাকায়। কিন্তু তিনি মনে করেন, এখন যাকে বাংলাদেশ বলা হয় সেদেশের এবং শাসনতন্ত্রের তেমন কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এই যে আইনগত ফাঁক, এ কারণেই বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে হানাহানি, দুর্দশা।

## ১৪

**আত্মজীবনীতে 'আমি' থাকবেই এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব ঘটনা যদি 'আমাকে' কেন্দ্র করেই হয়, সবকিছুতেই যদি 'আমাকে' থাকতে হয়, সমাজ**

সংসার ছাড়িয়ে যদি শুধু আমি-ই থাকি, তাহলে আত্মজীবনীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। কারণ সে আত্মজীবনীতে শুধু আমি থাকে, সমাজ সংসার রাজনীতি থাকে না। কিন্তু 'আমি' কে, যে তাঁর আত্মজীবনী পড়তেই হবে? আত্মজীবনী লোকে পড়ে এ কারণে একজন 'আমি'র সময়কার সমাজের কথা জানতে। কিছু ঘটনাবলীর তথ্য জানতে। জনাব চৌধুরীর বইতে 'আমি'র পরিমাণটা এতো বেশি যে চোখে লাগে। অনেক সময় মনে হয়, পুরো বইয়ে সবকিছু ছাপিয়ে শুধু চিৎকারধ্বনি 'এই যে আমি', 'এই যে আমি।'

এ ছাড়াও একটা আত্মজীবনী কতোখানি মূল্যবান তা বিচার করার সরল আরেকটি মাপকাঠি আছে। সেটি হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কিছু ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। তাতেই বোঝা যাবে, আত্মজীবনীতে তিনি যা বলছেন তা কতোটা সত্য। প্রথমে আলোচনা করবো জনাব চৌধুরীর মূল বক্তব্য নিয়ে তারপর উল্লিখিত সরল পরীক্ষাটি করা যাবে।

হামিদুল হক চৌধুরীর লেখায় এটি স্পষ্ট যে, তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিবিদরা কেউ বড় মাপের ছিলেন না ; তাঁর সমকক্ষ তো নয়ই। অথবা তিনি ছিলেন 'দৈত্য', বাকিরা সব 'বামন'। একথা অস্বীকার করতে পারেন, এমন সব 'বামন রাজনীতিকদের' অধিকাংশ আজ পরপারে। তবে তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন আত্মজীবনী লিখে গেছেন। এরকম কয়েকজন 'বামন রাজনীতিবিদের' আত্মজীবনীতে দেখা যাক, ঐ আমলের 'দৈত্য' চৌধুরী সম্পর্কে তাঁরা কী লিখেছেন। এঁরা হলেন, আবুল হাশিম, আবুল মনসুর আহমেদ, সোহরাওয়ার্দী ও কামরুদ্দীন আহমদ। এঁদের লেখা চারটি বই-ই বিখ্যাত, প্রশংসিত এবং বিশ্বাসযোগ্য উপাদান হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। প্রথমে ধরা যাক, আবুল হাশিমের কথা। তাঁর বইতে কয়েকবার চৌধুরীর নাম আছে, বিভিন্ন কমিটি সদস্যদের নাম উল্লেখ করার সুবাদে। এক জায়গায় তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন— "Mr. Hamidul Huq Chowdhury was one of the politicians of Bengal who knew the art of making himself unpopular."

আবুল হাশিম কেন এ মন্তব্য করেছিলেন তা চৌধুরীর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায়।

সোহরাওয়ার্দীর বইতেও একই রকম। শুধু একলাইনের একটি মন্তব্য আছে— "সবসময় তিনি তক্কে তক্কে থাকতেন কৃষক শ্রমিক পার্টি [KSP]-কে নিজস্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে।"

আবুল মনসুর আহমদ ও কামরুদ্দিন আহমদও তেমনভাবে কোথাও উল্লেখ করেননি চৌধুরীকে। আবুল মনসুর এক জায়গায় শুধু লিখেছেন, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার পর তাঁরা হতভম্ব হয়ে চৌধুরীর বাসায় গেলেন

ব্যাপর কী জানতে। কারণ, যা হলো তা হওয়ার কথা ছিল না। চৌধুরীও সে সময় ঘোষণা সম্পর্কে শুধু অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এসব 'বামনে'র বইতে বরং ঘুরে-ফিরে ফজলুল হক, আবুল হাশিম, নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী এমনকি শেখ মুজিবের কথা এসেছে। এতো বড় একটি দৈত্য আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা তাঁদের কারো নজরে পড়ল না, বড়ই পরিতাপের কথা !

তাঁর সমসাময়িক সবাইকে তিনি খুব ছোট করে দেখিয়েছেন। তাঁদের যে একেবারে দুর্বলতা, ক্রটি ছিল না তা নয়। কিন্তু তাঁরা কি একেবারেই তুচ্ছ ছিলেন? যদি তাই হবে, তা হলে এখনও বাংলাদেশের মানুষ কেন তাঁদের স্মরণ করে এবং চৌধুরীর কথা উঠলে 'দালাল' বা 'রাজাকার' বলে গাল দেয়? আরো উল্লেখ্য যে, তাঁরা তাঁদের বইতে সমসাময়িকদের এভাবে চিত্রিত করেননি, হামিদুল হককে তো নয়ই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফজলুল হককে যখন অ্যাডভোকেট জেনারেলশিপ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো তখন অধ্যাপক রাজ্জাক গেছেন একদিন তাঁর বাসায়। উদ্দেশ্য, তাঁর স্মৃতিকাহিনী সংকলন করা। বৃদ্ধ ফজলুল হক পুকুরপাড়ে বসে আরবি একটি বই পড়ছিলেন। অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলতে হো হো করে হেসে বললেন, 'বও মিয়া'। তারপর চারঘণ্টা পরিচ্ছন্ন ইংরেজি এবং বাংলায় অনেক কথা বলে সবশেষে বলেছিলেন, "আমি আরো অনেকদিন বাঁচবো। পরে এসব বলা যাবে।" অধ্যাপক রাজ্জাক মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর কথা। কিন্তু তিনি বিস্মিত হলেন এজন্যে যে বহুনিন্দিত, বহু-প্রশংসিত হক সাহেব ঐ চারঘণ্টা আলোচনাকালে কোনো রাজনীতিবিদ সম্পর্কে একটি কটূক্তিও করেননি। শুধু একবার বলেছিলেন, "জিন্নাহ সাহেব তো গরিব ছিলেন না তাই গরিবদের দুঃখটা তেমন বুঝতেন না।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উপরোক্ত সবার আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে কীভাবে তাঁরা রাজনীতিতে এলেন। চৌধুরী সাহেবের বইতে তার কোনো উল্লেখ নেই। মনে হচ্ছে তিনি জ্ঞান হবার পর থেকেই রাজনীতিতে জড়িত। বিষয়টি রহস্যময়। আরো উল্লেখ্য যে, তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত গত অর্ধশতক, গণতন্ত্রের পথে সংগ্রামী, কিন্তু কখনও নির্বাচতি হননি প্রত্যক্ষ ভোটে বা গণতান্ত্রিক উপায়ে।

পূর্ববঙ্গ ও এর হতভাগ্য জনগণের জন্য জনাব চৌধুরী আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এবং মন্ত্রিত্ব যখন গ্রহণ করেছেন তখন এদের কথা ভেবেই। শুধু তাই নয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতি তাঁর ঝোঁক এ পরিপ্রেক্ষিতেই। কিন্তু যে ব্যক্তি আজীবন পূর্ববঙ্গের জন্য কাজ করেছেন তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বিশ্বাস করেন না। পাকিস্তান কেন 'বিচ্ছিন্ন' হলো, তাও তো তিনি স্পষ্ট করে

বলেন না। কিন্তু তাঁর সংগ্রামের পক্ষে তিনি যেসব যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন সবই তো যায় সেই 'বিচ্ছিন্নতা'র পক্ষেই। এর অর্থ কী? তিনি যা বিশ্বাস করেন তা করেন ঠিকই কিন্তু জনসমক্ষে তুলে ধরেন অন্যকিছু। অর্থাৎ সরল বাংলায় যেটাকে বলে 'ভাঁওতাবাজি'। তাঁর আত্মজীবনীর একটি লাইন উল্লেখ করার মতো— "ভাষা আন্দোলনের সময় আমি কোনো পক্ষ অবলম্বন করিনি।" যেমনটি করেননি সাজ্জাদ হোসায়েনও। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে এই একটি লাইনই যথেষ্ট। তাঁর বই পড়লে মনে হয়, ভুট্টোর তো তেমন কোনো দোষ নেই, যা দোষ সে তো মুজিবের। বেনজির ভুট্টোও তাঁর আত্মজীবনীতে একথা লিখেছেন। ইয়াহিয়ার তেমন দোষ তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর দোষ তিনি দু'পক্ষকে এক করতে পারেননি। এ ধরনের ইঙ্গিত, মন্তব্য বইতে প্রচুর আছে। আমাদের সমাজে একশ্রেণীর মানুষ ছিল এবং এখনও আছে যারা শ্বেতাঙ্গ বা পাঞ্জাবি দেখলেই ব্যক্তিত্ববান বলে মনে করত, নিজ জন্ম সম্পর্কে তাদের এমন হীনম্মন্যতা ছিল। বাংলা ভাষায় অনুরোধ করলে শুনত না, কিন্তু হিন্দি বা ইংরেজিতে গাল দিয়ে একই কথা বললে ত্বরিত সে কাজ সমাপন করে বলত, হুজুরের কেমন সাফ জবান। এ বই পড়লে কেন জানি একথাই বারবার মনে পড়ে। এরপর কীভাবে বিশ্বাস করা যায় যে তিনি বাঙালিদের জন্য আজীবন কথা বলেছেন? সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিজেই তো আত্মজীবনীতে শেষ পর্যায়ে লিখেছেন বাংলাদেশে তাঁর বিশ্বাস নেই। এসব বিচার করলে, জনাব চৌধুরীর স্মৃতিকথা বিভ্রান্তিমূলক, দেশদ্রোহিতামূলক এবং মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ মাত্র।

আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁর জাতক্রোধ আছে। জাতক্রোধ আছে সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের প্রতি। ঠিক আছে, আওয়ামী লীগ খুব খারাপ। কিন্তু মুসলিম লীগ কি উন্নত ছিল? যদি তাই থাকবে তবে জনাব চৌধুরী দল-ত্যাগ করেছিলেন কেন? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট কোন জবাব নেই। সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সততা নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হতে চাই না। কিন্তু এটুকু তো বলা যেতে পারে যে, তিনি শেষ জীবনে অনুতপ্ত হয়ে হয়ত সমঝোতার রাজনীতি ত্যাগ করে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বা এভাবে বলতে পারি তিনি ও শেখ মুজিব রাজনৈতিক জীবনে ইতিবাচক কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন বলে তাঁরা আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। অথচ এতো প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ জনাব চৌধুরী সারা জীবন নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ কোথায়? শেষ জীবনেও যদি তিনি বাঙালিদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতেন তা হলে হয়ত এ প্রতিবেদন অন্যরকম লেখা হতো। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এতোবড় জায়েন্ট জনাব চৌধুরীকে দেখে যেতে হলো, তাঁর চিরশত্রু দুই 'ডোয়ার্ফ' বা 'বামন' আজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মানিত। আসলে প্রথমে যে প্রশ্নগুলি

তুলেছিলাম, সেসবের জবাব নেই দেখেই (অথচ প্রশ্নগুলি উঠেছে তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই) তাঁর বইতে তাঁর সমসাময়িক নেতাদের সমালোচনা নেহায়েৎ গালিগালাজ বলে মনে হয়।

আর ফজলুল হক? তাঁর অনেক ত্রুটি ছিল, সমঝোতা করেছেন অনেক, কিন্তু সেসব ছাপিয়ে ফজলুল হক ফজলুল হকই। নিজ সম্প্রদায়ের জন্য তিনি যা করেছেন তা পেরিয়ে যাওয়াও কষ্টকর। এখনও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন-না-কোন কুঁড়েঘরে গেলে শোনা যাবে হক সাহেবের গল্প। ফজলুল হক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যা করেছেন তার কথা বাদ দিই, ব্যক্তিগত পর্যায়েই যা করেছেন তারও তুলনা কম। আমরা এ পর্যন্ত জনাব চৌধুরীর সম্পর্কে এ ধরনের কোন কথা শুনিনি। 'প্রডা'র ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন তিনি, নিজ সম্পদের বিবরণ দিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, কিন্তু তবুও কেন তাঁর এ হিসেব সমসাময়িকরা বিশ্বাস করতে চান না।

এভাবে, জনাব চৌধুরীর প্রতিটি বক্তব্য সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা যায়। কারণ, এ ধরনের বিভ্রান্তিতে বইটি পূর্ণ। সবশেষে এ অধ্যায়ের শুরুতে যা বলেছিলাম তা দিয়ে শুরু করি। বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যাচাই করে দেখি তিনি সত্যি বলছেন কি না।

প্রথমটি শাসনতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক। হামিদুল হক চৌধুরীর বইয়ের মূল বিষয়ও তাই। আজীবন একটি শাসনতন্ত্র রচনায় ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সংগ্রাম করে গেছেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ যখন 'তিনি এগিয়ে নিচ্ছেন' তখনকার এক পর্যায় সম্পর্কে লিখেছেন—

"During debate on the bill, to strengthen my hand, I had obtained the services of two teachers of political science from Dacca University as advisers Abdur Razzaq and Muzaffar Ahamed Chowdhury. They soon fell victim to political machination in pursuit of some personal advantage and ceased to be trusted advisers."

আগেই বলেছি, জনাব চৌধুরী যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন বইতে তাঁদের অধিকাংশ আর এখন নেই। অধ্যাপক রাজ্জাকেরও পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের তাত্ত্বিক হিসেবে অবদান কম নয়। এবং এ পর্যন্ত তাঁর ছাত্র, বন্ধু বা শত্রু কেউই তাঁর সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। চৌধুরীর এই মন্তব্য যাচাই করতে গিয়েছি তাঁর কাছে। মন্তব্যটি শুনে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাসলেন। বললেন, তা কীভাবে হবে? তখন তো আমি তাঁকে চিনতামই না। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্য আমি গিয়েছিলাম করাচি, এবং থেকেছিলাম দু'মাস কিন্তু এসবের সঙ্গে তো হামিদুল হক চৌধুরীর কোনো যোগ নেই। ব্যাপারটি ছিল এরকম [আমি সংক্ষেপে তাঁর ভাষ্য তুলে ধরেছি] :

"খোন্দকার মোশতাক আহমেদ ছিলেন আমার ছাত্র। এ ছাড়াও তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের। তাঁর বড় ভাই খেলোয়াড় নাসিম [কাজী মোতাহার হোসেনের জামাই] ছিলেন আমার বন্ধু। যুক্তফ্রন্টের হাওয়া বইছে তখন। একদিন মোশতাক এসে আমাকে বললেন, রেজাই করিম সাহেব আমাকে যেতে বলেছেন তাঁর বাসায়। বয়স ছিল কম, মেজাজ ছিল খানিকটা চড়া। তাই বললাম, উনি এমন কে যে বললেই তাঁর বাসায় যেতে হবে? পরদিন দেখি, আমার শান্তিনগরের বাসায় এসে হাজির রেজাই করিম। আমি খুবই লজ্জায় পড়লাম। তিনি আমার সিনিয়র। তিনি বললেন, মোশতাক আমাকে বলেছেন, আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমি আমতা আমতা করছি। তিনি বললেন, আমার ওখানে কাল খাবেন। পরদিন গেলাম ওনার বাসায়। দেখি, সেখানে আবু হোসেন সরকার, মোহন মিয়া প্রমুখ বসে কথা বলছেন। শাসনতন্ত্র রচনা, স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক আলোচনা। আমি কিছুক্ষণ শুনে বললাম, এসব বলে লাভ নেই। আপনারা গিয়ে শুধু বলবেন, পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে চট্টগ্রামে বদল করতে হবে। ব্যাস এই একটাই দাবি। তারপর আমি আরো অনেক কথা বলে গেলাম এ বিষয়ে।

কযেকদিন পর মোহন মিয়া এসে হাজির। বললেন, করাচি যেতে হবে। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনা হবে। কারণ, খুব শীঘ্রই তা পেশ করা হবে জাতীয় সংসদে। সুতরাং তাদের সহায়তা করার জন্য আমার যাবার দরকার। আমি ঠাট্টা করে বললাম, ফেরার টিকেটটা দিতে হবে আগে। কারণ, সেখানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে মতে মিলল না, আপনারাও তখন আর খোঁজ নেবেন না। শুধু তাই নয়, থাকা-খাওয়ারও বন্দোবস্ত করতে হবে। কয়েকদিন পর মোহন মিয়া টিকেট নিয়ে হাজির। আমি তো অপ্রস্তুত। ব্যাপারটা এত সিরিয়াসলি নিইনি। কিন্তু মোহন মিয়া জানালেন, তিনি দলের অনেককে রাজি করিয়েছেন, সব বন্দোবস্ত করেছেন, এখন তাঁকে বেইজ্জত করা চলবে না।

গেলাম তাঁদের সঙ্গে। সেখানে ছিলাম আমার আত্মীয়, মন্ত্রী এল. আর. খানের বাসায়। মোহন মিয়া প্রতিদিন আসতেন, আমি তাঁকে ব্রিফ করতাম, আলোচনা করতাম। মনে আছে, প্রতিরক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যয় সম্পর্কে আমি তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। এরপর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে তিনি চটে উঠেছিলেন। আমিও চটে গিয়েছিলাম। যাক আবার সব মিটমাট হলে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন গুরমানীর বাসায়। সেখানেই তাঁদের আলোচনা বসতো। গুরমানীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দু'দিন পর সেখানে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় হামিদুল হক চৌধুরীর।

প্রায় মাস দুয়েক ছিলাম এবং সে আলোচনা সভায় যেতাম। পূর্ববঙ্গের দুজন নিয়মিত সেখানে যেতেন— তাঁরা হলেন মোহন মিয়া ও বিচারপতি

আবদুস সাত্তার। হামিদুল হক চৌধুরীকে তারপর নিয়মিত দেখেছি এবং সেখানে প্রায় তিনটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হতো। এবং তিনি কেন্দ্রীকরণের পক্ষে ছিলেন।"

পাঠক মিলিয়ে দেখুন, উপর্যুক্ত দু'টি বক্তব্য।

রাজাকারের মন বোঝার জন্য গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে একজন রাজাকার বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা কীভাবে দেখেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক, হামিদুল হক চৌধুরী কীভাবে দেখেছেন বাংলাদেশের জন্ম। আগে সে বিষয়ে খানিকটা উল্লেখ করেছি। এখন আলোচনা করছি বিস্তারিতভাবে।

চৌধুরীর গ্রন্থের বিশতম অধ্যায়ের নাম 'বাংলাদেশ ইটস বার্থ'। এ অধ্যায়ের প্রথম লাইন— "যদি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে তা দখল না করত তা' হলে পাকিস্তানের আইনগত অস্তিত্ব অটুট থাকত। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে 'সিভিল ডিসটারবেন্স'-এর সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে ও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকা দখল করে নেয়।"

তারপর তিনি জানাচ্ছেন, ১৯৭১-এর শুরুতেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করেছিল ভারত। তার পরের বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ— "Many politicians who had been agitating against the Government causing a law and order problem in East Pakistan were either arrested and held in confinement or fled to India." তা' হলে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে এ ঘটনাটুকুই ঘটেছে? ৩১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যেখানে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিচ্ছেন সেখানে ৩১৯ পৃষ্ঠায় এসে মাত্র ১২ লাইনে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের সব সংকটময় সময়ের বর্ণনা দিলেন। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য নয় কি?

এর পরের প্যারাগ্রাফটির ভাষা ও শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। রাজাকারদের বইগুলি পড়ার সময় পাঠকদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাব তাদের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের দিকে। চৌধুরী লিখছেন, "ভারতীয় বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান দখলের সঙ্গে সঙ্গে, যারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল হানাদার ভারতীয় বাহিনীর পিছে পিছে তারা ফিরে এল। ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী "remained in occupation." ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আওয়ামী লীগের ডজনখানেক নেতা ঢাকায় ফিরে এলেন। এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে "were installed in Dacca as the Government and Bangladesh was declared an independent state by them, seceding East Pakistan from Pakistan. This is what Indira Gandhi wanted."

শেখ মুজিব ফিরলেন, কিন্তু কী করলেন? নির্বাচন না করে অর্থাৎ জনগণের ম্যান্ডেট না নিয়ে নিজের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিলেন নতুন দেশে। দেশের ব্যাপারে কথা বলার কোন অধিকার দিলেন না কাউকে। কিন্তু এ ব্যবস্থাকে তিনি বলতেন গণতন্ত্র। এখানে আবার মূল ভাষায় তাঁর উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"He surely must have felt that people would not support his declaration ; otherwise why did he not go to the people for authority, particularly when all his opponents were in disarry and the Indian army of occupation was behind him?"

এ পর্যন্ত চৌধুরী যা লিখেছেন তার সঙ্গে কি বাস্তবের সম্পর্ক আছে? ১৯৭১- এর শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি কিন্তু অনেকে শুধু শুধু পালিয়ে গিয়েছিল ভারতে? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কি যৌথকমান্ড ছিল না? মুক্তিবাহিনী বলে কি কিছু ছিল? পাকিস্তানীরাও কিন্তু 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটি উল্লেখ করে না। বলে, ভারতীয় বাহিনী। ভারতীয় বাহিনী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসাল যেন তারা পুতুল সরকার। শেখ মুজিব ফিরে জনগণের ম্যান্ডেট নেন নি? বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার তা হলে কী ছিল? আচ্ছা পাকিস্তান সরকার, যার দালালি করেছেন চৌধুরী সেই সরকার কি ১৯৭১ সালে জনগণের ম্যান্ডেট মেনে নিয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না চৌধুরীর গ্রন্থে। কোন রাজকার-ই এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না বা দেয়নি।

শেখ মুজিব ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার যে ঘোষণা দেন তা অবৈধ চৌধুরীর ভাষায়। এক কথায় বাংলাদেশ সৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার সবই অবৈধ। তাঁর ভাষায়—

"Because of such a flaw in the origin and legality of the country's constitution we have witnessed and are witnessing repeated violence and the overthrow of one set of persons by another, with the use of force and soon followed by another coup occuring so frequently.

In my opinion all that was done was wholly illegal."

এসব প্রশ্ন তুলে ১৯৭১ সালের ন'মাসের একটি চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, পাকিস্তান ভাঙনের বীজ রোপিত হয় আইয়ুব খানের আমলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা "became violent and disorder broke out on the street of Dacca." আগে যেমন বলা হতো, বাঙালি ও মুসলমান তেমনি চৌধুরীও বাঙালি ও আওয়ামী লীগ বলে দু'টি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন।

১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খানেরা প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেছেন পূর্ব পাকিস্তান। সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান ভাঙার বিপক্ষে ছিল কিন্তু সেনাবাহিনীর

কিছু অফিসারের নির্লজ্জ ব্যবহারের কারণে, মানুষ সেনাশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এভাবে বাঙালি চরমপন্থীরা উৎসাহিত বোধ করে—

"The vast majority of the people were against the break-up of the country, but because of the shameless behaviour of a number of officers of the armed forces, engaged in suppressing disorder, against the civil population in different parts of East Pakistan, the people revolted against army rule, thereby encouraging the Bengali extremists."

এ সময় বেশ কিছু বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। বিহারিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে, নিহত বাঙালিদের সংখ্যা জানা যায়নি। চৌধুরীর হিসাব মতে, এ সংখ্যা হবে ১০/১৫ হাজারের মতো।

এ ধরনের ভাষ্য একমাত্র কোন বিদেশীর পক্ষে লেখা সম্ভব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বসবাসরত কোন বাঙালির পক্ষে এ ধরনের ভাষ্য রচনা সম্ভব নয় যদি না সে রাজাকার হয়।

চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বিশ্ব প্রেস 'sensation'-এর জন্য ক্ষুধার্ত ছিল সুতরাং এখানকার ঘটনা তারা ফলাও করে প্রচার করেছে। এর সুযোগ নিয়ে অনেক বাঙালি তরুণ ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে চলে যায়। পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাস থেকে অনেক বাঙালি কর্মচারী বেরিয়ে আসেন। তার পরের বাক্যটি লক্ষ করুন— "Many reportedly even made personal fortunes with public property."

১৯৭১ সাল সম্পর্কে— তা' হলে চৌধুরীর ভাষ্যের সারমর্ম হলো— একাত্তর সালে আসলে তেমন কিছুই ঘটেনি। তবে হ্যাঁ, একটি ঘটনা ঘটেছিল, তা হলো ভারত-পাকিস্তান লড়াই হয়েছিল। পাকিস্তান গিয়েছিল হেরে, তাই হারাল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানীদের অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আর এই যে পূর্বাঞ্চলে গণহত্যা করা হয়, আসলেই কি গণহত্যা হয়েছিল? না, তবে কিছু লোক মরেছিল, এই হাজার দশ-পনেরো। তাঁর দু'একজন হিন্দু কর্মচারীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আইন শৃঙ্খলা ঠিক করতে গিয়ে সেনাবাহিনী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। আর যাঁরা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা তাঁরা ছিলেন সব আওয়ামী লীগের সমর্থক। অধিকাংশ লোকই চায়নি যে দেশটা ভেঙে যাক। ঐ সময় বৈদেশিক সার্ভিসের অনেকেই স্বপক্ষ ত্যাগ করেছিলেন এবং অনেকে নাকি পক্ষ ত্যাগ করার সময় বেশ কিছু অর্থও আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন।

যে কোটি কোটি লোক বাংলাদেশে ছিলেন ১৯৭১ সালে তাঁরা কি বিশ্বাস করেন উপর্যুক্ত বক্তব্য? যদি করেন কিছু বলার থাকবে না। আর যদি বিশ্বাস না

করেন তা' হলে বলতে হবে, কোটি কোটি লোক একরকমভাবে একটি দৃশ্য দেখল, শুধুমাত্র একজন অন্যরকম দেখলে হয় সে পাগল নাহয় অবোধ।

উপর্যুক্ত দুটি ঘটনার বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় জনাব চৌধুরী বাস্তব ও কল্পনার ভেদাভেদ মানেননি। সোজা বাংলায় তিনি মিথ্যাবাদী। এ ধরনের বই ইতিহাসের বিবরণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য নয়, তবে ফিকশন হিসেবে মন্দ নয়। অবশ্য, হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচারের সময় বইটিকে ভালোভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ১৫

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ইউরোপ গিয়েছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। এরপর দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, তিনি থেকে যান পাকিস্তানে। সেখানে তাঁর কিছু বিনিয়োগ ছিল, আইনব্যবসাও করছিলেন, দিন খারাপ যাচ্ছিল না। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, মাসে তখন তিনি বিশ ত্রিশ হাজার টাকা রোজগার করতেন। জিয়াউর রহমান আমলে তিনি ফিরে আসেন ঢাকায়।

এ অধ্যায়ে হামিদুল হক চৌধুরী একটি তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর মতে, পাকিস্তান অনেক আগেই বাংলাদেশকে হিসেবের খাতা থেকে বাদ দিয়েছিল। আইয়ুবের সময় এ ধারণা স্বীকৃতি পেতে শুরু করে যে, পূর্ব পাকিস্তান না থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান ভালো থাকবে। সে কারণে, মুক্তিযুদ্ধের সময়—
"Islamabad just kept up a show of holding operations."

সম্প্রতি, পাকিস্তান সফরকালে নীতিনির্ধারকদের অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এবং তাঁরাও একথা স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন, চৌধুরী যদি এটি জানতেনই তা' হলেও পাকিস্তান সমর্থন কেন করলেন? অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের তো এ ভুল হওয়া উচিত নয়। এ ভুল করতে পারে নির্বোধরা। কিন্তু চৌধুরী তো নির্বোধ ছিলেন না। তা'হলে? এটিই হলো রাজাকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবিরা তাকে চায় না, ঝেড়ে ফেলতে চায়, তবুও সে পাঞ্জাবিদের পা ধরে থাকতে চায়। হীনম্মন্যতাবোধ কতটা প্রবল হলে এ মানসিকতা সম্ভব?

হামিদুল হক চৌধুরী স্মৃতিকথায় এরশাদ আমল পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। এ সময়কাল আমাদের আলোচনার বাইরে দেখে তা আর আলোচনা করলাম না। চৌধুরী জানিয়েছেন, ঢাকায় ফিরে তিনি জেনারেল জিয়ার সঙ্গে

দেখা করেছিলেন। যে কয়দিন তিনি ঢাকায় ছিলেন সে কদিন জিয়া তাঁর জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন যাতে কেউ চৌধুরীর ক্ষতি করতে না পারে। তারপর তিনি করাচি ফিরে যান এবং সব গুটিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। অনেকে তখন রাজনীতিতে যোগ দিতে বলেছিলেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে, জিয়া ও এরশাদ আমল সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ সঠিক। যেমন, তিনি লিখেছেন, জিয়াউর রহমান সব গুছিয়ে, নিজের জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক প্রাক্তন ডিসির সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, ঐ সময় জেনারেলকে জেতাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি অবশ্য তাঁদের ভাষ্য এবং সত্যতা নিরূপণের কোন উপায় নেই।

হামিদুল হক চৌধুরীর বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আমি একটি দীর্ঘ আলোচনা লিখে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলাম যা উদ্ধৃত করছি—

"হামিদুল হক চৌধুরীকে যদি জিজ্ঞেস করি '৭১ সালে আপনি কেন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন? কী জবাব দেবেন? এতো স্পষ্টবাদী তিনি অথচ এ বিষয়ে তাঁর বইতে কেন কোন স্পষ্ট কথা নেই। বইটি হাতে নিয়ে ভেবেছিলাম, হয়ত জনাব চৌধুরী ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি যে রকম সচেতন বলে নিজেকে দাবি করেন, সেরকম সচেতনতা থেকে জীবন কাহিনীতে ব্যর্থতা, সফলতা, ভুল সব কিছুরই উল্লেখ করবেন। না, তা করেননি বরং গণহত্যা সম্পর্কে বক্রোক্তি করেছেন। জনাব চৌধুরীর স্ত্রী কন্যাদের হানাদার বাহিনী তুলে নিয়ে গেলে কি জনাব চৌধুরী অনুধাবন করতেন পাকিস্তানী বাহিনী কী ছিল? মনে হয়, তাতেও তাঁর কিছু হতো না। কেননা জনাব চৌধুরী নিজেকে ছাড়া আর কিছুই জানেন না বা চেনেন না। আত্মজীবনীতেই তা স্পষ্ট। দেশকে, দেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, আবার সে দেশে এসে বসবাস করে ও সমস্তসুযোগ সুবিধা নেয়ার জন্য মুখিয়ে থেকে আর যাই হোক চরিত্রবান বলে বড়াই করা যেতে পারে না।"

কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এবং তা-ই স্বাভাবিক। হামিদুল হক চৌধুরী বছর কয়েক আগে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর একটিমাত্র প্রশংসামূলক রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা হলো আরেক রাজাকার সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের। এ থেকে, একটি বিষয় স্পষ্ট, রাজাকাররা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তারা পরস্পরকে সমর্থন সহযোগিতা করবে। জোট বাঁধবে। বর্তমান অবস্থা কি তা প্রমাণ করে না?

## ১৬

খালেক মজুমদার কে ? মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে জামায়াতের ঢাকার দফতর সম্পাদক খালেক মজুমদারকে মুক্তিবাহিনী বন্দী করেছিল। নিম্ন আদালতে খালেক দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে উচ্চ আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেয়। আদালতের রায়ে মুক্তি পেলেও খালেক মজুমদার সমাজের রায়ে মুক্তি পাননি। এখনও শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যার প্রসঙ্গ এলে তার নাম চলে আসে। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের দ্বিতীয় রিপোর্ট'-এ তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কারাগার থেকে খালাস পাবার পর খালেক মজুমদার দু'খণ্ডে প্রকাশ করেছেন আত্মজীবনী 'শিকল পরা দিনগুলো'। এ আত্মকাহিনী অন্য রকম। এখানে শুধু বর্ণিত হয়েছে তার গ্রেফতার থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু। অর্থাৎ যে সময়টুকুতে তিনি ছিলেন বন্দী। তার বলার ধরণটাও আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো।

বইয়ের নাম শিকল পরা দিনগুলো। প্রথমেই তিনি পাঠককে বুঝিয়ে দিতে চান যে, তাকে আটকে রাখা হয়েছিল এবং তা ছিল দুঃসহ। এই দুঃসহ সময়টুকুর কথাই তিনি বলতে চান এবং সেই সময়টুকু কখন ? সেই সময়ের শুরু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। অর্থাৎ প্রাক ১৯৭১ ছিল না শিকল পরার দিন। এ দুঃসময়ের দিনে পরিবেশ কেমন ছিল ? খালেকের ভাষায়, দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের তপ্ত পরিবেশ। জেলে তাকে কাজ দেয়া হয়েছিল রান্না ঘরে। তা রান্নাঘরে আগুন জ্বলবে না তো কি বরফে ঢাকা থাকবে ? জেলার ছিলেন হিন্দু। তাই বার বার তার নাম উল্লেখ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, জেলার হিন্দু দেখেই মুসলমান হিসেবে তাকে সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমের কাজ দিয়েছে। তা সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে কী কাজ দেয়া হবে ? আর রান্নাঘরে বাকি যারা কাজ করত তাদের সবাইকেই কি একই কারণে (অর্থাৎ বিদ্বেষবশত) রান্নাঘরে কাজ করতে দিয়েছিল ? খালেক মজুমদার লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক সেখানে তাকে একটা স্থান বানিয়ে দিলেন। কৌশলে মজুমদার আল্লাহকেও নিয়ে এলেন এখানে। বইয়ের দুটো কথার খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি যাতে পাঠক বুঝতে পারেন আমি কী বলতে চাচ্ছি—"শিকল পরা দিনগুলো আমার কারার দুস্থ জীবনের ছোট একটা কাহিনী। লিখতেও হয়েছে বইটি সশ্রম কারাদণ্ডের দণ্ড ভোগের ফাঁকে ফাঁকে জেনারেল কিচেনের (জেলখানার ভাষায় চৌকা) দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের

তপ্ত পরিবেশে। ৮ বছরের সশম কারাদণ্ডের রায় ঘোষণার পরের দিন সকালে জেলার নির্মলেন্দু রায় সকল সুপারিশে আমার কাজ পাস করলেন জেনারেল কিচেনে জেলের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমের জায়গা ওটা। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক সেখানে একটা স্থান বানিয়ে দিলেন আমার জন্য। সকলেই যেন সুদৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। মর্যাদার চোখে দেখতে লাগলো জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে।...”

আসলে প্রথম থেকেই খালেক পাঠকের মনে নিজের প্রতি একটা সহানুভূতি সৃষ্টি করে নিতে চান। পাঠকের হয়ত খেয়াল থাকে না, এ প্রশ্ন করার যে, প্রাক ১৯৭১ কি শিকল পরা দিন ছিল না ? প্রাক ১৯৭১ ছিল কি স্বাধীন মানুষের আনন্দঘন দিন ? অসচেতন মনে যদি এ কথাগুলো গেঁথে যায় তা হলে পাঠক বইটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে বিচার করবেন।

## ১৭

খালেক মজুমদারের বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘গ্রেফতার’, দ্বিতীয়টির ‘গ্রেফতারের পটুভূমি’। প্রথমে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়টি আলোচনা করব। প্রথমটি নয়। মজুমদার লিখেছেন, “’৭৩ এর ৩০ ডিসেম্বরের ‘অনুকম্পা’ ঘোষণার পর এখানে থাকতে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বর সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে যখন অনুকম্পার পর কোন কোন ধারার স্থগিত আদেশ (stay order) এলো তখন আমাদের মতো কতিপয় হতভাগ্য মানুষের জিন্দানখানা হতে আর মুক্ত হতে পারলো না।”

এখানে শব্দের ব্যবহারগুলো দেখুন ‘ন্যায়নীতি বিসর্জন’, ‘হতভাগ্য মানুষ’, ‘জিন্দানখানা’ প্রভৃতি। এ ক’টি লাইন পড়লে অনেকের মনে হতে পারে প্রতিহিংসাবশত রাজাকারদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দু’টি বিষয়ের অবতারণা করছি। এক, বলা হয়ে থাকে শেখ মুজিব সবাইকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। মজুমদারের মতো রাজাকারের ভাষ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে, ঐ প্রচারণা ঠিক নয়। ছোট রাজাকারদের ছাড়া হয়েছিল। বড় রাজাকারদের বা যারা গর্হিত কোন অপরাধ বা কোন খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের নয়। এদের মুক্তি দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। দুই, খালেকের উপস্থাপনা। ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে আর তাদের আটকে রাখা হলো কই ? হলো না বরং আদালতের রায়ে তিনি (বা তারা) খালাস পেলেন।

সেটাই কি হয়ে গেলো ন্যায় নীতি বিসর্জন? আর হতভাগ্য তো খালেক মজুমদাররা নয়, এ দেশে হতভাগা হলেন শহীদুল্লাহ কায়সাররা।

ঢাকার পতন আসন্ন। এ কথা রাজাকাররা জানলেও বিশ্বাস করতে পারেনি। "কিন্তু হায়! সব ধারণার মূল ছিন্ন করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে যখন ১৬ ডিসেম্বর তাদের আত্মগ্লানির ঘোষণা শোনা গেল তখন সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়!" রাজাকারদের কাহিনীগুলো পড়ে মনে হচ্ছে শুধু আদর্শগত কারণেই যে তারা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ছিল, ধর্ষণ ও খুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা নয়, এরা স্বপ্নেও ভাবেনি, পাকিস্তানী বাহিনী ভারত বা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মার খাবে। নাজি জার্মানিতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। সে কারণে রাজাকাররা বা পাকিস্তানীরা এখনও ১৯৭১-এর পরাজয়ের কথা ভুলতে পারে না, যে কারণে আত্মগৌরব উদ্ধারের জন্য তারা আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

পাকিস্তানের পতন যে আসন্ন এ খবর তাকে দেন তার এক শ্রদ্ধেয় নেতা। নেতা জামায়াতের ঢাকা অফিসে এসে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খালেককে বলেন, "আপনি বাসায়ই থাকুন। আপনার তো কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। মাঠে তো আপনার কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না।" এ লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ। খালেক মজুমদার ও তার সঙ্গী সাথীরা ১৯৭১ বিষয়ে এ সূক্ষ্ম তফাতটি সবসময় করতে চেয়েছে এবং ব্যবহার করেছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। তারা যা বলতে চেয়েছে তা হলো যদি কোন হত্যা বা অত্যাচার হয়েই থাকে তা হলে তা করেছে তারা, যারা ছিল মাঠ পর্যায়ে। খালেক তো ছিলেন দফতর সম্পাদক। ফলে এর কোন দায়-দায়িত্ব তার নেই। যেমন নেই গোলাম আযম বা নিজামীর। নূরেমবার্গ বিচারের সময় এ ধরনের যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্তরা, যা গ্রাহ্য হয়নি। আরেকটি যুক্তি এ পরিপ্রেক্ষিতে দেয়ার চেষ্টা করে তারা যে, ১৯৭১ সালে জামায়াত আদর্শের জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, খুন কি আদর্শের অন্তর্গত– সে উত্তর খালেক মজুমদার দেননি।

সেদিন খালেক মজুমদারের অফিস থেকে বেরুতে কষ্ট হচ্ছিল। অফিসে "নিখিল বিশ্বের মুসলিম জাতির পথ নির্দেশক" সব বই ছেড়ে যেতে তার হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। কারণ, কি বুঝবে তাদের বিবেকহীন মানুষেরা। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সমর্থকরা বিবেকহীন। আর ভণ্ডামি দেখুন, পালাবার সময় তার পরিবার পরিজন বা অন্য কিছু নিয়ে সে চিন্তিত নয়। সে চিন্তিত মুসলিম মনীষীদের বই নিয়ে!

সেদিন মজুমদার বাসায় কাটালেন। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন, "আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিদায় নিল সৌভাগ্যের শুকতারা।"

সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্যটি সঠিক। তবে, সৌভাগ্যের শুকতারার জন্য তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। মাত্র চার বছর পর জেনারেল জিয়াউর রহমান যিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, পরে সামরিক শাসক হিসেবে মজুমদারকে সৌভাগ্যের শুকতারা এনে দিয়েছিলেন। তবুও দেখা যাক, একজন রাজাকারের কেমন লেগেছিল সে সময় যার বর্ণনা আছে মজুমদারের বইয়ে। "আগামীকালই নাকি রেসকোর্সে স্বাক্ষরিত হবে জাতির ভাগ্যাকাশের নতুন সনদ। গুলি-গোলার শব্দ, তাও থেকে থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রাতের আঁধার বেড়ে যাবার সাথে সাথে কোলাহল বন্ধ হলেও ওই বিকট শব্দের কোন বিরাম নেই। কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল ওই পাষাণ ও অসহ্য শব্দে। প্রতিটি শব্দই যেন বুকে এসে বিঁধছে।"

এশার নামাজের সময় তার মোনাজাতের দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এর মধ্যে একটি লাইন গুরুত্বপূর্ণ। "খোদাদ্রোহীদের ওপর আমাদেরকে বিজয় বকশিশ কর।" অর্থাৎ বাঙালি বা মুক্তিযোদ্ধারা খোদাদ্রোহী। এই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিভঙ্গির এখনও পরিবর্তন হয়নি। মাইনোরিটি পাঞ্জাবীরাও মনে করত বাঙালিরা (জামায়াতসহ) হিন্দু।

শেষ রাতে রাজাকার খালেক পালালেন বাসা থেকে। বাসা ছেড়ে যাবার সময় মায়া লাগছিল। স্ত্রী-সন্তানদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরের কাছে। এ কাজটি করতে কিন্তু কোন ভুল হয়নি। লিখেছেন, "আমার সংসার ও দাম্পত্য জীবনে ঐ সময়টাই ছিল সবচেয়ে বেশি সুখের। তখন কে জানতো হিংস্র দানবের নিষ্ঠুর থাবা ঝড়ের বেগে আসছে আমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে। ভাসিয়ে দিতে আসছে উত্তাল তরঙ্গ সুখে গড়া আমার সোনার সংসার।" এখন কেউ এ ক'টি লাইন পড়লে মনে নিশ্চয় সহানুভূতি জাগবে। কিন্তু এ বাক্য ক'টি পড়ার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৭১ সালে কত কোটি মানুষের সুখের সংসার নির্মমভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই রাজাকাররা। এখানেও শব্দের ব্যবহার দেখুন। হিংস্র দানবের নিষ্ঠুর থাবা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের।

রেসকোর্সে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন খালেক। সেখান থেকে চলে যান মালিবাগে তার এক আত্মীয়ের বাসায়। ঘটনাটি খালেক উল্লেখ করেছেন এখানে সাধারণভাবে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কেন আমরা অন্তিমে পরাজিত হলাম রাজাকারদের হাতে তার কারণ এখানেই নিহিত।

মজুমদার যখন সেখানে, তখন আশ্রয়দাতার এক আত্মীয় এসে হাজির। "তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক একজন যুবক, তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলাম আমি। ভাগ্য ভাল ইতোমধ্যেই এসে পড়লেন তিনি। এখানে থাকা ঠিক হবে কিনা

এখনই আঁচ করা যাবে। তখন একটি কামরায় কপাট বন্ধ অবস্থায় আছি। গৃহকর্ত্রী আত্মীয়ের চাপা স্বরের গুনগুন কথার শব্দ ভেসে আসল কানে। সন্তর্পণেই দরজার ফাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম তাদের কথা কাটাকাটির প্রতি। কিছুক্ষণ পর নমনীয়ভাব প্রকাশ করল যুবকটি। সাথে সাথেই হাসি মুখে প্রবেশ করলো আমার রুমে। কাঁধে ঝুলছে রাইফেল। নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত হলাম অনেকটা। খুঁজতে হবে না অন্য আশ্রয়। ধরতে হবে না ভিন্ন পথ।"

এরপরও আমরা দেখি— জেল, সিআইডি সবখানেই পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছে রাজাকাররা। বাঙালির সম্প্রদায়যুক্ততা এর কারণ এবং তা ক্ষতি করেছে মুক্তিযুদ্ধের, আদর্শ, বাঙালির। এ বিষয়টি আমরা তখন অনুধাবন করিনি। এখানে উল্লেখ্য, রাজাকাররা কিন্তু এ ধরনের কোন সমবেদনা দেখায়নি মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের প্রতি। এখানেই মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের মধ্যে পার্থক্য।

মালিবাগে এক সপ্তাহ ছিলেন মজুমদার। সকালে উঠে কাগজ পড়তেন। এ কাগজ পড়ে কি মনে হতো তার–"ভোরের বেলায় খবরের কাগজে নজর পড়লেই আঁতকে উঠলাম। কত নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে তারা। এ সময় এ কাগজগুলো সরলপ্রাণ জনসাধারণের মন থেকে আমাদের ইমেজকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে।

জীবনের বিনিময়ে বুকের তাজা রক্তের লোহিত প্রবাহ বইয়ে দিয়ে হলেও নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য, বিশ্ব উম্মতে মুসলিমার হেফাজতের জন্য, বিশাল সমুদ্রের ভয়াল তরঙ্গের মরণছোবল থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেক সাধ্য সাধনার মাধ্যমে যে সুপ্রতিষ্ঠিত বৃক্ষটিকে আমরা দৃঢ়মূলে দাঁড় করিয়েছিলাম, তা উপড়িয়ে ফেলার জন্য কাগজের পৃষ্ঠায় তাদের কি জঘন্য পাঁয়তারা! নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রই বুঝতে পারতো তাদের মনের হীন জিঘাংসার আসল রূপ। সাময়িকভাবে তাদের এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে তারা সফলতা লাভ করে থাকলেও দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারবে না এই অপচেষ্টার ফল। জনতার বিবেকের কঠোর আঘাতে মিথ্যার এ কারসাজি, কল্পনার এ রঙিন ফানুস ধ্বসে পড়বেই একদিন।"

আমি পাঠকদের অনুরোধ করব আবারও সেই সময়কার পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রিত বিবরণসমূহ পড়ে দেখার জন্য। তা' হলেই বোঝা যাবে কীভাবে রাজাকাররা মিথ্যাচার করে। তবে মজুমদারের শেষ দুটি লাইন পড়ে তাকে দূরদর্শী মনে হতে পারে। আসলে অপচেষ্টা না। বাঙালি যদি সে বিবরণগুলো মনে রাখত এবং শহীদদের কথা স্মরণ করত, তাহলে আজ এ

অবস্থার সৃষ্টি হতো না। নব প্রজন্মের একটা বড় অংশ এভাবে বিভ্রান্ত হতো না। সে কারণে বলি, ১৯৭১-এর ঘটনাবলীর বিবরণ, সংবাদপত্র, টিভিতে থাকুক। এতে অসহিষ্ণু হতে পারে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

২২ ডিসেম্বর খালেককে মালিবাগ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার মতে, ঐ দিন ছিল তার "ঐতিহাসিক নবজন্মের দিন"।

## ১৮

মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে গাড়িতে নিয়ে চললেন আর গাড়ি চলাকালীন খালেককে তাঁরা নানা প্রশ্ন করছিলেন। তাঁর ভাষায়, "উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম তাদের সব অবান্তর প্রশ্নের।" এখানে উল্লেখ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের একজন তার হাতের ঘড়িটি খুলে নিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার মন্তব্য, "স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে গদগদ বন্ধুদের এ হলো চরিত্রের পরিচয়।" একজন মুক্তিযোদ্ধা তার ঘড়ি নিয়েছিল কিনা তা জানা যাবে না। খালেকদের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের সমষ্টিগত পরিচয় যদি এ হয় তা' হলে তাদেরও সমষ্টিগত পরিচয় হবে খুনী, লুটেরা ও ধর্ষক। এখানে একটি লাইন আছে যা বিভিন্ন আলঙ্কারিক বিবরণের মাঝে ঢাকা পড়ে যেতে পারে কিন্তু আমার কাছে তা' গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তার কাছে একটি রিভলবার পাওয়া গেছিল। তিনি লিখেছেন-"রিভলভারটি আমার লাইসেন্স করা। কিনে এনেছিলাম পঞ্চাশটি বুলেটসহ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাস কয়েক আগে।" অর্থাৎ মাঠকর্মী ও দফতর কর্মীদের মধ্যে খালেক প্রথমেই যে পার্থক্যটা টানতে চেয়েছিলেন আসলে তা ছিল না। জামায়াতের কর্মীদের সামগ্রিকভাবেই অস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেনা কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। এখানে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীও তাদের তা' দিয়ে থাকতে পারে। নিরীহ রাজনৈতিক কর্মীর ৫০টি গুলিসহ রিভলবার থাকে না। থাকলেও এত গুলি থাকে না। গাড়িতে যেতে যেতে নিজের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি এভাবে-"এটি আমারই পাড়া—যেখানে বাস করেছি বেশ কয়েক বছর। অপরিচয় থেকে পরিচয়। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা থেকে বন্ধুত্বে উপনীত হয়েছি যেখানে-এটি সে জায়গা। কত বড়জনের কাছে পেয়েছি স্নেহ ও ছোটদের কাছে পেয়েছি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। বিপদের দিনে আজ ওর নেই কোন মূল্য।" এটা স্বাভাবিক। খালেক যেটি উল্লেখ করেননি তা' হলো, তাকে ভয় পাওয়ার কারণ, মহল্লায় তার পরিচয় ছিল ঘাতক হিসেবে। এখানে শ্রদ্ধা বা স্নেহের কোন সম্পর্ক নেই।

মহল্লার লোক তাঁকে সত্যিকার শ্রদ্ধা বা স্নেহ করলে মহল্লা ছেড়ে তাকে পালাতে হতো না।

খালেক মজুমদারকে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেফতার করেছিলো শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী ও হত্যাকারী হিসেবে। তাই গাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা এই প্রশ্নই করছিলেন। কিন্তু খালেকের ভাষ্য–"শহীদুল্লাহ কায়সারের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ছবিতে প্রথমবারের মতো জীবনে তাঁকে দেখলাম।"

একই পাড়ায় থেকে, তখনকার ছোট্ট ঢাকায়, জামায়াতের দফতর সম্পাদক, খালেক মজুমদার দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক, বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে দেখেননি এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এ যুক্তি অনেকেই বিশ্বাস করেছেন এমনকি হাই কোর্টের দু'জন বিচারপতিও। খালেক নিজে জানিয়েছেন, ১৩ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত তিনি পত্রিকা পড়েছেন। তখন কি পত্রিকায় শহীদুল্লাহ কায়সারের ছবি বা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ ছাপা হয়নি ?

খালেক মজুমদার সবসময় শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণের কথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, তিনি তাঁকে চেনেন না। এর বিপরীতে গণআদালতের ভাষ্য ও শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী, পান্না কায়সারের ভাষ্য দেখা যাক।

গণআদালতের ভাষ্য অনুযায়ী "শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিচয় পেয়েই একজন 'মিল গিয়া' বলে উল্লাস ধ্বনি করে তাঁর চুলের মুঠি চেপে ধরে।....ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে শাহানা বেগম একজন আততায়ীর মুখোশ টান দিয়ে খুলে ফেলেন। উজ্জ্বল আলোতে সবাই তাঁকে চিনে ফেলেন। পরে আদালতে খালেক মজুমদারকে সনাক্তকরণের সময় তাঁরা পৃথকভাবে জানান, এই ব্যক্তিই ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা রাতে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করতে গিয়েছিলেন।"

"খালেক মজুমদার তখন একই এলাকার ৪৭নং আগামসী লেনে থাকতেন। কায়েতটুলী মসজিদের তৎকালীন ইমাম আশ্রাফ উল্লাহ যিনি বর্তমানে বনানী গোরস্থানে কাজ করেন তিনি জানান, ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর '৭১ সালে বিকালে খালেক মজুমদার তাঁর কাছে শহীদুল্লাহ কায়সার কখন বাসায় থাকেন ইত্যাদি জানতে চান। আশ্রাফ উল্লাহ উত্তরে জানি না বলেন। তখন তিনি নিজেও জানতেন না খালেক মজুমদার শহীদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্য খুঁজছে। সে দিন সন্ধ্যা রাতে আশ্রাফ উল্লাহ মসজিদের দোতলায় জানালা দিয়ে দেখতে পান শহীদুল্লাহ কায়সার রাস্তার

ল্যাম্পপোস্ট আঁকড়ে ধরে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছেন, আর কয়েকজন লোক তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল।"

পান্না কায়সার লিখেছেন– "সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনার পর ঠিক হলো ১৩ ডিসেম্বর শহীদুল্লাহ বাসা ছেড়ে চলে যাবেন। চলেও গিয়েছিলেন কিন্তু ফিরে এসেছিলেন ঘণ্টাখানেক পর।" রাতে খাবারের পর পান্না যখন ঘরে এলেন তখন দেখলেন, "এক টুকরা কাগজে গভীর মনোযোগ সহকারে কী যেন লিখছে। 'কী লিখছ'—বলে আমি ওর পাশেই বসলাম।

'কাল ত আমি চলে যাব। আমি না থাকলে তুমি কী করবে তোমার জন্য লিখে রাখছিলাম।' শুনে আমার প্রচণ্ড রাগ হলো! কাগজটাতে কী লিখা ছিল দেখতে ইচ্ছা করল না। কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললাম।

শহীদুল্লাহ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমার আরও রাগ হলো।

'তুমি কি সাত সমুদ্দুর যাচ্ছ! যাচ্ছ ত ঢাকা শহরেরই কোন একটা জায়গায়। ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।'

ঃ ধর আমি চলে গেলে যদি ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়– সে জন্য কিছু জরুরী কথা লিখেছিলাম– দিলে তো ছিঁড়ে।

ঃ মুখেই বল না।

ঃ কারও উপর নির্ভর করে চলবে না, মনে বিশ্বাস রাখবে আমি তোমার সঙ্গেই আছি।"

শহীদুল্লাহ কি জানতেন তাঁকে চিরতরে চলে যেতে হবে। কারণ পরদিনই আলবদর আক্রমণ করল কায়েতটুলীর সেই লাল বাড়িটি। শহীদুল্লাহ ভেবেছিলেন, বিজয়ী মুক্তিসেনারা বোধহয় এসেছে। দরজা খুলে দেয়া হলো। ঘরে ঢুকল কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে আল-বদরদের একটি দল। লিখেছেন পান্না কায়সার—

"ঘরে ঢুকেই ওরা একবার চারদিক তাকাল। তখনও ঘরে ছিল শহীদুল্লাহ ও চাচা-আব্বা। আমি শমীকে কোলে তুলে দুধের শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। বেজন্মা রাজাকাররা শহীদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনার নাম কী ? 'আমার নাম শহীদুল্লাহ কায়সার।' ওর গলা দিয়ে যেন তখন আগুন ঝরছিল। শহীদুল্লাহ ওর নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ওর হাতটা ধরে টান দিয়ে বলল—চলুন আমাদের সঙ্গে। শুনেই আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। দুধের শিশিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে—শমী পড়ে গেল কোল থেকে।

সেদিন থেকে শমীর দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাদা দুধ দেখলেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠত।...

**আমার চিৎকার শুনে বারান্দার ওপাশের ঘর থেকে ননদ শাহানা দৌড়ে এসে বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ইতোমধ্যে ওকে ওরা টানতে টানতে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমিও এক হাত ধরে ওকে টেনে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ঘাতকরা বেয়নেটের নল দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। বেবী এসেও সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিল।....বেবীকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। বেবী পড়ে গেল ঠিকই কিন্তু একহাত দিয়ে ওর বড়দাকে তখনও ধরে রেখেছে। ওরা টানতে টানতে ওকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার সময় শহীদুল্লাহ আরও জোরে বোনের হাতটা ধরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না, হাতটা ছুটে গেল।"**

এ বর্ণনা যখন পড়ি এবং তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি সে সব হত্যাকারীর দল পুনর্বাসিত, শুধু তাই নয় তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায়ও বসানোর আয়োজন চলছে তখন এই অবাস্তব দেশে জন্মগ্রহণ করার জন্য ধিক্কার জন্মে।

ফিরে আসি পুরনো বিবরণে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন খালেককে আল-বদর বলে সম্বোধন করছিলেন তখন খালেক তা' অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, তিনি জামায়াতের নিছক একজন দফতর সম্পাদক, আল-বদর নন। খালেক এভাবে নিজেদের সামগ্রিক দায়িত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন। অথচ ছাত্র সংঘ প্রধান নিজামী ছিলেন সারা পাকিস্তান আল-বদর বাহিনীর প্রধান। এরপর আছে মজুমদারকে 'টর্চার'-এর বিবরণ। কিন্তু সেটি উপস্থাপিত হয়েছে কীভাবে? মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার হলো তাঁর ভাষায় 'সর্দার'। মুক্তিযোদ্ধারা কেমন? 'হিংস্র চেহারার'। তাদের কাজকর্মের প্রকৃতি কেমন?

"অস্পষ্ট স্বরে কী বলে সরে গেল সর্দারটি। এবার বিকট আকৃতির জল্লাদ প্রকৃতির জুলফিধারী দু'টি লোক এগিয়ে এলো আমার দিকে। তাদের লম্বা লম্বা গোঁফ, মাথায় বেণী বাঁধার মতো লম্বা চুল, রক্তজবার মতো চোখ দেখলেই মন ভয়ে আঁতকে ওঠে। পেশীবহুল হাত উঠিয়ে থাবা ধরা হিংস্র বাঘের মতো দু'হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে নিল তারা। হাওয়াই শার্টটা খুলে ফেলে দিল দূরে। ঝাপটা মেঝে চিৎ করে ফেলে দিল উত্তর ভাগে রাখা একটি টেবিলের উপর। পূর্বদিকে মাথা পশ্চিমদিকে পা।...এবার দু'ধারে দু'জন করে দাঁড়িয়ে গেল হাতে রড ও লাঠি নিয়ে।" এ বিবরণের সাথেও একটি লাইন দেখুন 'পূর্বদিকে মাথা পশ্চিম দিকে পা।' অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামী রীতিনীতিতে বিশ্বাসী নয়। খালেক মজুমদারের বিবরণ সত্যি বলে ধরে নিলাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এত টর্চার-এর পর মজুমদার দিব্যি বেঁচে ছিলেন। আর খালেকরা কী করেছিলেন তার একটি বিবরণ দিচ্ছি।– **"আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দু'টো মস্ত মানুষ। নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।"**

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটা অংশ কাটা।...মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।..."

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোককে যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এ বিবরণ লিখেছিলেন হামিদা রহমান। পাঠক, আপনি কি উপর্যুক্ত বিবরণ দেখে অনুধাবন করতে পারছেন রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পার্থক্য ? বুঝতে কি পারছেন রাজাকারের মন কী রকম ?

## ১৯

নির্যাতনের সময়, উল্লেখ করেছেন খালেক মজুমদার, নিজ মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইসলামী বীরদের স্মরণ করেছেন। আমি এখানে নির্যাতনের সময় খালেকের একটি মনোলগের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–"হে খোদা! অপরাধ যদি করেই থাকি তোমার কাছেই করেছি–তুমি ক্ষমা করো। মৃত্যুই যদি দাও–এই-ই শ্রেষ্ঠ, মৃত্যু। মরদে মোমেন যাঞ্ছা করে নেয় এ মৃত্যুকে। আর যদি বাঁচিয়ে রাখো তা তোমারই অপার রহমত। কোন অপরাধ নেই আমাদের। তোমার আদর্শের জন্যে কাজ করেছি– তোমার আদর্শকে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে যারা ব্রতী তাদের দলে নাম দিয়েছি–এই যদি হয় অপরাধ, তাহলে তুমিই উত্তম ফয়সালাকারী, তুমিই আহকামুল হাকেমীন। রোজ হাশরে কুল মাখলুকাতের সামনে তোমার ফায়সালা তাদের শুনিয়ে দিও। এদের কাছে করুণা চাই না–করুণা চাই–চাই রহমত শুধু তোমারই কাছে। জালেমের কাছে ভদ্রজনোচিত বা সদ্ব্যবহারের আশা করি না। তুমি আমাকে একজন মুমিনের মৃত্যু দান কর। মুসলমানদেরকে জালেমদের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। যেমনি বাঁচিয়ে রেখেছিলে মুসা ও বনি ইসরাইলসহ বহু মুসলিম জাতিকে।"

এবার দেখুন–'আদর্শ' শব্দটি। 'আল্লার আদর্শ' কী ? হত্যা, ধর্ষণ, লুট ?

নাউজিবিল্লাহ। জামায়াতে কর্মী ছাড়া এমন উক্তি কে করবে ? 'জালেমের কাছে ভদ্রজনোচিত' ব্যবহার আশা করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছে 'জালেম',

তারা নাকি "লা ইলাহার চিৎকার ধ্বনি বন্ধ করার জন্য নেকড়া গুঁজে দেয় মুখে।" বিশ্বাসযোগ্য কি এই সব মন্তব্য ?

এর পর খালেক মজুমদারকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। মজুমদার কারাবাসের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার মুনাজাতের দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। এগুলি ভাল করে পড়লে রাজাকারের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। হত্যাকারী, লুণ্ঠন বা ধর্ষণকারী ছাড়া তাদের ভাষায় সবাই খোদাদ্রোহী। তারা নিজেরা কিন্তু মানুষ। তারা 'শাহাদাত' বরণ করতে চায় যাতে পরে শরাবন তহুরা পান করতে পারে। তাদের পক্ষের বিধবা, সন্তানহারাদের বিরহ বেদনার যেন উপশম হয়। একটি দীর্ঘ মুনাজাতের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম উদাহরণ হিসেবে—

"হে রাহমানুর রাহিম। জানি তুমি মাজলুমের দোয়া কবুল কর। আমি কি আজ মাজলুম নই ? যদি মাজলুমিয়াতের সীমায় পড়ে থাকি আমার দোয়া কবুল কর। দ্বীনের অগ্রসেনানী আমার শ্রদ্ধেয় প্রাণতুল্য নেতৃবৃন্দের তুমি হেফাজত কর। দ্বীনের বীরসেনানী তোমার পথের জাননেছার মুসলিম ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র–বিশ্ব মুসলিম গৌরব আমাদের গর্ব, সব কর্মী ভাইকে জালেমের অত্যাচারী হস্তের নিষ্ঠুর ছোবল থেকে সরিয়ে রাখো। স্বার্থের পূজারী, বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় ভাবাবেগে ভাসমান জগতে এদের ত্যাগের কোন নজির নেই। বেশভূষা, সুখসজ্জা, আরাম আয়েশ, ভোগ-বিলাস, বস্তুতান্ত্রিক জগতের জীবনোন্নয়নের শিক্ষার মোহ, মাতাপিতা, ভাইবোন, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মায়া কাটিয়ে তোমার রাহে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে তোমার দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় এরা তো কুত্রাপিও ইতস্তত করেনি। সকলকে তোমার নেগাহবানীতে নিয়ে যাও।"

"হে রাব্বুল আলামীন! আর এদের যেসব উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় জীবন তোমার দ্বীনের জন্যে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছে এদেশের সবুজ মাঠ ঘাট, রাজপথ—যাদের পবিত্র শোণিতে লোহিত হয়েছে এদেশের খাল-বিল, নদীজল, যারা অকুণ্ঠচিত্তে এ জগতের মায়া বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছে শাহাদাতের কঠিন পথ, তাদের এ রক্তরঞ্জিত প্রচেষ্টা তুমি গ্রহণ করো। এদের আত্মত্যাগের মহিমা এ দুনিয়ায় বিরল। তোমার পথে শাহাদতের জন্যে এদের রক্ত করে উঠত টগ্‌বগ্–এদের শোণিতে বইত শাহাদতের প্রাণবন্যা। মনে উঠত আত্মত্যাগের ঢেউ। তাদের তোমার কাছে স্থান দাও, তোমার নৈকট্য লাভের জন্যই তো তারা হয়ে উঠেছিল দামাল মাতাল পাগলপারা। শাহাদাতের জাম তারা প্রাণভরে পান করেছে–তুমি এখন তোমার কাছে তাদের বসিয়ে শরাবন তহুরা পান করাও। তোমার শত্রুদের সাথে, খোদাদ্রোহীদের সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে তারা খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার অপরূপ

বাগিচার নির্মল সরোবরে তাদের রক্তে রঞ্জিত দেহ গোসল দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দাও। সংখ্যা স্বল্পলতার পরওয়া তো তারা করেনি।"

## ২০

পুলিশের হেফাজতে জেরার বিবরণ আছে মজুমদারের বইতে। এর মূল প্রতিপাদ্য হলো, পুলিশের বিভিন্ন শাখায় তাকে বার বার নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে, জেরা করা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। কারণ সে তো নির্দোষ। ষড়যন্ত্র করে তাকে অটকে রাখা হয়েছে। মজুমদারের ভাষায় "মিথ্যার ব্যাসাতি (বেসাতি) ছড়িয়ে আজকার সংবাদপত্র আমার কুখ্যাতি বুকে লয়ে দেশবাসীর কাছে, সারা দুনিয়ার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। আর তার খেসারত দেবার জন্যে আমি আজ রওয়ানা হয়েছি এক দুর্গম পথে।"

মজুমদার কখনও স্বীকার করেননি যে, আল-বদরদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তার ভাষায়–"আলবদরের কথাটাই আমি স্বাধীনতার নিকটবর্তী সময় থেকে তারপর শুনেছি। এদের সংগঠনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। পার্টির পলিসি মেকিংয়ে আমার কোন অংশ ছিল না।"

যেসব তথ্য-প্রমাণ পাওযা গেছে তাতে দেখা যায়, আলবদরের প্রধান শক্তি ছিল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংঘের। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন কী করছে তা জামায়াতের দফতর সম্পাদক জানে না এ তো তাজ্জব ব্যাপার! আল-বদর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী, পূর্ব পাকিস্তান প্রধান ছিলেন আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, ঢাকা মহানগরীর আমীর মোহম্মদ ইউনুস ছিলেন শুরার সদস্য। আল-বদরদের প্রধান সংগঠক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শহর কমিটির দফতর সম্পাদক আল-বদরদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না এটা নির্জলা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু খালেকের উপায় নেই। তিনি কীভাবে লিখবেন যে, তিনি বদর বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ? তা'হলে তো তার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রধান যুক্তিই নস্যাত হয়ে যায়।

মজুমদার বার বার উল্লেখ করেছেন যে, শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও তিনি ভেঙে পড়েননি কারণ তিনি বা তারা তো আল্লাহর পথে ছিলেন। তার ভাষায়–

"কালকের অমানুষিক অত্যাচারের পর আজ আবার এ নতুন অত্যাচার কি করে সহ্য করলাম তা ভাবলে আজও চোখ বন্ধ হয়ে আসে। মেরেই ফেলবে–মরেই যাব কাজেই প্রশান্ত মনে শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করতে

লাগলাম। তাঁর স্মরণেই এত উৎপীড়নেও নিস্তেজ নিরুৎসাহ ও দুর্বল হয়ে পড়িনি। সেসময়ই মনে জাগতো অন্যায় তো আমরা কিছুই করিনি। করিনি আমরা কোন অপরাধ। আল্লাহর পথে ছিলাম–তাঁরই জন্যে কাজ করেছি। আমরা তো কারুর কোন ক্ষতি করিনি, অন্যায় করিনি বরং অন্যায় রুখেছি। অপকার করিনি বরং উপকার করেছি। মানুষকে দুর্বিষহ অবস্থা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। আর্মি তো আমরা ডেকে আনিনি–এনেছে তারা। আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তারা আসেনি বরং এসেছে তাদের সাথে আলাপ করে। সামরিক বাহিনীকে তারাই এ দেশের সরলপ্রাণ নিরীহ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে। আমরাই বরং সামরিক বাহিনীর বন্দুকের নলকে উপেক্ষা করে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছি। এই যদি আমাদের অপরাধ হয় তাহলে এ নির্যাতনই আমাদের প্রাপ্য। নতুবা তাদের বিচার খোদার হাতে। জালেমের এ জুলুম অবনত মস্তকে সহ্য করেই যাব। মানুষের ভুল ভাঙ্গবার পরই আমরা এর ফল পাবো। সে ভুল ভাঙ্গতে হয়ত বেশিদিন লাগবে না।"

এই আল্লাহর পথটি কী ? সামরিক বাহিনী ডেকে এনেছে মুক্তিযোদ্ধারা বা বাঙালীরা আর জামায়াত কর্মীরা মানুষকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে 'বন্দুকের নলকে উপেক্ষা' করে। এত বড় জ্বলজ্যান্ত মিথ্যার উত্তর কীভাবে দেব ?

১৯৭১ সালে খালেকরা সেনাবাহিনীকে কিভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং কীভাবে হত্যার প্ররোচনা যুগিয়েছিলেন তারই কিছু উদাহরণ দেব। নতুন প্রজন্মের এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে জানা দরকার—

১. ৫ আগস্ট ১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান নিজামী চট্টগ্রামে এক সভায় বলেন–"নিজামী পাক সেনাবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতের সকল অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী হামলার মোকাবিলা করার জন্য তাদের সাহস ও ত্যাগের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন।" [ সংগ্রাম ]

২. ৫ নবেম্বর ১৯৭১ সালে জামায়াতের মুখপত্র সংগ্রাম-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ–

"রংপুরের দরাজগঞ্জে ভারতীয় চরদের [মুক্তিযোদ্ধা] সাথে একটি সংঘর্ষে রেজাকাররা ৩ জন ভারতীয় চরকে হত্যা করে ২টি রাইফেল এবং ৩টি শটগান উদ্ধার করে। দুষ্কৃতকারীরা [মুক্তিযোদ্ধা] স্থানীয় টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।"

৩. নুরুল আমীনকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া–"তিনি জানান যে, প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ও তাদের আরো অস্ত্রশস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছেন।" দৈঃ পাকিস্তান, ৭-১১-৭১।

৪. "চট্টগ্রামের আল-বদর বাহিনী সন্ধ্যায় চাকতাই-এ এক অভিযান চালিয়ে ৪০ জন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে" [অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের]। সংগ্রাম, ১১.১১.৭১

৫. "জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেন যে, পাকিস্তানী এছলামী ছাত্রসংঘ পৃথিবীতে হিন্দুস্থানের কোন মানচিত্র স্বীকার করে না। এছলামী ছাত্র সংঘ ও আলবদর বাহিনীর কাফেলা দিল্লীতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রসংঘর একটি কর্মীও বিশ্রাম গ্রহণ করিব না। প্রসঙ্গক্রমে মোহাম্মদ মুজাহিদ ঘোষণা করেন যে, এখন হইতে দেশের কোন পাঠাগার, গ্রন্থাগার, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র বা দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী কোন পুস্তক রাখা চলিবে না। কোন স্থান, গ্রন্থাগার ও দোকানে পাকিস্তানের আদর্শ ও সংহতি বিরোধী পুস্তক দেখা গেলে তাহা ভস্মীভূত করা হইবে।" দৈনিক আজাদ, ৮.১১.৭১

৬. ১৫ নভেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকা জামায়াতের নবনির্বাচিত মজলিসে শুরার উদ্বোধন করা হয়। সেখানে ঢাকা জামায়াতের প্রধান গোলাম সরওয়ার বক্তৃতা করেন। "মজলিসের গৃহীত প্রস্তাবে রেজাকারদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র এবং দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দান করে রেজাকারদের সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান হয়।"

এসব সংবাদ ছাপা হতো, জামায়াতের মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'–এ। অথচ ঢাকা জামায়াতের দফতর সম্পাদক খালেক মজুমদার এগুলোর কিছুই জানেন না।

পুলিশ যখন তাকে জেরা করছে তখন একদিন আইজি এলেন দেখতে। আইজি নাকি মজুমদারকে দেখে বলেছিলেন "His appearance indicates on his simplicity and sincerity" জনাব আবদুল খালেক তখন আইজি। তিনি এ মন্তব্য করেছিলেন কিনা জানার জন্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। তখন এর সদুত্তর দেয়া যাবে। কিন্তু খালেক সাহেবকে যতদূর জানি একজন আল-বদর সম্পর্কে এমন অর্বাচীন মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জেলের মধ্যে নাকি তিনি একদিন কোরান শরীফ চেয়েছিলেন, পাননি। তাকে জানানো হয়েছে জেলের হুকুম ছাড়া তা সম্ভব নয়। এবং মন্তব্য করেছেন– "ভাবলাম, হায়রে মুসলমানের দেশ! মুসলিম দেশের একজন নাগরিক কোরান শরীফ গড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এখনই পবিত্র কালাম পড়াতো দূরেরকথা পড়ার হুকুম চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ভবিষ্যতে এ দেশের মুসলমানদের ভাগ্যে কি লিখা আছে?" উল্লেখ্য, খালেক কিন্তু সবসময় এই ইঙ্গিত করেছেন দেশটা খঁটি মুসলমানের নয়। আল্লাহ্র বান্দা হচ্ছে একমাত্র জামায়াতীরা। এই বাক্যগুলো লেখা হয়েছে যাতে ধর্মমনস্ক কোন ব্যক্তি পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আল-বদরদের সঙ্গে তার বা জামায়াতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার যুক্ততার কথা বার বার অস্বীকার করলেও

একবার তিনি স্বীকার করেছেন নিজের অজান্তে। এক টিভি প্রতিনিধি তার সাক্ষাতকার নিতে আসেন। তাদের সাক্ষাতকারের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি—

"টিভি প্রতিনিধি ঃ এই কিলিংগুলো আপনারা কেন করলেন ? এরা কি এদেশের লোক ছিল না ? এদেশের জন্য কি আপনাদের মায়া নাই ?

আমি ঃ আমরা কোন লোক মারি নাই।

প্রতি ঃ তবে কে মারলো ?

আঃ তা জানি না ?

প্রতি ঃ এবি (আলবদর) কে আপনারা টাকা পয়সা দিতেন না ?

আঃ আমি জানি না।

প্রতি ঃ সারেন্ডারের আগেও তো আপনারা এবিকে টাকা পয়সা দিয়েছেন।

আঃ আমি বলতে পারি না।

প্রঃ আপনি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন।

আঃ ঠিক কথা নয়। নিয়ে থাকলে ছাত্র সংঘের ছেলেরা নিয়েছে।

১৬ তারিখে কেউ কেউ কিছু টাকা নিয়েছিল।

ভাউচার ছিল অফিসে তাই আমি একথা বলতে বাধ্য হয়েছি।" আগেই উল্লেখ করেছি আল-বদরদের অধিকাংশ ছিল ছাত্র সংঘের সদস্য।

## ২১

"বিচার প্রহসন'-এর পর খালেকের ঢাকায় তার কয়েদী জীবন শুরু হলো। দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েদী জীবন ও তার বিচারের নথিপত্রসহ দীর্ঘ বিবরণ আছে। ১৭.৭.৭২ তারিখে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ এফ. রহমান তাঁর রায়ে বলেন–"এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন কলাবোরেটর। আমরা আরও দেখতে পাই যে ১৩/৭/৭১ আর্মি ইস্যুকৃত তার একটি রিভলবার লাইসেন্স ছিল।...এসব প্রমাণ করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পাক সেনার একজন কলাবোরেটর।

উপরের বর্ণিত ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রমাণাদির দ্বারা আমার এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এ অভিযুক্ত আবদুল খালেক ও অন্যান্য দুষ্কৃতকারীরা মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্য অথবা মারার জন্য খুব বিপজ্জনক জায়গায় ডিসপোজ করেছে। এবং আমি মনে করি এ দুটো পয়েন্ট (১-২) সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।" বিচারক খালেক

মজুমদারকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। মজুমদারের ভাই হাই কোর্টে আপীল করেন। খালেক কারাবাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। যেমন, তাকে মওলানা বলা হতো। নামাজ-কালাম জেনে তারাই ফিরিয়ে এনেছিলেন। তার এইসব বিবরণে আমি যাব না। শুধু কিছু মন্তব্যের উল্লেখ করব। কলেরা হাসপাতালে তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। "তখন বাজারে চালের দাম আগুন। সারাদেশের মানুষ আটা নির্ভর। আমার ইতিহাস ও শাস্তির কথা শুনে মহিলা নার্সটি সিপাহীটির সামনে বলে উঠলেন, "আপনি এখনো শুয়ে আছেন কেন ? জানালাতো একেবারে খোলাই আছে। লাফ দিয়ে পড়ে চলে যান। অনাহূত এত কষ্ট করবেন। মাসীমার বদৌলতে দেশ স্বাধীন করে আজ খেতে পাই না। দু'এক পোয়া চালের ব্যবস্থা হলে বাচ্চাদের ভাত পাকিয়ে খাইয়ে দেই। নিজেরা খাই রুটি। আর যে দিন চালের ব্যবস্থা হয় না সেদিন বাচ্চাদের করুণ অবস্থা দেখলে বুক ফেটে কান্না আসে। আমি হেসে বললাম, এতে আমার কোন মন্তব্য নেই।....তবে আমরা কোন আইন অমান্য করি না। এ মিয়াসাব (জেলে সিপাহীকে মিয়াসাব বলে) যদি আমাকে নিয়ে যাবার সময় কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় আর আমি বেঁচে যাই তাহলে আমি পালাবার সুযোগ না নিয়ে জেল গেটে ফিরে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে সিপাহীর দুর্ঘটনার খবর দেবো ও নিজে আমার নিবাসস্থল কারাগারে ঢুকবো। আমার কথা শুনে মনে হলো নার্সটি আশ্চর্য হয়েছে।" নার্স কেন আমরাই থ মেরে যাচ্ছি। ১৯৭৩ সালে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে কমবেশি সবাই ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু, জেল সিপাহীর সামনে কোন নার্স কোন রাজাকারকে একথা বলবে তা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। পুরো বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে এটি প্রমাণের জন্য যে, স্বাধীন হয়ে বাঙালি সুখী হয়নি। অতএব খালেক মজুমদাররাই ঠিক। এবং চারদিকে চলছে বিশৃঙ্খলা কিন্তু সে সময়ও মজুমদাররা আইনের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল।

'ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বভাবজাত' শিরোনামে মজুমদার লিখেছেন, কীভাবে জেলের সবাই ধার্মিক হয়ে উঠছিল। দাউদ হায়দার ও এনামুল হককে যখন ধর্মের অবমাননা করার জন্য জেলে আনা হলো তখন সমস্ত কয়েদীর রোষের সম্মুখীন হলো তারা। এ বিবরণ দেয়া কালে তিনি বাংলাদেশকে মুসলমানদের দেশ হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। মন্তব্য করেছেন—"তাই বলেছিলাম বাংলাদেশের মাটি ধর্মের জন্য; অধর্মের জন্য নয়। ধর্মের বীজ বপন এ দেশে যত সহজ অন্য মতবাদের বীজ তত সহজ নয়। বুদ্ধিজীবীদের মাথা ওয়াশ হলে এ দেশের সাধারণ মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য, আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপাগল করে তোলা দুরূহ কিছু নয়।" তা হলে দেখা যাচ্ছে,

বুদ্ধিজীবীরাই সবকিছুর প্রতিবন্ধক। এবং এ কারণেই মজুমদাররা বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে দেশ বুদ্ধিজীবীশূন্য করে দিতে চেয়েছে।

২৯ ফেব্রুয়ারির (১৯৭৩) একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন খালেক। 'হাইজ্যাকার' কিছু পালাতে চাইলে জেলে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ গুলি চালায়। খালেকের ভাষ্য অনুযায়ী নিহত হয় নয়জন। এর মধ্যে জামায়াতী ছিল বোধহয় কয়েকজন। তার ভাষায়, "বর্বরোচিত এই নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে শহীদ হয়েছেন এ পাষাণ কারার নয়টি নির্দোষ প্রাণ। শাহাদাতের লাল রক্তে রঞ্জিত করেছে তারা কারার শুষ্ক পথ। বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারার অপরাধে নির্দোষ জীবন নিয়ে কারায় আসার পরও এ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে তাদের স্থান হলো না।" এবং এর জন্য দায়ী কে? "শহীদ আনিস কি তখন জানতো মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কুটিলমনা রায়ের রাইফেলের নলে তার যমদূত এসে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।"

এর পর সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তার দীর্ঘ বক্তব্য আছে। দীর্ঘ সত্ত্বেও আমি তা উদ্ধৃত করছি। এতে পরিস্ফুট হবে রাজাকারের মন-"সারা দেশে যখন আলবদর-রেজাকারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে বিষোদগার ছড়াচ্ছিল এদেশের সংবাদপত্রসহ সব প্রচার যন্ত্রগুলো, ঠাঁই নেবার জন্যে যখন জেল ছাড়া এদের নেই এক বিন্দু জায়গা বাইরের জগতে- আর জেলের ভিতরেও যারা জীবন্মৃত, টু শব্দটিও যাদের ছিল না কোথাও তারা নাকি জেল ভেঙ্গে পালাচ্ছিল। প্রকৃত সত্যকে আমূল বিকৃত করে জঘন্য মিথ্যা প্রচার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার তাদের কি অশুভ ও পঙ্কিল পাঁয়তারা। এ বিবেকহীনদের কি একটি বারও বিবেকের কাছে জবাবের জন্যে বিবেকের কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয়নি-হবে না কোন দিন?

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর শেষ পরিণতি হিসেবে জেলকেই যখন ভাগ্যবরণ করে নিতে হলো তখন আমরা সব নির্যাতনকেই মেনে নিয়েছি, মেনে নিয়েছি সব অত্যাচারকে অতি সহজভাবেই। জাতির প্রকৃত কল্যাণের জন্য, খাঁটি, মহৎ, সৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিক হিসেবে দেশের মঙ্গল জানানোর জন্য যে ত্যাগ স্বকীর করেছি তার মূল্য তার পুরস্কার একমাত্র খোদার নিকট প্রাপ্য। কিন্তু দেশ ও জাতির এটাই যে প্রকৃত সেবা, স্বার্থ সংরক্ষণের ঘাঁটি ও একমাত্র পথ- এতে ছিল না আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ। আর সন্দেহ ছিল না বলেই সংখ্যাস্বল্পতার পরোয়া না করেও এক অসম্ভব রকম ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ করেছি। আর এ কারণেই এমন বিপর্যয়েও বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা অনুতাপ করিনি। আদর্শ ও ন্যায়ই ছিল আমাদের প্রবোধ। দেশ ও দেশবাসী একদিন মূল্যায়ন করবে এ সঠিক সত্যকে; তাই সব নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল আমাদের সান্ত্বনার একমাত্র খোরাক। প্রকৃত সত্যকে লুকিয়ে

রেখে যে বক্তব্য দেশবাসীর কাছে তাদের স্বার্থেই রাখা দরকার ছিল তাতে তারা ভুল করেনি। তা যতই মিথ্যা, প্রবঞ্চনাময় ও ঘৃণ্যই হউক না কেন ? পরিণতির প্রতি তাদের তাকানো প্রয়োজন ছিল না। এ ভাবেই তারা অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে বিভ্রান্ত করেছে সবাইকে। করেছে ভুল পথে পরিচালিত। জেলখানার ভেতরে সেদিনকার সংঘটিত ঘটনা সম্পূর্ণই বিকৃতরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া–সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ প্রতিনিধিদের মনোভাবের হীন পরিচায়ক।

ভুল ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে জাতিকে অন্ধকারের অতল তলে নিমজ্জিত করে রাখার এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাতির যদি ভুল সংশোধন নাও হয়, আমরা যদি চিরদিনই অবহেলিত হয়েই থাকি তবুও আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। সত্যকে আমরা সত্যই বলবো— আর মিথ্যাকে মিথ্যাই— তা যত অপ্রিয়ই হোক। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্যই ও পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না এক তিলও তা শত্রুরা যত শক্তিশালীই হউক। কারণ, আমাদের পথই সত্য ও সুন্দরের পথ। ঐ পথের পথিকরা দুঃখকষ্ট, বিপদআপদ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ত্যাগ তিতিক্ষা, অত্যাচার-অবিচার মাথা পেতে নেয় অতি সহজেই। একটি জাতিকে শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার এটিই হলো খাঁটি পথ– এ সত্য ও সুন্দর হলো আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস। এ পথকে ঢেকে রেখে রেখে আর কতদিন তারা একটি জাতিকে প্রবঞ্চিত করবে— দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে ? আর কতদিন পঙ্কিলতার গভীর গহ্বরে ঢুকে থাকবে? এদের এ হীন কার্যক্রমের কোন হিসাব কি দিতে হবে না কোনদিন কারো কাছে ?"

এই হচ্ছে রাজাকারের মন, রাজাকারের ধর্ম। তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয়। আর কেনই বা হবে? গত দু'দশক শাসকরাই তো তাদের সঙ্গে আঁতাত করতে এগিয়ে এসেছে। ১৯৭৬ সালে হাই কোর্টের রায়ে খালেক মজুমদার মুক্ত হয়ে যান। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী তাকে বেকসুর খালাস দেন। উল্লেখ্য, সন তখন ১৯৭৬। আরও উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী গিয়েছিলেন গোলাম আযমের কাছে দোয়া চাইতে।

খালেক মজুমদারের ভাষায়–"এ রায়ের দ্বারা আল্লাহ্ সত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মামলা হতে বেকসুর খালাস দেন।" মজুমদার এখন ধনী ব্যবসায়ী এবং যুক্ত জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে।

## ২২

রাজাকারদের মধ্যে আয়েন উদ-দীনকে আমার ঠাণ্ডা মাথার, বুদ্ধিমান এবং কৌশলী মনে হয়েছে। অবশ্য, রাজাকার মাত্রই খানিকটা ঠাণ্ডা মাথার হতে হয়, না হলে ঠাণ্ডা মাথায় সে খুন করবে কীভাবে ?

এক সময়ের মুসলিম লীগ নেতা কাম-রাজাকার মুহাম্মদ আয়েন উদ-দীন এখন রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়। তার নামটিও তাই অপরিচিত হয়ে উঠছে। অবশ্য রাজশাহী অঞ্চলে, আয়েন উদ-দীন নামটি এখনও আমাদের জেনারেশনের মানুষজনের মাঝে ভীতির সঞ্চার করে। আয়েন উদ-দীন ৩৭৪ পৃষ্ঠার একটি আত্মজীবনী লিখেছেন, নাম 'স্বদেশ, সময় ও রাজনীতি'। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯০ সালে। রাজাকারের আত্মজীবনীর ভূমিকা লিখেছেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। তিনি আবার সমন্বয়ের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "হীন দলাদলি ও ক্ষমতালিপ্সার ষড়যন্ত্রে আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস এখনও আচ্ছন্ন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে আমাদের বক্তব্য হবে যার যা বলার আছে তাকে তা বলতে দিতে হবে— সবার উপরে স্বদেশ—আমাদের রাজনীতিবিদগণ এমন কিছু করবেন না যাতে অনৈক্যের ফাটল পথে কোন বিদেশী সিংহ এসে আর সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়।" কবির এই বিদেশী সিংহ কে ? ভারত ? যদিও তিনি তা বলেননি। যদি ভারতই বিদেশী সিংহ হয় তাহলে তাকে রোখার জন্য কার সাথে ঐক্য করতে হবে? আর কার সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে। আর যদি পাকিস্তানই বিদেশী সিংহ হয় তাহলে কী করতে হবে। তাদের সঙ্গে ঐক্য করে থাকতে হবে যাতে তাদের এই থাকাটা চিরস্থায়ী হয়। রাজাকারের বইয়ের ভূমিকা তিনিই লিখতে আগ্রহী হবেন যারা রাজাকারের সহমর্মী বা আদর্শে বিশ্বাসী বা কাছাকাছি।

আয়েন উদ-দীনের আত্মজীবনীর ধাঁচটি অন্য রকম। ভাষা সুন্দর, বলার ভঙ্গিও তাই। অন্তরঙ্গ স্বরে কথা বলে যাচ্ছেন। নাটকীয়তাও আছে। মাঝে মাঝে '৭১-এর কথা এসেছে। কথাচ্ছলে। না হলে সব অন্যকথা। পড়ার পর মনে হবে, বা এমন হৃদয়বান অপাপবিদ্ধ মানুষটিকে মুক্তিযোদ্ধারা এত হেনস্থা করেছে! না আসলেই মুক্তিযোদ্ধাদের দিল বলে কিছু ছিল না। দিল আছে রাজাকারদের, সহমর্মিতাও আছে তাদের মধ্যে। আর আয়েন উদ-দীন না যুক্তফ্রন্ট করা মানুষ! এই যুক্তফ্রন্টের জন্যই তো সে জেল খেটেছে। আর এই যুক্তফ্রন্টের তো তরুণ নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু আসলেই কি তাই ? তা নয়। আমি আয়েন উদ-দীনের গ্রন্থ থেকে মাঝে মাঝে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেব রাজাকারের মন বোঝার জন্য। না হলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না।

বইটি লিখলেন কেন আয়েন উদ-দীন? কারণ, কারাগারে বসেই অনেকে 'তথ্যসমৃদ্ধ' ইতিহাস রচনা করেছেন। কারাগারে রাজাকার সাজ্জাদ হোসায়েন

তাকে উৎসাহ দেন, উৎসাহ দেন তার স্ত্রীও। তার ভাষায়, হোসায়েনের "যুক্তি নির্ভর বক্তব্যের ফলে জেল থেকে সহধর্মিনীকে যেসব চিঠি লিখেছিলাম সেই সব চিঠির একান্ত ব্যক্তিগত অংশ বাদ দিয়ে 'স্বদেশ, সময় ও রাজনীতি' নামক এই বইখানি প্রকাশ করা হলো। এই বইয়ের সব ঘটনাই জ্ঞান মতে সত্য..."

পাকদের আত্মসমর্পণের পর আয়েন উদ-দীন অন্য রাজাকারদের মতো দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন। পারলে দেশ ছেড়েই যেতেন কিন্তু সে সুযোগ পাননি। শেষ মুহূর্তে নাকি কর্নেল তার সঙ্গে দেখাই করেনি। গাদ্দারদের অবস্থা তাই হয়। কোন পক্ষই বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই বিষয়টিই তিনি উপস্থাপন করেছেন অন্যভাবে নিজেকে মেসিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে। তার ভাষায়–

"তোমাদের বাঘাদের বাড়িতে রেখে সামরিক ক্যাম্পে ফিরে আসার পর একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, শুধু বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নয়, এর গাছপালা, এর মাটি আমাকে বিদ্রূপ করছে। পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। ক্ষণিকের জন্য বোধ হয় আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেছিলাম। হঠাৎ ভেসে উঠলো আমার সামনে তোমার ছবি। কানে ধ্বনিত হলো তোমার শেষ আদেশ "বাংলাদেশ তোমার জন্মভূমি। এর আলো-বাতাসে তুমি মানুষ। বর্তমান অবস্থায় তোমাকে অবহেলা করলেও ভবিষ্যতে অস্বীকার করতে পারবে না। তুমি আত্মগোপন কর। সামরিক জান্তার সাথে দেশ ছেড়ে বিদেশ যাবার চেষ্টা করো না। আত্মগোপন রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। কামাল আতাতুর্ক আত্মগোপন করেছিলেন। আত্মগোপন করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার শোয়েকার্নো। আত্মগোপন করেছিলেন মাও সেতুং। কিন্তু তাই বলে কি এঁদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। না। তাঁদের আত্মগোপনের ফলে তাঁরা পরবর্তীকালে শুধু নিজেরাই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেননি। সংঘবদ্ধ করবার সুযোগ পেয়েছেন নিজ নিজ জাতিকে। স্ব স্ব জাতিকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে করেছেন চিরমুক্ত। সংযোজন করেছেন বিশ্ব ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়।" এক অনুচ্ছেদেই নিজেকে তিনি মাও সেতুং-য়ের সমকক্ষ করে ফেলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পরবর্তীকালে যে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা কি নিজের দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, না হত্যা করে, না দেশ থেকে হটিয়ে দিয়ে? এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে অবশ্য আয়েন উদ-দীন বিপদে পড়ে যাবেন। কিন্তু এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। স্ত্রীর ভাষ্যে নিজেকে নিয়ে গেছেন–"হযরত মোহাম্মদ (সঃ)কে শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য করতে হয়েছে গুহায় আত্মগোপন। যথোচিত আত্মগোপনে আছে বীরত্ব ও মহত্ত্ব আত্মসমর্পণে আছে কাপুরুষতা আর আত্মহত্যায় আছে ঘৃণ্য মানসিকতা। অতএব আল্লাহকে স্মরণ করে আপাতত হারিয়ে যাও।" আয়েন উদ-দীন তো কাপুরুষ নন সুতরাং তিনি হারিয়ে যেতে চাইলেন।

**সোজা বাংলায় একজন রাজাকার ১৬ ডিসেম্বরের পর জানের ভয়ে পালাচ্ছিল। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে, যুক্তি দিয়ে আয়েন উদ-দীন বোঝাতে চেয়েছেন পৃথিবীর মহামানবরা বিশেষ বিশেষ সময়ে পালিয়েছিলেন। তাদের অনুসরণ করেই তিনি পালালেন। এটিই হচ্ছে তার রচনা কৌশল। পুরো বইটিতে এ কৌশলই নেয়া হয়েছে। কিন্তু, মূল প্রশ্ন হচ্ছে, মাও সেতুং বা শোয়েকার্নো বিপ্লব বা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছিলেন। এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগত কারণে মাঝে মাঝে হটে গিয়েছিলেন। কিন্তু জনাব আয়েন উদ-দীন কী কারণে পালাচ্ছিলেন? এ কথা কিন্তু কোথাও বলা হয়নি। এভাবেই রাজাকাররা তাদের রাজাকারিত্ব সবসময় ঢেকে রাখতে চেয়েছে।**

## ২৩

আয়েন উদ-দীনের আত্মজীবনীর শুরুটা বেশ নাটকীয়। পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করেছে। আয়েন উদ-দীন সঙ্গী দু'জন রাজাকার নিয়ে পালাচ্ছেন নাটোর থেকে। পথে গাড়ির টায়ার ফেটে গেল। নাটোর স্টেশনে দেখা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রাজাকার অধ্যাপকের সঙ্গে। গাড়ি ফেলে তিনিও পালাচ্ছেন। আয়েন উদ-দীন চাওয়া মাত্র গাড়িটা তাকে দিয়ে দিলেন। ঝলমলিয়া ব্রিজের সামনে হানাদার বাহিনীর সেনারা আটকাল। অনুনয় বিনুনয় করলেন তাদের ব্রিজ পার হতে দিতে। পাকিস্তানীরা রাজি নয়। আয়েন তখন অনুরোধ জানালেন তাদের কমান্ডার কর্নেলের সঙ্গে দেখা করার। কর্নেল তা প্রত্যাখ্যান করলেন। শেষ রাতের দিকে আয়েন উদ-দীন ফিরে এলেন নাটোর। তখনকার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তিনি এভাবে–

"...সকাল দশটায় অত্মসমর্পণ করবে চির অপরাজেয় বলে খ্যাত পাকবাহিনী মিত্র শক্তির কাছে বিনা যুদ্ধে। ডিসেম্বরের যে সকালে সূর্যের আলো চিরদিন লেগেছে অপরিসীম ভাল আজ তা হঠাৎ করে মনে হলো একান্ত অপ্রীতিকর। মনে হলো, অত্যাসন্ন সকালের আলো যদি আজ বিলম্বে আসত। যদি রাত আজ আরও দীর্ঘ হতো খুব ভাল হতো।" এ অনুভব মিথ্যা নয়, সত্যি। রাজাকারের মনের সঠিক অভিব্যক্তি।

**শহরে এসে উঠলেন তার দু'জন সাথীসহ এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধু প্রথমেই তার কাছে টাকা চাইলেন এবং তিনি বুঝলেন যে, সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। পাশের বাড়িতে পালালেন এবং দেখলেন যে আশ্রয়দাতা তার পরিচিত। নাম**

হাসেম। তার পুত্র রহিম এবং নাতিসহ সেখানে থাকেন। রাজাকারদের প্রতি তার গোপন সহানুভূতি ছিল যদিও আয়েন উদ-দীন দেখাতে চেয়েছেন যে, মানবতার খাতিরে হাসেম তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার ভাষায়–"সেদিন আমার জীবন ছিল অনিশ্চিত, মৃত্যু প্রায় অবধারিত। তাই হাসেম সাহেব যখন দ্রুত এসে আমায় তাঁর বুকে চেপে ধরলেন, তখন আমার চোখে আনন্দাশ্রুর যে প্লাবন এসেছিল তা রোধ করতে পারিনি।"

এর পর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বাংলা ছায়াছবির টেকনিকে। খানিকটা বর্তমান, তারপর ফ্ল্যাশব্যাক। আবার খানিকটা বর্তমান, তারপর ফ্ল্যাশব্যাক। ঘরে আত্মগোপন করে আছেন আয়েন উদ-দীন। বাইরে, "স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রথম নাটোর আগমন উপলক্ষে আতশবাজি চলছে। শব্দের কারণ শুনে অবাক হইনি। হয়েছি অশ্বস্ত। বাংলার সাধারণ জনগণ অকৃতজ্ঞ নয়–কথাটা ভাবতেই বুকটা গর্বে ভরে উঠল। সংগ্রামী নেতার কথায় বিশ্বাসী বাঙালী মুসলিম জনতার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ বাংলার ইতিহাসে ভরপুর।"

পড়ে মনে হবে, না রাজাকার মিথ্যা বলে কই ? কিন্তু লক্ষ করুন–মুসলিম জনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা মুসলমানদের, সমস্ত বাঙালির নয়।

এর পর ফ্ল্যাশব্যাক। মুসলিম জনতার সূত্র ধরেই উল্লেখ করছেন তিনি প্রাক ১৯৪৭ সালের একটি উপনির্বাচনের ঘটনা। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের হয়ে আয়েন উদ-দীন ও তার বন্ধুরা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন তখন। নির্বাচনে জিতল মুসলিম লীগ।

"অথচ" তার ভাষায়, "সামান্য সময়ের ব্যবধানে সেই জনতার সাথেই সংযোগ হারাল মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ। ফল হলো মারাত্মক। জনতা নেতাদের থেকে সরে গেল দূরে। শুধু রইল স্তাবক।...ফলে ঝড়ের ঝাপটাতেই ঘর গেল পড়ে। দেশ ভাগ হয়ে গেল। জন্ম লাভ করল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।" এক অনুচ্ছেদে প্রায় পঁচিশ বছরের ইতিহাস। কিন্তু, প্রশ্ন জাগে, মুসলিম লীগ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল দেখেই কি বাংলাদেশের জন্ম হলো ? নাকি মুসলিম লীগের কুশাসন, পাঞ্জাবীদের সমর্থন, বৈষম্য সমর্থন প্রভৃতিও বাংলাদেশের জন্মের কারণ। এসব বিষয়ে কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেন নি আয়েন উদ-দীন। কিন্তু, আলাদাভাবে অনুচ্ছেদ দু'টি পড়লে মনে হবে আয়েন উদ-দীন ঠিক কথাই বলছেন। কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদের আলোকে দ্বিতীয়টি পড়লে বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিপক্ষেই তিনি বক্তব্য রাখছেন। এই হলো রাজাকারের মন।

আবার বর্তমান। হাসেম গৃহে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। সঙ্গী দুই রাজাকারের সঙ্গে দার্শনিক আলাপ করছেন। পরিবার পরিজনদের কথা মনে পড়ছে। ফ্ল্যাশব্যাক। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। "ঘটে গেল অঘটন। সামরিক

কর্তৃপক্ষ দেশের যাবতীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলার নামে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তাতে অনেক ক্ষতি হলো। মারা গেলেন অনেক নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। যারা ছিল নিশ্চুপ নিরপেক্ষ তারাও হয়ে উঠল সচেতন। প্রবল গণআন্দোলনের মুখে তারাও ঢাকার বাইরে চলে গেল। রাজশাহীতে ২৫ মার্চ বেশ কয়েকজন লোককে সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করল।"

অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হবে মিথ্যা তো বলেননি আয়েন উদ-দীন। কিন্তু, আমি বলি, রাজাকার সত্যি কথা বলতে পারে না অন্তত ১৯৭১ সম্পর্কে। আয়েন উদ-দীনের টেক্সটে কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করুন। সামরিক বাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল "আইনশৃঙ্খলা" রক্ষার জন্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি কিছু লোক নিহত হয় তা' হলে তাকে তো গণহত্যা বলা যায় না। কিন্তু ২৫ মার্চ কি তাই ঘটেছিল ? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাটা পাকিস্তানী ভাষ্য। তারাতো নেমেছিল গণহত্যা করে বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহা দমনের জন্য। মানুষ দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল কি 'গণআন্দোলনের' জন্য? গণআন্দোলন তো মানুষ দেশে থেকেই করে। মানুষ তো চলে গিয়েছিল গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য। 'গণআন্দোলনের' জন্য মানুষ চলে গিয়েছিল এ কথা বিশ্বাস করলে দোষটা চাপানো যায় বাঙালি নেতৃবৃন্দে ওপর।

২৮ মার্চ। ছাত্র জনতা কারফিউ ভেঙে নেমে এলো রাজশাহীর রাস্তায়। "সে কি দৃশ্য! অভাবনীয় কাণ্ড। নিরীহ সহজ সরল মানুষের চোখে-মুখে সেকি অপরূপ দীপ্তি। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সে কি তীব্র প্রতিবাদ। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সে কি উদ্যত ফণা। আমার রক্তেও যেন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। স্থির থাকতে পারলাম না। ঘটনাটা ব্যক্তিগতভাবে জানবার জন্য লুঙ্গি, গেঞ্জি পরেই নিচে নেমে এলাম।"

মনে হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য তিনি অস্থিরতা বোধ করছিলেন। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে চলেই গিয়েছিলেন। জনতা তার কাছে এসে নেতৃত্বের দাবি জানাল। বিরাট মিছিল এসে থামল তার বাড়ির সামনে। জনতার ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে এলেন। "কিন্তু একি ? জনতার হাতে নানা প্রকার লাঠি, হাঁসুয়া, দা, ফলা, সড়কি, ইটপাটকেল এবং কয়েকটি বন্দুক। তাদের চোখেমুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, তারা উচ্ছৃঙ্খল-উন্মাদ। অবাঙালী নিধনের গগনবিদারী শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত।"

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পুরো বিষয়টা তিনি নিয়ে এলেন অবাঙালি নিধনে। সঙ্গে সঙ্গে এটা উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, "গত ২৫ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগ নেতারা পলাতক।" মানুষ তার নেতৃত্ব চায়।

এ পর্যন্ত বিবরণ দিয়েই আবার বর্তমানে ফিরে এলেন। সংবাদ পাওয়া গেল, মুক্তিবাহিনী আল-বদর, রাজাকারদের খুঁজছে। যে আশ্রয় দেবে তারও বিপদ হবে। মাইকেও এ ঘোষণা হতে থাকল।

রাজাকাররা ভয়ে ভীত। আশ্রয়দাতা হাসেমের পুত্র রহিম জিজ্ঞাসা করল বাবাকে, "আয়েন উদ-দীন সাহেবরা এখানেই থাকবেন ?" হাসেম উত্তর দিলেন, "নিরপরাধ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেয়ার চাইতে তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়।" অর্থাৎ রাজাকাররা নিরপরাধ। রাজাকাররা যদি নিরপরাধই হয় তা হলে তারা পালাচ্ছিল কেন, বিভিন্ন জায়গায় লুকাচ্ছিল-ই-বা কেন ? এ উত্তর কিন্তু নেই আয়েন উদ-দীনের ভাষ্যে। ফ্ল্যাশব্যাক। ১৩ এপ্রিল ১৯৭১। আয়েন উদ-দীন গ্রামের বাড়িতে লুকিয়ে আছেন আওয়ামী লীগ কর্মীদের ভয়ে। কিন্তু কেন ? তিনি বলেননি। দুপুর থেকে গ্রামের মনুষজন আয়েন উদ-দীনের বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্য আসতে লাগলেন। যেন কেয়ামতের দৃশ্য। জানতে পারলেন—"পাকবাহিনী রাজশাহী-নাটোর রাস্তার দুই ধারের প্রায় এক মাইল বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বাড়িঘর জ্বালাতে ও নরহত্যা, নারীধর্ষণ করতে করতে রাজশাহী শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। পাকবাহিনী অবশ্য ঐ গ্রামে এলো না। কারণ ? সবার ধারণা "একমাত্র চাচার দোয়াতেই আল্লাহ মেহেরবাণী করে সামরিক বাহিনীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছেন।"

তারপর কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বা পাকবাহিনীর কোন বিবরণ নেই। ২৮ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল এবং তারপরের ঘটনাগুলো কী ? বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা সে ফাঁকটুকু ভরার চেষ্টা করব।

২৮ মার্চ রাজশাহী পুলিশ লাইনের পতন হয়। ২ এপ্রিল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয় ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বে। ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল তারা রাজশাহীকে পাকবাহিনী মুক্ত করে। আয়েন উদ-দীন ঐ সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি তো আগেই বলেছেন জনতা প্যাকিস্তানীদের হত্যা করতে চেয়েছে। সুতরাং জনতার ক্রোধ এড়াবার জন্য পালিয়ে গ্রামের বাড়িতে আত্মগোপন করেন।

১৩ এপ্রিল পাকবাহিনী দখল করে রাজশাহী যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন আয়েন উদ-দীন। ১৪ এপ্রিল ফিরে আসেন রাজশাহী।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী, তৎকালীন নগর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জিন্নাতুন নেসা তালুকদার ও মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহিল বাকি এক প্রতিবেদনে জানান, "স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আয়েন উদ-দীন ১৪ এপ্রিল '৭১ রাজশাহী শহরে মাইকিং করে। মাইকিংয়ের ভাষ্য ছিল, আবদুল্লাহিল বাকিকে জীবিত অথবা মৃত, দেহ অথবা মাথা যে এনে দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।" এবং সে থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আল পর্যন্ত আয়েন উদ-দীনের দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজশাহী পরিণত হয়েছিল আতঙ্কের

শহরে। এরপর গঠিত হয় শান্তি কমিটি। আয়েন উদ-দীন হন রাজশাহী শান্তি কমিটির প্রধান এবং প্রধান হয়ে তিনি কী করেছিলেন তা পরে উল্লেখ করব।

## ২৪

আবার বর্তমান, আয়েন উদ-দীন ও বন্ধু রাজাকাররা আতঙ্কিত। ভোর রাতে বন্ধু দু'জন রিক্সা চড়ে পালালেন। আয়েন রয়ে গেলেন। সকালে টিপু নামের এক মুক্তিযোদ্ধা এলেন হাসেমের সঙ্গে দেখা করতে। আয়েন লুকালেন চৌকির নিচে। মুক্তিযোদ্ধা টিপু রহিমকে মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যোগ দিয়েছিলেন সে কাহিনী বলছিলেন। এ কাহিনীর সঙ্গে মিল আছে বাংলাদেশের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার কাহিনীর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তেমন বিকৃতি ঘটাননি আয়েন উদ-উদীন এবং এখানে বিকৃতি ঘটাবার প্রয়োজনও নেই। তবে, আমি এখানে এক দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেব। উদ্ধৃতিটি টিপুর বয়ানের এবং দেখাবার চেষ্টা করব রাজাকারের মন কীভাবে কাজ করে। "গণ্ডগোলের সময় গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। ছিলামও কিছুদিন বেশ আরামে। হঠাৎ এক রাতে গভীর অন্ধকারে, প্রায় তিনটার দিকে একদল সশস্ত্র লোক, গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সদ্য ঘুমভাঙ্গা লোকজন দেখল যে, দুর্বৃত্তরা আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়িতে বাড়িতে আগুন দিচ্ছে। লুটপাট করছে বিবেক বিবর্জিত পশুর ন্যায় অসহায়-অবলা নারীদের অত্যাচার করছে। এবং পুরুষদের বিশেষ করে যুবকদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। এরা কারা সে পরিচয় নেবার সময় তখন ছিল না। তাই বাড়ির কাছে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করলাম।

হায়েনারা আমার এক অবিবাহিতা চাচাতো বোনকে ধরল। পাশবিক অত্যাচার করল। তারপর নির্মমভাবে বেয়োনেট চার্জ করে আমার চোখের সামনে, কয়েক হাত দূরে হত্যা করল। উত্তেজনায় পাগলপ্রায় হয়েছিলাম–চেয়েছিলাম হায়েনাদের টুটি চেপে ধরতে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে মূর্খের মতো আত্মবলি না দিয়ে সময়মতো এই পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা আমাকে সংযম অবলম্বনে সহায়তা করল। নিষ্পাপ, নিরপরাধ বোনের অসম্মানজনক অপমৃত্যুতে জন্ম হলো আমার নতুন সত্তা। শান্তিপ্রিয় আমি হয়ে উঠলাম নির্মম ও কঠোর। নবজন্মের সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম দেশ ছেড়ে ভারত যাব। অবশ্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বে কয়দিন ধরে বিবেকের সাথে সংগ্রাম করলাম। নাটোরে বিহারী হত্যার ব্যাপারে

আমাদের গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত জড়িত ছিল সত্য। তারা পাকবাহিনীর নাটোর আগমনের আগেই গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে অন্য কোথাও। প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু দুর্বৃত্ত লোক সামরিক বাহিনীর সহায়তায় নিরপরাধ গ্রামবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার করল এই হত্যার জন্য। মুসলমান হয়ে মুসলমানের রক্ত নিয়ে হোলি খেলল। এটা কোন যুক্তিতেই মানতে পারলাম না।"

"সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যেদিন রাতে জন্মভূমি ছেড়ে একদল যুবকের সাথে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিই, সেদিন সন্ধ্যায় পৈতৃক ভিটায় দাঁড়িয়ে কান্নার গতিরোধ করতে পারিনি। লাঞ্ছিত বোনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছি তার ওপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ আজও নিতে পারিনি বলে। আব্বা-আম্মার কবরের মাটি জাপটে ধরে কেঁদেছি। চেয়েছি দোয়া। শপথ নিয়েছি আল্লাহর নামে মনে মনে যে, যারা ইসলামের অনুসারী হয়ে, মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে, মুসলমান মা-বোনকে শুধু বাঙালী হওয়ার কারণে বেইজ্জত করেছে, নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে নিঃশঙ্কচিত্তে, বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়িঘর জ্বালাতে, লুট করতে, তাদের খতম না করা পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাব। তারপর নানা গ্রাম, নদীনালা, মাঠ, ঘাট, পেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে রাত যাপন করে, তিনদিন পরে, সাধারণ নাগরিকের বেশে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। মনে হলো যাদের সাথে আপন তাহজিব তমদ্দুন বজায় রেখে সহাবস্থানের সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেও আমাদের পূর্বসূরিরা ব্যর্থ হয়ে, বাধ্য হয়ে ভারত ভূখণ্ডকে কেটে দু'ভাগ করে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন; ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে আমরা সেই ভারতীয় নেতাদের কাছে দাঁড়িয়েছি আশ্রিত হিসাবে।"

টিপুর বক্তব্যটি এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক; বিশেষ করে তার বয়ানের শেষটুকু—"আমরা প্রত্যেকেই পাক বাহিনীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তারা জানে যত সত্বর ট্রেনিংয়ে পারদর্শী হয়ে উঠে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারবে এবং তত তাড়াতাড়ি তারা বাংলাদেশের নিরীহ ভাইবোনদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।"

এ ভাষ্য আয়েনের নয়, মুক্তিযোদ্ধার। এবং তিনি জানেন মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য মোটামুটি এরকমই হবে। এ ভাষ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা উল্লেখ করছেন এ কথা প্রমাণের জন্য যে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তার কোন ক্ষোভ ছিল না। পাঠকের মন যাতে নিউট্রালাইজ হয়ে যায় সে চেষ্টাই করেছেন এখানে। কিন্তু লক্ষ করুন, ১৯৭১ ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় নয়, গণ্ডগোলের

সময়। টিপুর পাড়া যে আক্রান্ত হলো তার কারণ কী? কারা আক্রমণ চালিয়েছিল। তিনি তা বলেননি, কিন্তু বোঝা যায় বিহারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল ও সঙ্গে ছিল পাকিরা। এবং তারা আক্রমণ করেছিল এ কারণে যে "নাটোরে বিহারী হত্যার ব্যাপারে আমাদের গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত জড়িত ছিল।" এভাবে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যায় মূলত বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির যোগ দেয়ার কারণ হয়ে ওঠে বিহারী কর্তৃক বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। শুধু তাই নয়, ভারতে পা দিয়েই টিপুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দীর্ঘ ২৫ বছরের পটভূমিকা এভাবেই আয়েন উদ-দীন আড়াল করে ফেলেন।

এরপর আবার আয়েন উদ-দীন ফিরে যান ১৯৩৭ সালে। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মা-ই তাঁকে বড় করে তোলেন। এ পর্যায়ে আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে জীন ডিকসন পর্যন্ত বহু ব্যক্তিত্বের গল্পগাথা পরিবেশিত হয়েছে। তারপর যুক্তফ্রন্টের কাল। কফিল উদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করেছেন সে নিয়ে উত্তেজনা চলছে। যুবক আয়েন উদ-দীন যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ করেছিলেন। এ নিয়ে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা হান্নানের সঙ্গে ছিল তাঁর দ্বন্দ্ব। যে দিন কফিল উদ্দিন পদত্যাগ করেন সেদিন হারাধনের চায়ের দোকানে আয়েন ও তাঁর বন্ধুরা এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন। পরদিন সকালে শোনেন হান্নান খুন হয়েছেন এবং তাঁর বড় ভাই ও চাচাকে এ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার " বড় ভাই শুধু ধার্মিকই নন, সাদামাটাও বটে। তাঁর সরলতা, সহনশীলতা অন্যের প্রতি মায়ামমতা, ধার্মিকতা, পরোপকারিতা আমাদের ঐ অঞ্চলের প্রবাদের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল।" এরপর জানা গেল আয়েনকেও আসামী করা হয়েছে। তাঁর জামিনের প্রশ্ন এলে উকিল বলেছিল– "আমার বিশ্বাস ফুলের মতো চেহারার এই ছাত্রটির সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে তার জামিন মঞ্জুর করা হবে।" জামিন মঞ্জুর হয়নি।

আয়েন উদ-দীনকে জেলে নেয়া হলো। এ পর্যায়ে জেলের বিবরণ ও নানা গল্পকাহিনীর অবতারণা করেছেন। গল্পের ভিতর গল্প। মাঝে মাঝে বর্ণিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন সাহসী কার্যকলাপ। এক সময় তিনি জামিন পেলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন মা মারা গেছেন। ৪০ থেকে ১৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসব কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। ১৭৩ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে ধর্ম নিয়ে আলোচনা। যেমন, "ধর্মের প্রতি অনীহা আজকের যুব সমাজের একটা স্বাভাবিক রীতি।" কথাটা সত্য। "ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা, প্রগতিশীলতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা" সমাজের এক বিরাট সমস্যা।

এই যে সোয়া শ' পৃষ্ঠার কাহিনী-এর নির্যাস কী? নির্যাসটি হলো তিনি যুক্তফ্রন্টের হয়ে কাজ করেছিলেন দেখে তাঁকে হত্যা মামলায় জড়ানো হয় এবং তিনি জেল খাটেন। যুক্তফ্রন্টের হয়ে যারা লড়াই করেছে তাদের অনেককেই তো জীবনে নিগ্রহ সইতে হয়েছে, যেমন, শেখ মুজিব। এ রকম একটা ধারণা তিনি তৈরি করতে চান পাঠকের মনে। সুতরাং তাঁকে রাজাকার বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? এরই সঙ্গে শেষে যোগ করে দেন রাজাকারিত্বের মূল কথা। ধর্ম নিরপেক্ষতার মানে ধর্মহীনতা। উল্লেখ্য ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আদর্শ। প্রগতিশীলতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু রক্ষণশীলতা (অর্থাৎ রাজাকারি আদর্শ) মানে শান্তি। এই কথাটুকুই তিনি আসলে পৌঁছে দিতে চান পাঠকের কাছে।

কিন্তু, তার খুনের মামলার কী হলো? এর বিস্তারিত বিবরণ আর আমরা পাইনি। মামলা থেকে ছাড়া পান এটি আমরা জানি। কিন্তু অকথিত থেকে যায় অনেক কিছু। সে সব অকথিত বিষয়ের আমরা সন্ধান পাই অন্য সূত্র থেকে।

গণতদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুস সোবহান। তিনি সামান্য আলোকপাত করেছিলেন এ বিষয়টির ওপর। বলেছিলেন তিনি—"আয়েন উদ-দীন (খুব সম্ভব তখন সে সবেমাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে) আমার বাবা আব্দুস সালামকে খুন করে। সেই হত্যা মামলায় আয়েন উদ-দীন এক অথবা দুই নম্বর আসামী ছিল এবং জেলেও ছিল। কিন্তু জুরীদের মধ্যে দু'জন মুসলিম লীগের সমর্থক ও মাদ্রাসার শিক্ষক থাকায় আয়েন উদ-দীন ছাড়া পায়।" এ জন্যই বোধহয় সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রবাদের, যে, কচুগাছ কাটতে কাটতেই মানুষ ডাকাত হয়। রাজাকারি শিক্ষাটাও ছেলেবেলা থেকে শুরু হয়।

## ২৫

আয়েন উদ-দীনের আত্মজীবনী থেকে আমি সুদীর্ঘ দু'পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি দেব। কথোপকথনের ভঙ্গিতে এখানে তিনি তুলে ধরেছেন শান্তি কমিটির কেন দরকার ছিল। শান্তি কমিটি না থাকলে কত ক্ষতি হতো। এভাবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, আয়েন উদ-দীন ছিলেন রাজশাহী জেলা শান্তি কমিটির সভাপতি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া উচিত নয়। দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাকের মাঝে

হঠাৎ এ দুই পৃষ্ঠা 'বর্তমান'। ফলে, নানা ঘটনার বর্ণনায় এটা মিশে যায়, আলাদা কোন বিষয় হয়ে ওঠে না। পাঠকের মনে বরং এ ধারণা গড়ে উঠতে পারে যে, শান্তি কমিটি করা হয়েছিল তো কী হয়েছিল? শান্তি কমিটির সদস্যরা তো অনেককে পাকিদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে বিষয়টি ভুলে গেলে তো চলবে না আমাদের। সে জন্য এই দুই পৃষ্ঠা আলাদাভাবে পড়া উচিত। এতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, রাজাকার কখনও অনুতপ্ত হয় না তার কৃতকর্মের জন্য এবং সবসময় সে তার রাজাকারির মূল কথা কোন না কোনভাবে ছড়িয়ে দিতে চাইবেই।

আয়েন উদ-দীন লিখেছেন–

এমন সময় রথীন বাবু বললেন, "হানাদার বাহিনীর লাল চক্ষুকে উপেক্ষা করে, আপনি যে শান্তি কমিটির বাইরে ছিলেন এ জন্য আপনার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ ও বাঙালীর প্রতি আপনার যে প্রীতি মমত্ববোধ তা যদি সকলের মধ্যে থাকতো তাহলে, আমরা আরও সহজেই জারজ পাঞ্জাবীদের নির্বংশ করতে পারতাম।"

"শান্তি কমিটি না থাকলে কত তাড়াতাড়ি তোমরা দেশ স্বাধীন করতে পারতে তা জানি না রথীন তবে একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, সামরিক বাহিনীর নির্দেশ মেনে শান্তি কমিটি গঠন না করলে তোমরা যে সাড়ে ছয় কোটি লোক এখানে ফেলে গিয়েছিলে তাদের অনেককেই খুঁজে পেতে না, যে সমস্ত শহর বন্দর আজও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মচঞ্চল হয়ে আছে তাদের চিহ্নও থাকতো না" প্রত্যয় নিয়ে বললেন হাসেম সাহেব।

–"শান্তি কমিটি গঠন করেও কি দালালেরা পেরেছে বাংলার মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে, মায়ের, বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে, আমাদের সম্পদ বাঁচাতে।"

অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলেন রথীন বাবু। রথীন বাবুর স্বরে যে উষ্মা প্রকাশ পেয়েছিল তার অর্থ এতই সহজ যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে শান্তি কমিটির পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য পেশ করে গৃহস্বামী কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন বলে আমার মনে হলো। কী করে তাঁকে এই আলোচনা থেকে বিরত করা যায় সেই কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আবার মুখ খুললেন তিনি। বেশ দৃঢ়তার সাথে বললেন "শান্তি কমিটি গঠন করার পরেও কিছু দুষ্কৃতকারী ও শয়তানের প্রভাবে অনেক নিরপরাধ বাঙালী ভাই জীবন হারিয়েছেন সত্য, অনেক সতী সাধ্বী নারী হারিয়েছেন সতিত্ব, লুণ্ঠিত হয়েছে অনেক নিরপরাধ মানুষের সম্পদ। কিন্তু একথা তার চাইতেও বেশি সত্য যে, যদি সেই চরম দুর্দিনে, যখন তোমরা দেশবাসীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গেলে, যদি সামরিক জান্তার কথা না শোনা হতো তাহলে

কমপক্ষে দশ গুণ লোক মরত, বিশগুণ নারী নির্যাতিত হতো ও এক শ' গুণ সম্পদ লুণ্ঠিত হতো। দেখ রথীন অপরাধীর অপরাধের পরিমাপ করতে হলে কোন্ পরিবেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, অপরাধী সেই অপরাধ না করে জীবন বাঁচাতে পারতো কিনা, যে ব্যক্তিকে অপরাধী বলে গণ্য করা হচ্ছে সে উপস্থিত না থাকলে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তার চাইতে অনেক কম কিংবা বেশি অপরাধ সংঘটিত হতে পারতো কিনা, এগুলি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করে তবেই একজনের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া উচিত"। একটানা কথাগুলো বলে থামলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য যদিও অকাট্য যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তবুও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ষোড়শ বাহিনীর বন্ধনহীন মানসিকতা ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। মনে হলো, এখনই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। তিনি বললেন "যে অপূর্ব ত্যাগ তিতিক্ষা, যে রক্তক্ষয়, যে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তোমরা দেশ স্বাধীন করেছ তা ভুলবার নয়। ভাবীকালের স্বাধীনতাকামী বিশ্ব মানুষের জন্য তোমরা হলে আদর্শ দৃষ্টান্ত। অনাগত কালের মুক্তিকামী মানুষেরা তোমাদের আদর্শ অনুসরণ করে ছিঁড়ে ফেলবে পরাধীনতার লৌহ শৃঙ্খল একথা ভাবতেও বাঙালী হিসাবে, গর্বানুভব হয় আমার মনে। আমার আবেদন, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের কামনা নিয়ে আদম সন্তানকে হত্যা করো না তোমরা। পরাজিত শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, মোজাহিদ, আলবদর ও আল শামসের পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন করো না, তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করে দিও না। তাতে স্বাধীনতার অমর্যাদা হবে। "আপনি কি বলতে চাইছেন, বুঝলাম না কাকাবাবু"– প্রতিবাদের সুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো রথীন বাবুর কণ্ঠস্বরে, বললেন "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বেইমানী করে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আয়েন উদ-দীন যে অপরাধ করেছিলেন সে জন্য ঝলমলিয়ার ক্রুদ্ধ জনতা তাঁকে হত্যা করে তাঁর মাথা নিয়ে ফুটবল খেলেছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা পৈশাচিক হলেও মীরজাফরদের জন্য এটাই একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি। এখন আপনি যদি একথা মনে করেন যে, এ জাতীয় ঘটনা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর কলঙ্ক লেপন করবে, তাহলে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই"। রথীন বাবুর কথায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জীবিত আছি কিনা অতি সন্তর্পণে হাত পা নেড়ে পরীক্ষা করছিলাম। আমার মাথা কেটে নিয়ে কেউ ফুটবল খেলছে একথা চিন্তা করতেই আমি শিউরে উঠেছিলাম। আবার কথা বললেন হাসেম সাহেব, "শুধু মনে করা নয় রথীন আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, বিরাট আত্মত্যাগ ও বিপুল সংগ্রাম করে তোমরা যে গৌরবের প্রাসাদ গড়ে তুলেছ, এ জাতীয় ঘটনার অপকীর্তিতে সে প্রাসাদের

বিলুপ্তি ঘটবে– স্বল্প সময়ে সে স্থানে জন্ম নেবে অপযশ। দোয়া করি, জাতির জীবনে সে দুর্ভাগা দিন যেন না আসে। তবে আমাদের ভুলের জন্য একান্তই যদি সেদিন আসে তবে আজ যে নিষ্পাপ জনতা তাদের প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূর্য সৈনিকদের– খোশ আমদেদ জানাচ্ছে তারাই তোমাদের বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিয়ে, হয় সমূলে শেষ করে দেবে, নইলে ঝেঁটিয়ে দেশের মাটি থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবে।"

"আপনি যাই বলুন কাকাবাবু", বললেন রথীন বাবু, "স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করতেই হবে। স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।"

"খুবই সত্য কথা", বলে উঠলেন হাসেম সাহেব, "তবে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কে বা কারা এবং দেশের যথার্থ শত্রুর আসল পরিচয় কি তা নির্ধারণ করে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।"

"বিপ্লবোত্তর সময়ে সব দেশেই এটা হয়ে থাকে। ফরাসী বিপ্লবের পরে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে, তাই বলে বিপ্লবের ধারা ব্যাহত হয়নি" কিছুটা উত্তপ্ত স্বরে জবাব দিলেন রথীন বাবু।

হেসে উঠলেন গৃহস্বামী। একটা কাশি দিয়ে, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন ঃ "ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাস জ্ঞানের অভাব জাতীয় জীবনে টেনে আনে দুর্ভোগ।" কথা কয়টা বলে, কিছুটা বিরতি দিয়ে, মন্টুকে ডেকে আর এক কাপ করে চা সবাইকে দিতে আদেশ দিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমার মনে পড়ল। বিপ্লবোত্তর ফরাসীতে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের নির্মম হত্যার কাহিনী অসত্য নয়, তবে তার ফলে ফরাসী বিপ্লবের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়নি একথা মিথ্যা।"

সুতরাং বিষয়টা কি দাঁড়াল? শান্তি কমিটি মানুষজনকে রক্ষা করেছে। স্বাধীনতা বিরোধী কে?– এ নিয়েও বিতর্ক আছে। সেটার নিষ্পত্তি না হলে কাউকে শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। ফরাসী বিপ্লবের পর অনেক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা– "ইতিহাসের বিকৃতি, ইতিহাস জ্ঞানের অভাব জাতীয় জীবনে টেনে আনে দুর্ভোগ।" অর্থাৎ রাজাকারদের বিরুদ্ধে যা লেখা হচ্ছে তা হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতি। তবে, আয়েন উদ্-দীনের একটি কথা ঠিক। ইতিহাস জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ হেনস্থা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। আর রাজাকাররা ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে, নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে।

আয়েন উদ-দীনের ফরাসী ইতিহাসের কাহিনীর বর্ণনা শেষ হয় ১৮৫ পৃষ্ঠায়। সেখানেই পেয়ে যাই তাবত বর্ণনার সারমর্ম। বা যেই অনুচ্ছেদটি লেখার জন্য ব্যয় করেছেন প্রচুর পৃষ্ঠা। আমি এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

হাসেম বলছিলেন রথীনকে—

"একটা কথা, পরাজিত দুষমনকে যতদূর পারবে ক্ষমা করবারই চেষ্টা করো। বাংলাদেশের পুনর্গঠনের পথে আত্মনিয়োগ কর। হিংসাত্মক পথে তা হবে না।" আমার স্মরণ হলো ইতিহাসের কথা। বিশ্বে মহৎ ব্যক্তিরা কোনদিনই পরাজিত শত্রু, আশ্রয়প্রার্থী অথবা বন্দীদের হত্যা করেনি। ধরেনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র, এমনকি তাদের সাথে অসদ্ব্যবহারও করেনি।"

বাঙালি আয়েন উদ-দীনদের এ থিসিস মেনে নিয়েছিল। এবং আজ তার কাফফারা শুধতে হচ্ছে আমাদের।

## ২৬

আয়েন উদ-দীনের আশ্রয়দাতা হাসেম আসলে কে? আয়েন প্রথমে এর পরিচয় দেননি। ১৯৫ পৃষ্ঠায় এসে সে পরিচয় পাওয়া যায়। মুক্তিবাহিনী ঘেরাও করে হাসেমের বাড়ি। তিনি জানতে চান কী তাঁর অপরাধ? অপরাধ হলো, জানান একজন মুক্তিযোদ্ধা, "প্রথম অপরাধ হলো, আপনার ছোট ছেলে হানাদার বাহিনী নাটোরে আসার পর তাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে এবং অনেক বাঙালীর ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে এবং অগ্নি সংযোগ করেছে। দ্বিতীয় অপরাধ হলো, আপনারা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শত্রু নাসের মাহমুদের লুটপাটের সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন এবং তাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। শেষ এবং তৃতীয় অপরাধ হলো কিছুক্ষণ আগে অন্যায়ভাবে মুক্তিবাহিনীর লোকদের অপমান করেছেন।"

মূল কাহিনী হলো, রহিম চায় তাদের বাড়ি থেকে আয়েন উদ-দীন চলে যাক। এদিকে মুক্তিবাহিনী খবর পেয়ে গেছে হাসেমের বাসায় আছে লুটের মালামাল। সুতরাং তারা তাদের বাড়ি সার্চ করতে চাচ্ছে। আয়েন উদ-দীন অবশ্য এসব 'ষোড়শ বাহিনী'র কার্যকলাপ বলে উল্লেখ করছেন। হাসেম তাঁর পুত্রকে জানায়, শান্তি কমিটির লোকদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পাক বাহিনী, রহিমকে হত্যা করতে চেয়েছিল। নাসের মাহমুদ তখন রহিমকে বাঁচায় এবং হানাদার বাহিনীর মেজরের কাছে নিয়ে যায়। এভাবে আমরা জানতে পারি শান্তি কমিটিও কত উপকারী ছিল। তবে, এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, মানবিকতা নয়, হাসেম আয়েনকে আশ্রয় দিয়েছিল সে নিজে রাজাকার বলে বা রাজাকারের মতাদর্শে বিশ্বাস করে বলে। রাজাকারের

মন বোঝার জন্য এ দু'টি পৃষ্ঠাও মূল্যবান। তাই দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আমি তা উদ্ধৃত করছি—

"১৬ই ডিসেম্বরের পরে পরেই তার রূপ হয়েছিল ভয়ংকর– তার অনেক অপকীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা শহরে। নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ছাড়াও রাজাকার শান্তি কমিটির পরিবারবর্গের সাবালিকা নাবালিকা নারীদের প্রতি তার লোমহর্ষক অত্যাচারের বিবরণ ভারতের অত্যাচারী বর্গীদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছিল।

খোন্দকার পরিবারের সাথে কাজী পরিবারের বিরোধ দীর্ঘদিনের। কারণ সম্পত্তি। খোন্দকার সাহেব অনেকবার চেয়েছেন বিরোধের অবসান কিন্তু জানুর একগুঁয়েমির জন্য সম্ভব হয়নি। একান্ত অনাহূতভাবে সে বাড়ির উপর চড়াও হয়ে এমন ব্যবহার করবে তা খোন্দকার সাহেবের কাছে অপ্রত্যাশিত না হলেও, ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। কাজীর অশালীন ব্যবহারে গুমরে গুমরে ফুলছিলেন তিনি, এমন সময় বাড়ি ফিরলেন তাঁর পুত্র। বাড়িতে ঢুকে অনেক সুটকেস বাকস ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকতে দেখে বোধহয় তাঁর মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তাই বেশ অসহিষ্ণু স্বরে আব্বাকে সম্বোধন করে বললেন "তখনই বলেছিলাম যে এসব ঝামেলা বাড়িতে রেখে কাজ নেই কিন্তু তবু আপনি আমার কথা শুনলেন না। এখন ঠ্যালা সামলান।" ছেলের অভদ্র মন্তব্যে একেবারে জ্বলে উঠলেন হাসেম সাহেব। প্রায় চিৎকার করে বললেন "দূর হয়ে যা বেয়াদব আমার সামনে থেকে। অকৃতজ্ঞ কোথাকার।" তারপর একটু থেমে বললেন : "যেদিন পাক বাহিনী নাটোরে প্রবেশ করে তোমার বুকের উপর সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরে, তোমাকে জাহান্নামে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিল সেদিন নাসের মাহমুদ নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমাকে রক্ষা করেছিল, তার আমানতকে ঝামেলা বলতে তোমার এতটুকু লজ্জা করলো না?"

চুপ করে রইলেন পুত্র। ঘটনা সম্যক অবগত হবার জন্য ঔৎসুক্য দেখা দিল আমার মাঝে। কাউকে ডাকবো কিনা ভাবছি এমন সময় গৃহকর্তা ঘরে প্রবেশ করে আমার চৌকিতে বসে টেবিলস্থিত খানার প্রতি নজর দিয়ে বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "খানা খাননি?" জবাব না দিয়ে, সলজ্জ হেসে, খানা খেতে শুরু করলাম। ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিল তাঁর চোখে মুখে।

খাচ্ছিলাম। হাসেম সাহেব বললেন : "জনাব, যে লোকের কৃতজ্ঞতাবোধ নেই তার মনুষত্ব নেই। আর মনুষত্বহীন মানুষ পশুর চেয়েও হীন। তার ভবিষ্যত অন্ধকার।" প্রতিউত্তর দেবার প্রয়োজনও ছিল না উপায়ও ছিল না। তাই নীরবে খাচ্ছিলাম আমি। তিনি বললেন "আয়েন সাহেব, বিশ্বাস করুন

আর নাই করুন অকৃতজ্ঞতাই আমাদের অধঃপতনের কারণ। যে ইসলাম অকৃতজ্ঞতাকে পাপ বলে ঘোষণা করলো সেই ইসলামের অনুসারী হয়েও আমরা কত বড় অকৃতজ্ঞ হয়েছি চিন্তা করতে পারেন", বলে চললেন তিনি। "১২ই এপ্রিল সকালে পাক বাহিনী যখন নাটোরে প্রবেশ করলো তখন সমস্ত আওয়ামী লীগাররা– মায়, এস,ডি, ও ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী শহর ছেড়ে চলে গেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে নিরপরাধ বিহারী মুসলমানদের লাশ। অনেক দুষ্কৃতকারীর সাথে হত্যা করা হয়েছে বহু অবাঙালীকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধের কারণে। এমনকি রাজনীতির সাথে কোন প্রকারেই সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রায় ত্রিশজন বিহারী কুলিকে ষ্টেশন থেকে নিরাপত্তার নামে নাটোর জেলহাজতে নেবার পথে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ ফেলে রেখেছে রাস্তার ধারে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। অনেক মৃত দেহের হাত নেই, কারো বা পা নেই, কারো ধড় থেকে মাথা করা হয়েছে বিচ্ছিন্ন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অধিকাংশই উলঙ্গ– তাদের মৃতদেহ যেন তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যাঙ্গোক্তি। এমনি পরিবেশে নাটোরে প্রবেশ করলো পাক বাহিনী। শহরের অবস্থা দর্শনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। সে এক চরম দুঃসময়। পাক বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে সত্য বক্তব্য পেশ করে, কিংবা তাদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে, এমন একটি লোক নেই সারা নাটোর শহরে। ফলে বেশ কিছু অঘটন ঘটলো। অপমৃত্যুর শিকার হলো অনেক বাঙালী মুসলমান। যাঁরা পাক-বাহিনীর আগমনকে খোশআমদেদ জানিয়েছিলেন তাঁদেরও অনেকে হয় মারা গেলেন অথবা অত্যাচারিত হলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো বাঙালী মাত্রেই। যারা ইসলাম পন্থীর দাবিতে শহরে রয়ে গিয়েছিল তারাও পালাতে শুরু করলো পল্লীর অভ্যন্তরে। ঠিক এমনি সময়ে রহিম পালাচ্ছিলো গ্রামের দিকে। কিন্তু ধরা পড়ল পাক বাহিনীর হাতে। ঘটনাস্থলেই জীবন শেষ হবার কথা কিন্তু ভাগ্যবলে তাকে পাক বাহিনী নিয়ে এলো নাটোর ক্যাম্পে। এই দুঃসংবাদ যখন আমার কাছে পৌছলো তখন কি করা যায় চিন্তা করতে গিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় বাড়িতে হাজির হলো নাসের মাহমুদ। মনে হলো সাহায্যের জন্য বেহেশত থেকে নেমে এলেন রহমতের ফেরেশতা। আমার কথা শুনে কালবিলম্ব না করে, আমাকে নিয়ে হাজির হলেন পাক বাহিনীর ক্যাম্পে।

"কিছু দিন লুকিয়ে থেকে সেদিনই" বলে চললেন তিনি, "নাসের মাহমুদ পল্লীর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে শহরে এসেছিলেন। তাঁর শুকনো চোখ মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা ছিল না যে তাঁর তখনও খাওয়া হয়নি। তাই তাঁকে কিছু খাবারের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি সোজা সামরিক বাহিনী ক্যাম্পে হাজির হয়ে আমাকে সহ দেখা করলেন জনৈক মেজর সাহেবের সঙ্গে।

রহিম নিরপরাধ বলে আবেদন করলেন তাঁর মুক্তির। মেজরকে জানালেন আমার পরিচয়। কিন্তু বিপরীত কাণ্ড ঘটলো। গর্জে উঠলেন মেজর– "কাঁহা থা, তোমহারা মুসলিম লীগ কা বাচ্চা জিস ওয়াকত নাটোরমে বেকসুর বিহারীকো মারা? ইয়ে মুসলিম লীগার নেহী হ্যায়, ইয়ে জালেম– ইন সবকো হাম জাহান্নাম মে ভেজেঙ্গে", মেজরের দুর্ব্যবহারে আমার বৃদ্ধ শরীরেও উত্তাপ অনুভব করলাম কিন্তু জবাব দিলাম না। মনে হলো, সত্যি তো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম যেদিন নাটোরে দীর্ঘদিন যাবত কার্যরত নিরীহ ও দরিদ্র কুলিদের শুধুমাত্র অবাঙালী হবার অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল। তাই আমার মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি। কিন্তু নাসের মাহমুদ চুপ করে থাকেননি। তিনি বিনয়ের সাথে মেজরের প্রতিটি যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। শেষে মেজরকে বোঝাতে না পেরে দেখা করেছেন ব্রিগেডিয়ার নিয়াজীর সাথে। চমৎকার উর্দুতে তাঁকে সমগ্র পরিস্থিতি বুঝিয়ে মুক্ত করেছেন রহিমকে। তাছাড়া সেদিন থেকেই নাটোরের প্রতিটি বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবায় তিনি গেছেন এগিয়ে। সেই লোকটি গত ১৬ই ডিসেম্বরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যখন আমার কাছে এসে জানালেন যে, তিনি আমার কাছে তাঁর কিছু মালামাল আমানত রাখতে চান তখন কি করে বলবো যে পারবো না। পারতেন আপনি ঐ অবস্থায় একজন মহান মানুষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে?"

বোঝা যাচ্ছে, পাক বাহিনীর সহযোগি খুনী হচ্ছে 'মহান মানুষ'।

## ২৭

লুটের মালামাল উদ্ধারের পর মুক্তিবাহিনী চলে গেছে। হাসেম ক্লান্ত। আয়েন-উদ-দীন আতঙ্কিত।

রাজাকার-আলবদরদের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনী খোঁজ করছে। এ সময় মুক্তিবাহিনী কর্তৃক রাজাকারদের দণ্ড দেয়ার কাহিনী আছে। লক্ষ করবেন যে, এ ভাষ্য আবার হাসেম বা আয়েনের নয়। এ ভাষ্য রহিমের মুখ থেকে দেয়া হয়েছে। রাজাকারদের প্রতি যার তেমন সমবেদনা নেই। রহিম বলে হাসেমকে "শুধু মারা নয় আব্বা সে এক নির্মম কাণ্ড।" এ কাহিনী কতটুকু সত্য জানা যাবে না। কিন্তু এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা যে কত নিষ্ঠুর তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর সঙ্গে যদি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও চিত্রাবলী সংযুক্ত করা যেত তা হলে এ বর্ণনা গুরুত্ব পেত না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই রাজাকারের কাহিনীতে তা না হওয়ার কথা। আয়েন-

উদ-দীনের সে বর্ণনা আমি এখানে উল্লেখ করছি না। উল্লেখ করছি তার প্রতিক্রিয়া–

"তন্ময় হয়ে শুনছিলাম হৃদয়বিদারক ঘটনা। ভুলে গিয়েছিলাম নিজের অস্তিত্ব। হঠাৎ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে চোখ তুলে চাইতেই দেখলাম হাসেম সাহেবের চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর ধারা। ফিরিয়ে নিলাম চোখ। আবার কথা বললেন রহিম সাহেব, 'শুধু পিপরুলেই নয়, আব্বু আজ দুপুরে তেবাড়িয়াতেই আরও লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। শান্তি কমিটির সদস্যকে খুঁজে না পেয়ে মুক্তিবাহিনী তার নিরপরাধ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে নির্মমভাবে হত্যা করে আগুন দিয়ে তার সমস্ত ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।' 'চুপ করো রহিম চুপ করো, আমি আর এসব কথা শুনতে চাই না,' আর্তকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন অসুস্থ হাসেম সাহেব। চুপ করলেন রহিম সাহেব। ঘরে নেমে এলো পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। আমার পরিবারের কথা চিন্তা করতেই সমস্ত দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল।"

তারপর আবার ১৮ ডিসেম্বরের ফ্ল্যাশব্যাক। কীভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন হানাদার বাহিনীর আশ্রয়স্থল নাটোর ওয়াপদা কোয়ার্টার্সে। একবার আত্মসমর্পণের কথাও মনে হয়েছিল। যাক, সকালে রহিমকে পাঠান হলো, পরিস্থিতি জানতে। আর হাসেম জানালেন, "জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের যে ঘটা লক্ষ্য করছি তাতে সত্যি উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। যে বিষয়টিকে এতদিন অমূলক আশঙ্কা বলে মনে করছি, মনে হচ্ছে তাই সত্য হতে যাচ্ছে।" জাতির ভাগ্যাকাশে কী সেই দুর্যোগ? তার বিবরণ নেই। মনে হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশ দখল ও রাজাকার নিধনই হলো জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ। এই দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে অন্যান্য কাহিনী।

## ২৮

আয়েন উদ-দীনের কাহিনীর ২১৪–৩৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু এ রকম– হানাদার পাকি বাহিনীর সদস্যদের কত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে– মুসলমান হয়ে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার! বিহারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে। সেই কংগ্রেসী আমল থেকে বিহারীদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমানরা সব সময় নিগৃহীত হচ্ছে সুতরাং মুসলমানদের বিভেদ কাকে আনন্দ দেবে? আনন্দ

দেবে হিন্দু ভারতকে। এই মূল থিসিসটি বর্ণিত হয়েছে তার কলেজ জীবন, বিবাহ, নেপোলিয়ন, নিক্সন, রাসেল প্রমুখের নানাবিধ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে– সেই পুরনো কৌশলে। দেড় শ' পৃষ্ঠার অবান্তর কাহিনীই সৃষ্টি করা হয়েছে এই থিসিস সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য। এখানেও আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, আলাদাভাবে সেসব ঘটনা বিচার করতে, না হলে রাজাকারের মন সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে না। বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে কাহিনীর বর্ণনায়, শব্দের প্রয়োগের দিকে। আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি–

১। পাকি মেজর আসলাম মার্চ মাসে তার বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। পথে আশ্রয় পেলেন মালিক আব্দুল্লাহ নামে নব্বই বছরের এক বৃদ্ধের গৃহে। আবদুল্লাহ আওয়ামী লীগের জয়লাভে খুশি হলেও, "ইদানীং নানা দুঃসংবাদ শুনে ব্যথায় ভরে গেছে তার মন। বিশেষ করে মুসলমান হয়ে মুসলমানের রক্তপাতের অশ্রুতপূর্ব কাহিনী তাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।" মেজরকে তিনি আশ্রয় দেন। কিন্তু তার পুরো পরিবার এর বিরুদ্ধে। মেজর ধরা পড়ে। "প্রকাশ্য দিবালোকে নিরস্ত্র ও নিঃসহায় মুসলমানের অপমৃত্যুর সংবাদ দারুণ আঘাত হানে বৃদ্ধ আব্দুল্লাহ প্রামাণিকের হৃদয়ে। শোকাভিভূত হয়ে শয্যা নেন এবং মুসলমানদের অধঃপতনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। যাদের পূর্বপুরুষেরা ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী চরম শত্রুকেও আত্মসমর্পণের পর ক্ষমা করছেন– দিয়েছেন বন্দীর যথাযোগ্য মর্যাদা, যে জাতি কোন দিন কোন অপরাধে মুসলমান তো দূরের কথা কোন বিজাতীয় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুর করেনি কণামাত্র অসম্মান সেই জাতির এই কলঙ্কময় পরিণতিতে পাগল হয়ে উঠলেন প্রামাণিক।" এবং তারপর এই শোকে মারা যান প্রামাণিক। তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি নাটকীয় ভাষণ দেন। এ ভাষণে রাজাকারি থিসিসের রূপরেখাটি পাওয়া যায়। তাই এখানে তা উদ্ধৃত করছি–

"জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে এর বেশি বলবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু আমি এক মহাদুর্যোগের পরিষ্কার আভাস দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও প্রাণভিক্ষাকারী মানুষের উষ্ণ রক্তে তোমরা যে রক্তস্নান করলে তার প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ, মারাত্মক। সেদিন না আসুক সেই মোনাজাত করি। কিন্তু যদি আসে, আর যে যাই করুক, তোমরা অবশ্য তা থেকে দূরে থেকো। শত্রু যত বড়ই হোক ক্ষমাপ্রার্থী হলে, ক্ষমা কর। দুশমন যত অপরাধই করুক, আত্মসমর্পণ করলে বন্দীর যথাযোগ্য মর্যাদা দিও। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে অসম্মান করো না– সম্ভাব্য সব রকম সম্মান দান করো। ভুলে যেও না তোমাদের গর্বের বাদশাহ শেরশাহ, দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যত নির্মম ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকুন না কেন, হুমায়ুন পত্নীকে মায়ের সম্মান দান

করেছিলেন। নিজে উদ্যোগী হয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে বন্দিনীকে প্রেরণ করেছিলেন স্বামীর কাছে।"

পিতার বক্তব্য শুনে, তাঁর মর্মব্যথার কারণ উপলব্ধি করে সন্তানেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন– কাতর কণ্ঠে চেয়েছিলেন ক্ষমা। নাতি-নাতনিরাও দাদুর প্রতি অসম্মানের পরিণতির কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে আনন্দানুভব করেছিলেন বৃদ্ধ। প্রাণভরে তাদের সুখী ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করে বলেছিলেন, "তোমরা ভেব না, আমি তাদের ক্ষমা করতে বলছি যারা কায়েদে আজমের সাধের পাকিস্তানকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছে– আমি তোমাদের আমরণ সংগ্রাম করতে অনুরোধ করব ঐসব জালেম, অত্যাচারী, লম্পট, দায়িত্বজ্ঞানহীন মুষ্টিমেয় নেতা-উপনেতাদের বিরুদ্ধে, যারা দেশসেবার নামে লক্ষ কোটি দরিদ্র জনতাকে নির্মম ও নির্দয়ভাবে শোষণ করেছে, যারা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, যারা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ক্রীড়নক হিসাবে অগণিত জনতার সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে, যারা ইসলামের নামে মুসলমানদের সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সর্বোপরি যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে জাতিকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়েছে।

"আমার শেষ অনুরোধ" বলেছিলেন প্রামাণিক, "তোমরা জেহাদ করো অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে– তা সে শাসক এখানকার হোক– কিংবা করাচী-লাহোর-পিন্ডি-ইসলামাবাদের হোক। তোমরা কোন প্রকারেই অগণিত শোষিত মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করো না– বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী, পাঠানীর জিগির তুলে নিজেদের একতায় ফাটল ধরাতে দিও না। মনে রেখ, নিজের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে তোমরা পাঞ্জাবী শোষকের প্রভাবমুক্ত হতে পারলেও বিভেদের ফলে যখন দুর্বল হয়ে পড়বে তখন অন্য শক্তিশালী শাসক তোমাদের ঘাড়ে চাপবে এবং যে শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সংগ্রাম করছো তার চাইতেও তারা বেশি শোষণ করবে।"

২. দ্বিতীয় কাহিনী মেজর আসলামের অধীনস্থ দুই জোয়ানের। এ কাহিনীতে বাংলা সিনেমার নানা উপাদান আছে। ফ্যান্টাসি, বাঘের খেলা, বীরত্ব, ট্র্যাজেডি। কাহিনীটি পুরো আয়েন-উদ-দীনের ভাষ্যেই উদ্ধৃত করব।

জোয়ান দুইজন রেল-লাইন ধরে এগোচ্ছিল। "এই লাইন ধরেই এসেছিল পাক বাহিনীর লক্ষ্যহীন সেই জোয়ান দু'জন গোপালপুর থেকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছাড়াও দীর্ঘপথ অতিক্রমের ক্লান্তি এবং সর্বোপরি দিনের আলো তাদের

বোধহয় বাধ্য করেছিল নির্জন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণে। জংলী গ্রামের বিস্তীর্ণ জংগল বোধহয় মনে হয়েছিল নিরাপদ স্থান। তাই তারা জংলী গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে, রেল-লাইনের পশ্চিমে অবস্থিত জংগলে নিয়েছিল আশ্রয়। গভীর জংগলের ভিতরে প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে। বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা দেখে তারা শুয়ে পড়েছিল। ক্লান্তিজনিত কারণে ঘুমও এসেছিল উভয়েরই। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভাঙতেই তারা লক্ষ্য করল যে প্রকাণ্ড একটা চিতাবাঘ এক টুকরো বাঁশ নিয়ে খেলা করতে করতে বটগাছের দিকে এগিয়ে আসছে। অনভ্যস্ত চোখে বাঘের অদ্ভুত খেলা দেখে তারা রীতিমতো অবাক হলো– তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে, বাঘ পা দিয়ে বাঁশের টুকরাটাকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করছে। তারপর সেটা মাটিতে পড়বার আগেই দৌড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে ধরে নিচ্ছে।

গভীর আগ্রহভরে জোয়ানেরা দেখছিল বাঘের খেলা। বাঘ তখনও আর্মীদের অবস্থান সম্পর্কে ছিল না অবহিত। সে ক্রমাগত এগিয়ে আসছিল বটগাছের দিকে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো আর্মী জোয়ানদের। থেমে গেল তার খেলা– জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাইল তাদের পানে। সিপাহীরা অস্ত্র বাগিয়ে চকিতে নিজেদের প্রস্তুত করে নিল। মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে বাঘ ও জোয়ানরা চেয়ে রইলো পরস্পরের দিকে। তারপর হঠাৎ এক বিকট চিৎকার করে বাঘ জোয়ানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য উদ্যত হতেই ট্রিগার চাপলো জোয়ানেরা। নিমিষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বাঘ, স্তব্ধ হলো তার আওয়াজ, রুদ্ধ হলো তার গতি। কিন্তু চাইনিজ স্টেনের ব্রাশ ফায়ারের প্রচণ্ড শব্দ গভীর অরণ্যের স্তব্ধতা ভেদ করে চলে গেল বহুদূরে, হতচকিত করে তুললো জংলী ও তার আশপাশের গ্রামের অধিবাসীদের।

বেলা তখন দশটার কাছাকাছি। জংলী ও আশপাশের লোকেরা জমায়েত হলো যেখান থেকে বিকট শব্দ ভেসে এসেছিল সেই অরণ্যের কাছে। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সাধ্যমতো লাঠি-সোটা, সড়কি, বল্লম, দা নিয়ে হাজির হলেও ইতস্তত করছিল জংগলে প্রবেশ করতে। এমন সময় জংগলের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলো কয়েকজন যুবক, যারা গভীর অরণ্যে, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে উৎপন্ন মূল্যবান পিপার ফল আহরণের জন্য প্রবেশ করেছিল।

পরিচিত যুবকদের দেখে দৌড়ে এলো গ্রামবাসীরা– জানতে চাইলো বিকট আওয়াজের কারণ। তারা বিবৃত করলো পূর্ণ ঘটনা। জানালো যে, তারা যখন গভীর অরণ্যে পিপার ফল তুলতে ব্যস্ত সেই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করে একটা বাঘ। ভয়ে তারা সাত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিকটস্থ একটা বড় নিমগাছে। তারপর লক্ষ্য করতে থাকে বাঘের গতিবিধি।

বাঘ এগিয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম-উত্তর দিকে। যুবকদের দৃষ্টি ছিল বাঘের ওপর নিবদ্ধ। হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলো উত্তর-পশ্চিমে, বটগাছের তলে সঙ্গীন উঁচিয়ে বসে আছে দু'জন জোয়ান। স্তম্ভিত হলো তারা। ভেবে পেল না কি করে এই জংগলে এলো তারা। আরও ভীত হয়ে উঠলো যুবকেরা। জোয়ানদের হাতে বাঘ মারা পড়বার অনেকক্ষণ পর অতি সন্তর্পণে গাছ থেকে নেমে তারা প্রাণের ভয়ে সব কিছু ছেড়ে আস্তে আস্তে পালিয়ে এসেছে। তাদের বিশ্বাস অনেক খান সেনা লুক্কায়িত আছে জংলী গ্রামের এই জংগলে।

যুবকদের বক্তব্য শুনে হৈ চৈ পড়ে গেল সারা এলাকায়, দাবানলের ন্যায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো দূর-দূরান্তরে। দেখতে দেখতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কয়েক সহস্র লোক জমায়েত হলো জংলী গ্রামে। ওদিকে জোয়ান দু'জন বোধহয় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া গভীর অরণ্যে তাদের ভয় না থাকলেও জীবনের ভরসা ছিল না। কারণ হিংস্র জানোয়ারের অবস্থান এবং তাদের দ্বারা পুনরাক্রমণ সম্বন্ধে জোয়ানেরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। বোধহয় সেই কারণেই তারা ঐ জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিম কোণে হাজির হয়ে কোন্ দিকে যাওয়া যায় সেটা পরীক্ষা করছিল। এমন সময় ঐ স্থান থেকে কিছুটা দূরে মাঠে কর্মরত কয়েকজন লোক তাদের দেখে চিৎকার করে ওঠে। নিমিষে জড়ো হয় অনেক লোক। সৈনিকেরা কি মনে করে আর জংগলের মধ্যে প্রবেশ না করে বের হয়ে আসে মাঠে।

মাঠে আসবার সাথে সাথে কয়েক হাজার লোক চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে, কিন্তু সাহস করে কেউই তাদের আওতার মধ্যে যায় না। সৈনিক দু'জন প্রথম অবস্থায় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা ফায়ার করলেও জনতার ক্ষতি হতে পারে, এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা দু'জনে ক্রমাগতভাবে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে নাটোর -ঈশ্বরদী রেলওয়ে লাইনে উঠে পড়ে এবং দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে। জনতা চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করে রাখলেও তাদের ধরবার বা মারবার কোন কার্যকরি ব্যবস্থা করতে সাহসী হয় না। কারণ সৈনিক দু'জনের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং পর্যাপ্ত রাউন্ড গুলি থাকায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সবাই ভীত ছিল।

জোয়ান দু'জন রেলপথ ধরে সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জনতার মধ্য থেকে দু'একজনকে আহ্বান করে এবং তাদের খাবার পানি দেবার জন্য জানায় আকুল আবেদন। কিন্তু কেউই তাদের সামনে যেতে সাহস পায় না। ফলে সৈনিকেরা তাদের হাতের অস্ত্র ও গুলিগুলো রেলপথসংলগ্ন ডোবায় ফেলে দিয়ে জনতার কাছে আবেদন করে পানির জন্য। ভাংগা ভাংগা উর্দুতে জানায় যে তারা নিরপরাধ। সরকারী চাকুরে হিসাবে তারা সরকারের

নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কিছুই করেনি এবং তারা মুসলমান হিসাবে আর এক মুসলমান ভাইয়ের কাছে দাবি করে ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচারের নাম শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে উত্তেজিত জনতা। নিরস্ত্র জোয়ানদের লক্ষ্য করে দূর থেকে শুরু করে প্রচণ্ড ইটপাথরের বৃষ্টি। অসংখ্য ইটপাথরের আঘাতে জোয়ান দু'জন স্বল্প সময়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। ফলে উন্মত্ত জনতা হায়েনার মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি, সড়কি, দা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তাদের দেহ।

অপরিসীম অত্যাচারের মধ্যেও একমাত্র কালেমা পাঠ ছাড়া তারা আর কিছুই বলেনি, প্রাণভিক্ষা চায়নি কিংবা এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলেনি। শুধু একজন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে পানির কথা বলেছিল। প্রতিউত্তরে তার মুখে প্রস্রাব করা হয়েছিল। যারা এই হত্যাযজ্ঞে শরিক ছিল তারাই পরবর্তীকালে অনুতপ্ত স্বরে একথা স্বীকার করেছে যে, তাদের ওপর অমন অমানুষিক অত্যাচার করা সমীচীন হয়নি।"

দেখুন শেষ বাক্যটি। হানাদার বাহিনীর সদস্যদের যারা হত্যা করেছিল তারা হয়েছিল অনুতপ্ত।

## ২৯

বাংলাদেশের মুসলমানদের ক্ষতি করেছে কে? বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশে নানা অঘটন ঘটেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ খারাপ কেন?-- আয়েন উদ-দীনের ভাষায়- "বাঙালী জাতীয়তাবাদই ছিল আমাদের আন্দোলনের প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র অবলম্বন। ফলে ভিন্ন ভাষাভাষী হয়েও সুদীর্ঘকাল ধরে যে মুসলমানেরা বাংলার মুসলমানদের কাছে আপন ভাইয়ের মতো সমাদর ও মর্যাদা পেয়ে আসছিল তারা রাতারাতি চরম শত্রু বলে পরিগণিত হলো- যে ভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান ভাই বাঙালী মুসলমানের প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালবাসায় ধন্য ছিল তারা আমাদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ালো। সারা সাহিত্যে কাব্যে বাংলার মুসলমানকে ম্লেচ্ছ বলতে দ্বিধাবোধ করেনি, উপরে কেরানী, দারোয়ান, পাঁচক, খাজনা আদায়ী মণ্ডল এবং উর্ধ্বপক্ষে ফকিরের উর্ধ্বে স্থান দেয়নি, যারা আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা ছায়া মাড়াতে রাজি হয়নি, যারা সুদীর্ঘকাল ধরে একান্ত নিরুপায় না হলে, বাঙালী মুসলমানদের চেয়ারে বসবার অধিকার দেয়নি,

জাতীয়তাবাদের জয়গানে মুখরিত তারাই। এরাই রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে জুতা পায়ে ছাতা মাথায় মুসলমানদের চলতে দেয়নি। বানিয়া ইংরেজের সহায়তায় মুসলমানদের চাকরি-বাকরি থেকে করেছে বিতাড়িত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে যাবতীয় সম্পত্তি থেকে করেছে নির্মমভাবে বঞ্চিত, শিক্ষা অঙ্গন থেকে বহিষ্কৃত। ইংরেজানুকূল্যে কেরানী হতে বিরাট জমিদারীর অধিকর্তা হয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলমান প্রজাদের রক্ত শোষণ করে বাংলার মুসলমানকে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। খাজনা আদায়ের নামে মুসলমানদের পিঠে চাবুক মারতে সংকোচ বোধ করেনি– স্বীকার করেনি আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের অধিকার। তারাই একমাত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদের কল্যাণে রাতারাতি হয়ে গেল পরম বন্ধু এবং তাদের সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের জোরে মুসলমানরা হলো বিহারী, বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী ও পাঠানী।"

এই জাতীয়তাবাদের কারণে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। নাটোরে মোহাজেরদের হত্যা করা হলো। এক হিন্দু রাজনৈতিক নেতার বাসায় এসব সভা হতো। লক্ষ করবেন শব্দটি হচ্ছে 'হিন্দু রাজনৈতিক নেতা।' তারপর–

"এপ্রিলের দশ তারিখ অতি প্রত্যুষে দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল এক দুঃসংবাদ। স্তব্ধ বিস্ময়ে নাটোরবাসী শুনলো যে রাতের অন্ধকারে, নাটোর ট্রেজারীর সমুদয় টাকা লোপাট করে সংগ্রাম পরিষদের সর্বাধিনায়ক এসডিও সাহেব, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংগ্রাম পরিষদের কার্যকরী সংসদের সদস্যবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা সরে পড়েছে নাটোর থেকে— গাড়িযোগে চলে গেছে ভারতে। স্তম্ভিত হলো নাটোরের জনসাধারণ, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সারা নাটোর মহকুমার সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ কর্মিগণ।

নেতৃবর্গের হঠকারিতায় হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল সাধারণ কর্মীরা। উত্তেজনার জোয়ারে ভাটা পড়ায় বিবেকের দীপ উঠল জ্বলে। বিগত কয়দিনের কৃতকর্মের কথা চিন্তা করে আঁতকে উঠল কর্মীরা, বিবর্ণ হয়ে গেল সাধারণ মানুষেরা। প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কিনা তা চিন্তা করার আগে ছড়িয়ে পড়ল লোমহর্ষক সংবাদ পাকবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে আসছে এগিয়ে এবং আসার পথে তারা বিধ্বংস করছে মানুষের বাড়িঘর, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে যাবতীয় সম্পদ, হত্যা করছে পুরুষদের। ধর্ষণ করছে নারীদের। স্বভাবগুণেই তারা চির নির্মম, চির কঠোর কিন্তু তাদের কঠোরতা অতীতের সব ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ তারা যেখানেই গেছে সেখানেই অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে অবাঙালী হত্যার নির্মম ও মর্মস্পর্শী ছবি।"

পাকবাহিনী তখন পৌঁছে গেছে নাটোর। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু দুষ্কৃতকারী যারা লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ করেছে। কিন্তু এই দুষ্কৃতকারী কারা?

তারাই কি পরে রাজাকার হিসেবে যোগ দিয়েছিল হানাদার বাহিনীর সঙ্গে? এর উত্তর কিন্তু পাওয়া যাবে না আয়েন উদ-দীনের গ্রন্থে। এই যখন অবস্থা, তখন 'জনগণ' ছুটে গেল "নাটোরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, কেএসপির কাছে।" এরাই কিন্তু পরে হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে ওঠে। অবশ্য, এ ভাষ্যও নেই তার রচনায়। এই পটভূমিকায় নাটোরের "মহানুভব ব্যক্তি" মাহমুদের চেষ্টায় গঠিত হলো শান্তি কমিটি।

এই পর্যায়ে রাজশাহীতেও শান্তি কমিটি হয় এবং তার সভাপতি হন আয়েন উদ-দীন। কিন্তু কীভাবে তিনি শান্তি বাহিনীর সভাপতি হলেন এবং সে হিসেবে নয় মাস কী করেছিলেন তার কোন বর্ণনা নেই গ্রন্থে, কিন্তু বিবরণ আছে বিভিন্ন রসালো প্রেমের গল্পের।

আয়েন উদ-দীন মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তার কর্মকাণ্ডের কোন বিবরণ রেখে যাননি তার গ্রন্থে। আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত সেসব কাজকর্মের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে উপ-নির্বাচনের আয়োজন করেছিল আয়েন উদ-দীন তাতে রাজশাহী-১৩ আসন থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। শান্তি কমিটির সভাপতি হিসেবে হানাদার বাহিনীকে তিনি নিয়মিত 'দুষ্কৃতকারী'দের তালিকা সরবরাহ করতেন। তার সে ধরনের দুটি চিঠি পাওয়া গেছে যাতে মোট ৪০ জনের নামের তালিকা ছিল। পূর্বোল্লিখিত আব্দুস সোবহান গণতদন্ত কমিশনকে জানান নয় জনকে আয়েন উদ-দীন হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সম্পত্তি দখলের জন্য এপ্রিলের শেষের দিকে হারুনুর রশীদ ওরফে হারাধনকে হত্যা করেন। এই হারাধনের চায়ের দোকানেই যৌবনে আয়েন উদ-দীনরা আড্ডা দিতেন। এ তথ্য আয়েন উদ-দীনের খালু শ্বশুর আবদুল গনি মোক্তারের যিনি খুনের মামলায় আয়েন উদ-দীনের পক্ষে ওকালতি করে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন। '৭১ সালের অক্টোবরে একটি গ্রাম ঘেরাও করে হানাদার বাহিনী ১০০ জনকে আটক করে। তাদের মধ্যে থেকে বেছে আয়েন ৫ জনকে হানাদার বাহিনীর হাতে সোপর্দ করেন। অভিযোগ, তারা আয়েনকে ভোট দেয়নি। জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী– "মূলত '৭১ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে রাজশাহীতে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যে শত শত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে আয়েন উদ-দীনের নেতৃত্বাধীন শান্তি কমিটি, রাজাকার প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী জড়িত ছিল বলে গণতদন্ত কমিশনের মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়।"

## ৩০

ইতোমধ্যে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় আয়েন উদ-দীন খবর পান তার স্ত্রী-সন্তানরা বহাল তবিয়তেই আছে। তাদের আশ্রয় দিয়েছে তাদের আত্মীয় এক মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার। এ ক্ষেত্রে মুক্তি বাহিনীর কমান্ডার যে মানবিকতা দেখিয়েছিল তার জন্য কিন্তু আয়েন উদ-দীন কোন পৃষ্ঠা খরচ করেননি। যাবতীয় পৃষ্ঠা খরচ করেছেন হাসেমের মানবিকতা তুলে ধরার জন্যে। এটিই হচ্ছে রাজাকারের মন।

এখানেই শেষ নয়। হাসেমের ছেলে আলম ধরা পড়ে। শেষ ক' পৃষ্ঠায় তিনি সে কাহিনী বর্ণনা করেন। আলম ছিল ছাত্রলীগ কর্মী। হানাদার বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে বলে "হয় মৃত্যু নয় সহযোগিতা।" আলম সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছিল। হানাদারদের পতনের পর খুব সম্ভব তার পিতা বলেছিল পালিয়ে যেতে (আয়েন উদ-দীন তা উল্লেখ করেনি)। কিন্তু আলম যায়নি। কারণ "স্বাধীন বাংলাদেশে কোন অন্যায় হবে না– হবে না মানবতার অসম্মান সে বিশ্বাস ছিল আলমের। আর তাই সে প্রতিবাদ করেছিল পিতার কথার। বলেছিল, "এটা তোমার ভুল ধারণা আব্বা। আমি এমন কোন মারাত্মক অপরাধ করিনি যে, মুক্তি বাহিনীর লোকেরা আমার উপর অত্যাচার করবে।

দেশ স্বাধীন হবার দিন অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বরে শ্বশুর বাড়িতে সে বুঝেছিল তার ভুল এবং এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আব্বার সিদ্ধান্ত ছিল কতো নির্ভুল।"

এখানে লক্ষ করুন "মারাত্মক অপরাধ" শব্দ দু'টি। আয়েন উদ-দীন নিজেই আগে লিখেছেন, "আলমকে সামরিক বাহিনীর সাথে সাথে ঘুরে দেখাতে হয়েছিল নাটোরের বিশেষ বিশেষ ভদ্রলোকের আবাসস্থল। বলা বাহুল্য, সামরিক কর্তৃপক্ষ এগুলোর ক্ষতি করেছিল অনেক।" এ কাজ আয়েন উদ-দীনও করেছিলো। এগুলি কিন্তু তার ভাষায় মারাত্মক নয়? তা'হলে মারাত্মক কাজ কোন্‌গুলি?

এর কয়েকদিন পর মুক্তিবাহিনী হাসেমের বাড়ি ঘেরাও করে। আয়েন উদ-দীন হাসেমের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নেয় আরেক বাড়িতে। "যে বাড়িতে প্রবেশ করলাম তাকে পোড়োবাড়ী বললেও কোন অত্যুক্তি হবে না। একটি ঘরে ঢুকে ঘরের কোণে বসলাম। পায়ের দিকে চাইতেই লক্ষ্য করলাম যে, বাম পায়ের তালুর অনেকটা অংশ কেটে ঝরছে অঝোরে রক্ত।"

এখানেই রাজাকার আয়েন উদ-দীনের কাহিনী শেষ। আগেই বলেছি, আয়েন উদ-দীন কৌশলী, তাই কাহিনীর বর্ণনাকে অলঙ্কৃত করেছেন। অন্যান্য রাজাকারের আত্মকাহিনীর মতো তিনিও তার কাহিনীতে উল্লেখ করেননি, কেন

তিনি পালিয়েছিলেন, কী ছিল তার অপরাধ? মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কী করেছিলেন? কিছুই জানা যাবে না এ বই পড়লে। শুধু বোঝা যায়, মুক্তিযুদ্ধটা ঠিক ছিল না। আর জয়ের পর মুক্তিযোদ্ধাদের দেখানো উচিত "মানবতা।" কিন্তু রাজাকাররা যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল সেখানে মানবতার প্রশ্ন নেই। কারণ তারা রাজাকারিত্বের বিরোধিতা করেছিল। এটিই রাজাকারের মনের বৈশিষ্ট্য।

## ৩১

কেএম আমিনুল হকের 'আমি আলবদর বলছি' নামক বইটি দেখে প্রথমে ব্যঙ্গাত্মক রচনা বলে মনে হয়েছিল। আমি এখনও জানি না, বইটি ঠিক ঠিকই কোন আলবদরের লেখা কিনা! তবে, বইটি আদ্যোপান্ত পড়ে আমার মনে হয়েছে ঘটনার বিবরণগুলো অতিরঞ্জিত এবং আলবদরীয় হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় মোটামুটি পরিচিত। অর্থাৎ সময়কাল, পাত্র-পাত্রী।

এই বইটির ধরণ আলাদা। এটির মূল উপজীব্য কারাগার কাহিনী। তবে পূর্বোক্ত বইগুলোর মতো এতে জটিলতা নেই। এখানে আমিনুল নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করেননি বরং সদম্ভে ঘোষণা করেছেন তিনি/ তারা আল বদর। আলবদরীয় তত্ত্বে তারা বিশ্বাসী। পাকিস্তানের পক্ষে তারা জোর লড়াই করেছিলেন। পূর্বোক্তরা শত পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন শুধু একটি কথা বলতেই যে, তারা নিরপরাধ; তাদের রাজাকার বলা হয়, কিন্তু তারা রাজাকার নন। আমিনুল কিন্তু প্রথমেই ঘোষণা করেছেন— "আমি আলবদর ছিলাম। একাত্তরের সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব। আমার বিবেকের সাথে পারামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম। কোন দল, কোন গোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে অথবা কোন কিছুতে প্রলুব্ধ হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ কথা সত্য নয়। বন্দুকের নলের মুখে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি তাও নয়।"

আমিনুল জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর তার বিবেকে একটা ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। প্রশ্নটা হলো— "যে হিন্দুস্থান তার নিজের দেশে হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে মুসলমানদের নিধন করেছে, সেই ভারত কী স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের আট কোটি মুসলমানের জন্য দরদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল?"

রাজাকারদের কাছে জীবনে সমস্যা একটিই– "হিন্দুস্থান"। প্রথমেই হিন্দুস্থানকে দু'টি গালি তারপর অন্য কথা। যাক মেনে নিলাম, হিন্দুস্থানে ঐ সময় হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে [যা সত্য নয়], কিন্তু হিন্দুস্থান কি ১৯৬৯-৭১ সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কোন হস্তক্ষেপ করেছে? বা এমন কোন বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে যা প্রভাবান্বিত করেছে ঐ সময়কার গণআন্দোলন? রাজাকার ও হানাদারদের অত্যাচারের ফলে সবাই ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত কি তাদের আহ্বান জানিয়েছিল ভারতে আশ্রয় নেয়ার জন্য? আশ্রয় পেয়ে তারপর বাংলাদেশের মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধ করতে চেয়েছে। অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য চেয়েছে। ভারত দিয়েছে।

আমিনুল তারপর উল্লেখ করেছেন, "মনে হলো এ দেশের ৮ কোটি মুসলমানকে [আট কোটি মুসলমান ছিল না সে সময়] দিল্লীর আজ্ঞাবহ সেবাদাসে পরিণত করতে চায় আওয়ামী লীগ। ১৯৭০ সালে যদি দেশের ৯৯% লোক সমর্থন করে শেখ মুজিব ও তাঁর কর্মসূচীকে, তাহলে আওয়ামী লীগ কী করবে? আরও আছে। ৯৯% লোকই যদি পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে না চায় তাহলে নেতৃত্বের করার কী আছে? গণতন্ত্র মানলে এ কথা বলা যায় না। ফ্যাসীবাদী বিশ্বাসী হলে তা বলা যায়। আর আলবদর হতে হলে ফ্যাসিবাদে বিশ্বাস করতে হয় বা মনোভঙ্গি ঐ রকম হতে হয়।

মার্চ তো গেল, তারপর কী হলো? ১৬ ডিসেম্বর এলো। "বিচ্ছিন্ন হলো দেশ। এক ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির গণজোয়ারকে বালির বাঁধ দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। পারিনি। দেশের প্রত্যেকটি জনপদ, রাজপথ, গ্রাম আর গঞ্জে দেশপ্রেমিক মানুষগুলো লাঞ্ছিত রক্তাক্ত হলো। মীর মদনেরা নিক্ষিপ্ত হলো মীর জাফরের কারাগারে। আমিও কারা প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ হলাম। আমার ৪০ বছর কারাদণ্ড হলো। আমি দেখেছি বিচারক নিজেই ছিলেন আমার চেয়ে অসহায়।"

আমিনুল যেভাবেই লিখুন না কেন, এই বাক্যটির সঙ্গে আগে যাদের বইয়ের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছি তার সঙ্গে কোন অমিল নেই। রাজাকাররা দেশপ্রেমিক। ১৬ ডিসেম্বরের পর তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। বিচারকরা বাধ্য হয়ে তাদের শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলি, রাজাকার-আল-বদরদের নির্মূল করা গেল কই? তার আগেই তো তাদের সেফ কাস্টডিতে নিয়ে গেল সেই হিন্দুস্থানী সৈন্যরা। তাদের জান বাঁচিয়ে দিল তাদের শত্রু হিন্দুস্থানী সৈন্যরা। জনপদ, রাজপথ রক্তাক্ত হলো কই? হলো না। কিন্তু রাজাকারদের মূল বিষয়ই হলো ঐ যে– সবকিছু রক্তাক্ত হয়ে গেল ১৬ ডিসেম্বরের পর। এর আগে, তেমন কিছুই হয়নি।

কারাগারে যাওয়ার ফলে আমিনুল বইটি লিখতে পেরেছেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছে কিশোরগঞ্জ থেকে ১৯৮৮ সালে।

## ৩২

আগেই বলেছি, আমিনুলের কাহিনীতে তেমন কোন জটিলতা নেই। গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। মুক্তিযোদ্ধারা 'অত্যাচার' করেছে তাদের মতো দেশপ্রেমিকদের ওপর, তারপর আছে কারাগারে অবস্থানের বর্ণনা। কিন্তু তার বিবরণে দু'টি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলো, রাজাকারদের সমর্থনের ভিত্তি ও তাদের ঐক্য। অন্যদিকে তাদের বিরোধীদের সমর্থন ভিত্তির ফাটল ও অনৈক্য। আমিনুলের বর্ণনা একপেশে ও অতিরঞ্জিত ধরে নিলেও একথা প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য সব বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। অন্যদের মতোই যার উদাহরণ আমি উদ্ধৃত করব।

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল থেকে আমিনুলের কাহিনী শুরু। এর আগে এ ভূখণ্ডে কী ঘটেছিল তার কোন বর্ণনা নেই। সেটি অবশ্য কোন রাজাকারের বইতেই নেই।

১৭ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জে আল-বদররা তার নেতৃত্বে মিত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেন নেজামে ইসলাম পার্টির মওলানা আতাহার আলী, যিনি ছিলেন তার ভাষায়, "ঐ অঞ্চলের আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি আমাদের অনেকের আপোসহীন প্রেরণার উৎস।" অর্থাৎ রাজাকার। একজন রাজাকার আর যাই হোক আধ্যাত্মিক গুরু হতে পারে না। রাজাকারিত্বে খানিক বিরতি দিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধেও যেতে পারে। গণতান্ত্রিক কোন দলেও হয়ত যোগ দিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরু? নৈব নৈব চঃ।

১৮ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতির "একটি খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়। এতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মহকুমা আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ মাযহারুল হক এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর দান করি। আমাদের প্রতি ডাক্তার সাহেবের ছিল অন্তহীন সহানুভূতি।" শেষের বাক্যটি দেখুন। এ ধরনের বাক্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার বইতে। তিনি এ কথাই বলতে চান যে, আসলে তাদের আদর্শের প্রতি আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের একটি অংশের সমর্থন ছিল; কিন্তু ভয়ে তারা প্রকাশ্যে তাদেরকে সাহায্য করতে পারেনি।

আমিনুলের আত্মীয়স্বজন আত্মসমর্পণ না করে আমিনুলকে পালাতে বলেছিলেন। "জাতীয় বৃহৎ স্বার্থ ও ভবিষ্যত ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার জীবন রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার" তারা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন। দুপুরে তাদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর দেখা। "তারা সম্মানিত নেতা মওলানা আতাহার আলীর পায়ে ধরে সালাম করল। তাদের অন্যতম ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান।"

মুক্তিবাহিনীর কেউ সেই ডিসেম্বরে রাজাকার আতাহার আলীকে সালাম করেছিল কিনা জানি না, না করার সম্ভাবনাই বেশি। তবে, মতিউর রহমান করে থাকতে পারে কারণ পরবর্তীকালে পাকুন্দিয়ায় ভণ্ডপীর হিসেবে সে পরিচিতি লাভ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজাকারের বীজ যার মধ্যে একবার রোপিত হয়, তার মনোজগতে তা ডালপালা মেলতেই থাকে। সে মুক্তিযুদ্ধ করলেও। মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে তখন তার ধারাবাহিক সংগ্রাম বা চিন্তার ফসল নয় বরং ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।

এ পর্যায়ে আমিনুল রাজাকারদের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের নিপীড়নের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা মিয়া ও বাদশাহ মিয়া নামে দুই রাজাকারের ওপর নাকি নিপীড়ন চালানো হয়। কীভাবে? তার ভাষায়, "উভয়েরই পুরুষাঙ্গ দড়ি দিয়ে বেঁধে সিলিং ফ্যানের সাথে সংযোগ করে সেটা পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দেয়া হয়।" পাঠক! এবার কল্পনা করুন দৃশ্যটি। প্রথমত পুরুষাঙ্গ কীভাবে ফ্যানের সঙ্গে বাঁধা সম্ভব? দুই. ধরে নিলাম বাঁধা হলো, কিন্তু শরীরের ভারে পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কি থাকে না? এবং তার ওপর যদি ফ্যান ঘুরতে থাকে? ফ্যানটাসিরও একটা সীমা থাকা দরকার!

এর মধ্যে আমিনুল অর্থাৎ রাজাকাররা জানতে পারে যে, ন্যাপ নেতা আব্দুল বারী, "অষ্টগ্রামে জনসভা করে" জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে "উত্তেজিত" করছে। উত্তেজিত করার কী দরকার ছিল সেই ডিসেম্বরে? এই সময় আবার সেই ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান আসেন দৃশ্যপটে। আমিনুলের ভাষায়— "ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান আমার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সোচ্চার সে জামায়াত কি করে ইয়াহিয়ার নিপীড়নের সহযোগী হতে পারল! [লক্ষণীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন শব্দটি] তাঁর ঐ বক্তব্য থেকে আমার মনে হলো জামায়াতের অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর মতিউর রহমানের ধারণা স্বচ্ছ। অন্তত একটি ব্যক্তিকে আমি পেলাম। সীমাহীন রাজনৈতিক ধূম্রজালের মধ্যেও যার অন্তরে রয়েছে সচেতন বিবেকের ক্ষীণ স্পন্দন। আমি জানি, আজ নয় সময়ের আবর্তে একদিন বিবেকের এই ক্ষীণ স্পন্দনই বেগবান হয়ে উঠবে।" আমিনুলের বক্তব্য সত্য হলে এ বিষয়ে আমার পূর্বোক্ত মন্তব্য সঠিকই বলতে হবে।

আমিনুল যখন বন্দী তখন মুক্তিফৌজ তার থেকে ৫শ' টাকা আর হাতঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার মন্তব্য–"আন্দোলনের শুরু থেকে দিনে দিনে আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে যে লুট করার মানসিকতার সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কোন জাদুর কাঠি নেই যা দিয়ে এ মানসিকতার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অবাঙালীদের সম্পদ লুট করার মধ্য দিয়ে তারা গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ

মানুষের সম্পদ লুট করে। লুট করে অগণিত কুমারী মেয়ের ইজ্জত। পক্ষান্তরে আমরা বিশেষ করে আলবদরের কথা বলছি, সাধারণ কর্মীদের কড়া দৃষ্টির মধ্যে রাখতাম। কোন দুর্বলতা, কোন অভিযোগ কোন ভাবে এসে পড়লে তড়িঘড়ি এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হতো। এমনকি আমাদের চোখের সামনে কারও দ্বারা কোন অঘটন ঘটলে তার প্রতিকার করেছি আমরা নিজেরাই।" বাস্তবে কিন্তু তার উল্টোটা ঘটেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যা ঘটেছে আমিনুল তাই উল্লেখ করেছেন তবে উল্টোভাবে। ঘটনাগুলো মুক্তিযোদ্ধারা ঘটায়নি, ঘটিয়েছে রাজাকাররা। অবাঙালি কিছু নিহত হয়েছে ঠিকই তবে, নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে অবাঙালিরা বসবাস করত না। এ পর্যায়ে একটি সত্য ভাষণ আছে তার বইতে– "আমার মনে হতো যেন আমরা ১৬ ডিসেম্বরে মরে গেছি। এখনকার নির্যাতনকে কবর আজাব বলে আমার মনে হতে লাগল। দলের পর দল এসে আমাদের উত্ত্যক্ত করতে লাগল।"

মাসখানেক তারা ছিলেন সেনাবাহিনীর হেফাজতে। এ সময় একদিন তাদের সরকারী স্কুল থেকে পিটিআইয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নেয়া হচ্ছিল। "মুক্তিফৌজদের ধারণা ছিল, রাস্তার দু'পাশে থেকে বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভ, ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উক্তি দিয়ে আমাদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু সেটা হলো না। প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম এর উল্টো। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের চোখ দেখলাম অশ্রুসজল। কারও মুখে কোন কথা নেই। এমনকি শিশুরাও বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে। এরা ছিল আমারই প্রতিষ্ঠিত শিশু প্রতিষ্ঠান শাহীন ফৌজের সদস্য।" আগেই উল্লেখ করেছি আমিনুল এ ধরনের উক্তি প্রায়ই করেছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। আর শাহীন ফৌজ জামায়াতের নিয়ন্ত্রিত শিশু সংগঠন। বা বলা যেতে পারে ভবিষ্যত রাজাকার তৈরির প্রকল্প। তাদের 'অশ্রুসজল' বা 'চুপ' থাকা স্বাভাবিক। অন্যদের পক্ষে নয়।

এ ধরনের উক্তি এর পরও আছে। আমিনুলকে জেরা করার জন্য ডেকে নেয় লেঃ কামাল। জেরার এক পর্যায়ে কামাল ইমপ্রেসড হয়ে তাকে চেয়ার এগিয়ে দেয় বসার জন্য এবং তারপর বলে "ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার সময় আমি মালেককে জানতাম। [মালেক ছাত্র সংঘের কর্মী] খুব ভাল ছাত্র। তার মৃত্যুতে আমরাও আহত হই, যদিও আমি ছাত্র ইউনিয়নে ছিলাম। ৮ কোটি মানুষের গণস্রোত ও প্রচণ্ড গতির সামনে কি করে আপনারা শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই গতি পাল্টে দেয়ার জন্য ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হই। অথচ আপনারা লুট করেছিলেন এমনটি নয় [বাক্যটি লক্ষ্য করুন]। বৈষয়িক সুবিধাভোগীও আপনাদের বলা যাবে না। আপনারা আলবদরের যাঁরা রয়েছেন

তাঁরা চিন্তা-চেতনা ও যোগ্যতার নিরিখে বিচার করলে পিছনের সারির নন, অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আপনারা আজ অন্ধ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছেন!" এই লেঃ কামাল কে জানি না। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে একজন আল-বদরকে চেয়ারে বসিয়ে উপর্যুক্ত মন্তব্য করবে এটি কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমিনুল একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখ দিয়ে আল-বদরের প্রশংসা জানিয়েছেন এ ধারণা সৃষ্টির জন্য যে, তারা খুনী নন, বরং যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

আমিনুলকে এরপর নেয়া হয় কিশোরগঞ্জ জেলে। কারাগারের সামনে তাকে দেখতে মানুষের ভিড় জমে। এ ভিড়ের কারণ তার মতে, "পত্র-পত্রিকায় উদ্ভট প্রচারণা।" আসলে মানুষ তখনও আল-বদর দেখতে চেয়েছিল। কারণ, আল-বদর ও মানুষ ছিল আলাদা। আল-বদররা নিরীহ মানুষদের নিয়ে কসাইর ছুরি দিয়ে জবেহ করত। কুচি কুচি করে কাটত। ১৬ ডিসেম্বরের পর মিরপুরের শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে পুরনো বট ও কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে কুচি কুচি মানুষ কাটার আলামত ঢাকাবাসীরা দেখেছে।

কিশোরগঞ্জ জেলে বসে আমিনুল সময় পেলেন পুরনো দিনের কথা চিন্তা করার। মনে পড়ল তার সত্তরের নির্বাচনের কথা। কী হয়েছিল সত্তর সালে?

১. "সত্তরের নির্বাচন শেষ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেশটা যেন দুটো ভাগ হয়ে গেল। একদিকে উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ইসলামী সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়া।"

২. সত্তরের নির্বাচনের সময় "আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগের পোষা গুণ্ডাদের দ্বারা আমাদের সহকর্মী বহু পোলিং এজেন্টকে পোলিং বুথ থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।"

৩. "তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ভাষণ দেয়ার সময় টাকা সংগ্রহের জন্য শত শত ড্রাম বসান হয়েছিল। এ থেকে কত টাকা সংগ্রহ হয়েছিল সেটা বলা হয়নি। তবে এর অছিলায় কোটি কোটি টাকার হিন্দুস্তানী মদদ জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবের হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য।"

৪. ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান ভাঙ্গার "মূল উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগ অথবা শেখ মুজিব কেউই নয়। এর নেপথ্যে যাদের কালো হাত সবচেয়ে সক্রিয় ছিল সেটা হলো কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো।"

৫. "জামায়াত যখন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের দাবিতে গণআন্দোলন শুরু করার আয়োজন-উদ্যোগ নেয় তখনই ছাত্রদের মাধ্যমে ৬ দফা রাজনৈতিক ময়দানে আনাগোনা শুরু করে। পয়ষট্টির যুদ্ধে পাকিস্তানের কাছে মার খেয়ে হিন্দুস্তান পিছন দিক থেকে এ জাতিকে ছুরিকাঘাত করার

চেষ্টা নেয়। ৬ দফা আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটা আসে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র‍্যাডের [র'য়ের] টেবিল থেকে।"

৬. ১৯৭১ সালের জানুয়ারির পর "অপরাধ করতে করতে আওয়ামী লীগের দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে গেল। তখন হত্যাযজ্ঞ শুরু হলো অবাঙালীদের ওপর। যখন জাতীয়তাবাদের হাতিয়ার গর্জে উঠল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকদের লক্ষ্য করে, তখন সরকারের টনক নড়ল।"

৭. মার্চে আমিনুল এলেন ভৈরব। শুনলেন আওয়ামী লীগ কর্মীরা অবাঙালীদের হত্যা করেছে। তাঁর মনে হলো, "হিন্দুস্তানের প্ররোচনায় এরা কি করে পারলো মুসলমানদের খুনে তাদের হাত রঙিন করতে। কি করে পারলো অবোধ শিশুদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে। তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হলো আমার মনে।" তারপর আমিনুল কিশোরগঞ্জে এসে "সমমনা বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে আমি আলবদর বাহিনী গঠন করলাম।"

এখন তার বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক। '৭০-এ মেরুকরণ হয়েছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। কিন্তু মাইনোরিটির আদর্শ কী ছিল ইসলামের সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়ায়? ঐ আমলের সব দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো থেকে খবরের কাগজের সংবাদগুলো দেখুন—এর কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৭০-এর নির্বাচনে আমরাও ভোট দিয়েছি। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা পোলিং বুথে গণ্ডগোল করেছে এ রকম ঘটনা সবখানেই ঘটেছে এটা সত্য নয়। এ ধরনের কথা বলেন পাকিস্তানী জেনারেল ও কিছু পাকি রাজনীতিবিদ। ৭ মার্চ জনসভায় আমি ছিলাম। 'শত শত ড্রাম' বসান হয়েছিল টাকা তোলার জন্য। এ রকম দৃশ্য তো চোখে পড়েনি। কল্পনার অবশ্য সীমা থাকতে নেই। কমিউনিস্ট পার্টি তো পূর্ব পাকিস্তান মেনেই কাজ করেছিল যে কারণে '৪৭-এ পার্টি উপমহাদেশের মতো ভাগ হয়ে যায়। যদ্দুর মনে পড়ে কমিউনিস্টরা তো পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থনই করেছিল। সুতরাং তাদের কালো হাত পাকিস্তান ভাঙবে কেন? বরং জামায়াত নেতা মওদুদী পাকিস্তান চাননি। আর ছয় দফা এসেছিল গোয়েন্দা সংস্থার থেকে ? ব্যাপারটা কি এতই সোজা ? আর বিহারী হত্যা? হয়েছে তবে তা অনেক ক্ষেত্রে ছিল প্ররোচনা ও প্রতিশোধমূলক। ১৯৭১ সালের ২৩ থেকে ২৮ মার্চের ঘটনা। আমি তখন ছিলাম মিরপুরের পল্লবীতে। আমি তখন দেখেছি বিহারীদের তাণ্ডব। একটি ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। ২৪ অথবা ২৬ মার্চ বিকেলে দেখি দলে দলে বাঙালিরা পালাচ্ছে তুরাগ নদীর দিকে। এক বাচ্চা ছেলের সঙ্গে দেখা। সেও যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার বাবা-মার কথা। জানাল, বিহারীরা তাদের হত্যা

করে টুকরো টুকরো করে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে আবিষ্কৃত মুসলিম বাজার বধ্যভূমি এর একটি উদাহরণ। ছেলেটি যেন ছিল তখন ঘোরের মধ্যে। এ হত্যাযজ্ঞের মধ্যে আমাদের আবার আশ্রয় দিয়েছিল এক বিহারী প্রতিবেশী। সুতরাং বিহারীদের টার্গেট করে সবখানে হত্যা করা হয়েছে ঠিক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ সব ঘটনার বিকৃতায়ন কেন করলেন আমিনুল? করলেন এ কারণে যে, রাজাকারের ধর্মই তাই।

## ৩৩

আমিনুল একটি বিষয়ে খুব সতর্ক। সেটি হচ্ছে, সুযোগ পেলেই আল-বদরদের ভদ্র এবং নম্র হিসেবে তুলে ধরা। এবং এ মন্তব্যগুলো সবসময় করানো হয়েছে বিপক্ষীয়দের মুখ থেকে। কারণ, আমিনুল জানতেন যে, তারা নিজেরা হিংস্রপশুর থেকে কম ছিলেন না। মানুষ দেখলেই বিশেষ করে সে যদি হয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের তাহলে তার রক্ত পান করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁর ওপর।

কিশোরগঞ্জ থেকে তাদের নেয়া হচ্ছে ময়মনসিংহ জেলে। সকালে এসে তারা পৌঁছেছেন শহরে। "তখন ইতস্তত দোকানপাট খুলছে। কিন্তু সবারই চোখ আমাদের দিকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। হয়ত ভাবছে, এমন প্রত্যূষে এরা কারা? আমার সাথীরা দেখতে শরীফ, সভ্য এবং নম্রতার প্রতীক। এদের ব্যাপারে পুলিশী তৎপরতা তো শেষ হয়েছে অনেক আগে। তাদের বিস্ময়ে হতবাক হওয়া স্বাভাবিক। এই সাত সকালে পুলিশের বেষ্টনীতে যারা এসে থাকে তারা তো আমাদের মতো নয়। তেমন মস্তানী সুরত আমাদের কারও ছিল না।"

তার একবারও মনে হয়নি চোর-ডাকাতকে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিলেও মানুষ থাকে। আল-বদর হলে তো দেখবেই। জেলে পিডিপির সহসভাপতি মুসলেহ উদ্দিনের সঙ্গে দেখা। "যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের মতো দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকেও আজকের এই দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হয়েছে।" পাকিস্তানীদের পক্ষে থেকে হত্যা করা হচ্ছে দেশপ্রেম।

ইতোমধ্যে মামলা শুরু হয়েছে আমিনুলের। রায়ের দিন দেখলেন, "বিচারক তাঁর আসনে নির্বাক। ভীতি-বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। রায়টা আমার বিপক্ষে দিতে সম্মানিত বিচারক বাধ্য হয়েছেন।

তার কারণ ২০ বছর কারাদণ্ডের রায় শোনার পর যখন আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চারণ করি তখন তিনি অসহায়ের মতো সকরুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার উদ্দেশে তিনি বললেন, আপনি হাই কোর্ট করলে খালাস পাবেন।"

বিচারক আল-বদরদের মামলার রায় দিয়েছেন চাপে পড়ে এবং তারপর তাকে আদালতেই উপদেশ দিচ্ছেন হাই কোর্টে যেতে, এ রকম ঘটনা কখনও আমরা শুনিনি। আমিনুল বলছেন, "হিন্দুস্তানী কূটচক্রের আবেষ্টনীতে যে প্রশাসন বাঁধা সে প্রশাসন নিজেই তো অসহায়। প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য ইসলামী চেতনার মানুষগুলোকে তারা বিপন্ন করবে এমন প্রত্যাশার বাইরে আমি কখনও কিছু ভাবিনি। আমার ফাঁসি হলেও অস্বাভাবিক মনে হতো না। ৪০ বছর কারাদণ্ড বলতে গেলে খোদার এটা এক মেহেরবাণী। ২শ' বছর আগে এমনি প্রহসন হয়েছিল মুর্শিদাবাদের আদালতে।"

আসল ঘটনা এই যে, আদালতসমূহ অনেক ক্ষেত্রে নমিত ব্যবহারই করেছে। ১৯৭১ সালের ঘটনার ঠিক পর পর পরিস্থিতির আলোকে যদি বিচার করা হতো এবং শাস্তি দেয়া হতো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকারদের এখন আধিপত্য থাকত না।

## ৩৪

ময়মনসিংহ কারাগারে এনে রাখা হলো আমিনুলকে। ডিআইজি আব্দুল আওয়ালও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন খালাস পাওয়ার জন্য হাই কোর্টে মামলা করতে। ডিআইজি এসেছিলেন ময়মনসিংহ কারাগার পরিদর্শনে।

ময়মনসিংহ থেকে তাকে আনা হয় ঢাকায়। ট্রেনের কামরায় তার সঙ্গে দেখা কিছু পুলিশ অফিসারের, যারা ছিল রাজাকার। তাদেরও ঢাকা নেয়া হচ্ছিল। এখানে তাদের আলাপচারিতার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে পুলিশের একটা অংশের সঙ্গে রাজাকারদের যোগাযোগ ছিল। আবার এ কথোপকথনের অবতারণা করে তিনি আলবদর বিরোধী পুলিশদের দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন যে, আল-বদররা ক্রিমিনাল নয়। বর্ণনাটি আমি উদ্ধৃত করছি।

"ট্রেন এসে গেল। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় উঠলাম। দেখলাম সেখানে আরও কিছু পুলিশ অফিসার আগে থেকেই বসেছিলেন। তারা আমার পরিচিত। এক সময় খুব কাছাকাছি ছিলাম আমরা। যখন কিশোরগঞ্জের পুরো দায়িত্বটা ছিল আমার ওপর, তখন তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারা আমাকে জানে। জানে আমার ভিতর-বাইর। আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভিবাদন জানাল। খুনের আসামী আমি। আমার কোন এক সময়ে পুরনো সহযোগীদের কাছে পেয়ে যেন ভাল লাগল। মনে পড়ল আমার সংগ্রামী দিনগুলোর বিক্ষিপ্ত স্মৃতি। এরাও তো হিন্দুস্তান যেতে পারত। কিন্তু না, ভুল করেও ওদিকে পা বাড়ায়নি। জাতীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিণতির কথা ভেবেই সম্ভবত তারা এমনটি করেনি। উৎকোচ সংক্রান্ত পুলিশদের স্বাভাবিক অসংযমী আচরণের বহির্প্রকাশ যুদ্ধকালীন ৯ মাস তাদের মধ্যে দেখিনি। তাঁরা যা কিছু করেছেন নিহায়ত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাঁরা আমার সাথী পুলিশদের বলে দিলেন যাতে আমার কোন অসুবিধা না হয়। বললেন, 'তোমরা যদি আমীন সাহেবকে সত্যি খুনের আসামী মনে করে থাক তাহলে ভুল করবে। উনি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এক নিষ্ঠুর শিকার। আমরা তাঁকে দেখেছি অত্যন্ত কাছে থেকে, আমরা তাঁকে জানি। তোমরা ছেড়ে দিলেও উনি পালাবেন না।' পুলিশরা জবাব দিল, "স্যার, মানুষ নিয়েই তো আমাদের কারবার, প্রকৃত ক্রিমিনাল চিনতে কি আমাদের ভুল হয় স্যার। উনাকে জিজ্ঞেস করুন, তার সাথে কোন বেয়াদবী করেছি কিনা?"

ঢাকায় পৌছে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করলেন আমিনুল। পুলিশ তাকে সহায়তা করেছে। তারপর বেশ খানিকটা ঘোরাফেরার পর পুলিশ তাকে নিয়ে পৌছল কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেখানে দেখা হলো তাদের পুরনো লিডার রাজাকার কামরুজ্জামানের সঙ্গে। সেখানে তার সঙ্গে জাসদ ও অন্যান্য দলের অনেক নেতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত হলো। আমিনুলের ভাষায়, "আমি নিজেই তাদের সাথে পরিচয় করে নিলাম। ভিন্নমুখী স্রোত এক মোহনায় এসে আমরা একাকার।"

ঢাকা কারাগারে তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে অনেকের। তাঁদের বিবরণ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি–

১. সিরাজুল হোসেন খান ঃ "আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা সখ্যতার পর্যায়ে ছিল। আদর্শের দিক দিয়ে আমাদের সাথে তার মিল না থাকলেও আওয়ামী লীগ ও ভারত মনোভাবের দিক দিয়ে ছিলেন আমাদেরই মতো একই অবস্থানে।" এ উক্তিতে বর্তমান রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের মেরুকরণের সূত্রটি পাওয়া যায়।

২. দেলওয়ার হোসেন সাঈদী ঃ "পাকিস্তান আমলে আমরা তাকে কেউ জানতাম না। বাহাত্তরের জাহেলিয়াতের অন্ধ তমসায় গোটা দেশ ছেয়ে গেলে এক দেলওয়ার হোসেন সাঈদী ইসলামের মশাল হাতে নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। বন্দুকের নলের মুখে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন। কিন্তু যখন তন্দ্রার ঘোর থেকে গোটা জাতি জেগে উঠল তখন আর সেই নকীব সাঈদী ময়দানে নেই। কি এক অন্ধ মোহে বিপ্লবের পথ পরিহার করেছেন। আয়েশী জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে নাজাত প্রাপ্তির সহজ পথ সন্ধান করছেন।"

পাকিস্তানী আমলে সাঈদীকে না চেনার কারণ, তখন সাঈদী ছিলেন সামান্য ক্যানভাসার। '৭১ সালে আলবদর হয়ে হত্যা ও অন্যান্য কার্যে লিপ্ত থেকে জামায়াতের নজরে আসেন ও সম্পদশালী হন। সম্পদ যাতে হাতছাড়া না হয় সে জন্য জামায়াতেই থাকেন। ধর্মকে ব্যবসা ও নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তিনি এখন জাতীয় সংসদের সদস্য। বর্তমান প্রজন্ম যাতে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে কিছু জানতে পারে সে জন্য জাতীয় গণতদন্ত কমিশনে তার সম্পর্কে যে রিপোর্ট আছে তা থেকে উদ্ধৃত করছি—

"১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই জামায়াত নেতা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য তার নিজ এলাকায় আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনী গঠন করেন এবং তাদেরকে সরাসরিভাবে সহযোগিতা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি সরাসরিভাবে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না, তবে তথাকথিত মওলানা হিসাবে তিনি তার স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা পরিচালনা করেছেন। তার এলাকায় হানাদারদের সহযোগী বাহিনী গঠন করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লুটতরাজ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ইত্যাদি তৎপরতা পরিচালনা করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি তার এলাকায় অপর চারজন সহযোগী নিয়ে 'পাঁচ তহবিল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যাদের প্রধান কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী বাঙালী হিন্দুদের বাড়িঘর জোরপূর্বক দখল করা এবং তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা। লুণ্ঠনকৃত এ সমস্ত সম্পদকে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী 'গনিমতের মাল' আখ্যায়িত করে নিজে ভোগ করতেন এবং পাড়েরহাট বন্দরে এসব বিক্রি করে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।"

পাড়েরহাট ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ইউনিয়ন কমান্ডের মিজান একাত্তরে সাঈদীর তৎপরতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন— "দেলোয়ার হোসেন সাঈদী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে পাড়েরহাট বন্দরের হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি লুট করেছেন ও নিজে মাথায় বহন করেছেন এবং মদন

নামে এক হিন্দু ব্যবসায়ীর বাজারের দোকানঘর ভেঙ্গে তার নিজ বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেববাজারের বিভিন্ন মনোহরী ও মুদি দোকান লুট করে লঞ্চঘাটে দোকান দিয়েছিলেন। দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর অপকর্ম ও দেশদ্রোহিতার কথা এলাকার হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম আজও ভুলতে পারেনি।" (মাসিক নিপুণ, আগস্ট ১৯৮৭)।

পিরোজপুরের এ্যাডভোকেট আবদুর রাজ্জাক খান গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন যে, সাঈদী যুদ্ধের সময় পাড়েরহাট বন্দরের বিপদ সাহার বাড়ি জোরপূর্বক দখল করেন এবং তখন তিনি এ বাড়িতেই থাকতেন। তিনি সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন।

এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে পাক সেনাদের কাছে সরবরাহ করতেন সাঈদী। এ্যাডভোকেট রাজ্জাক আরও জানিয়েছেন– সাঈদী পিরোজপুরে পাকিস্তানী সেনাদের ভোগের জন্য বলপূর্বক মেয়েদের ধরে এনে তাদের ক্যাম্পে পাঠাতেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঈদী পাড়েরহাট বন্দরটি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে জোরপূর্বক তরুণদের ধরে আনতেন এবং আলবদর বাহিনীতে ভর্তি হতে বাধ্য করতেন। কেউ এর বিরোধিতা অথবা আপত্তি করলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হতো।

গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা পিরোজপুরের এ্যাডভোকেট আলী হায়দার খানও সাঈদীর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সাঈদীর সহযোগিতায় তাদের এলাকার হিমাংশু বাবুর ভাই ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে। পিরোজপুরের মেধাবী ছাত্র গণপতি হালদারকেও সাঈদী ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তৎকালীন মহকুমা এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত এসডিও আবদুর রাজ্জাক এবং সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান, স্কুল হেডমাস্টার আব্দুল গাফ্ফার মিয়া, সমাজসেবী শামসুল হক ফরাজী, অতুল কর্মকার প্রমুখ সরকারী কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীদের সাঈদীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হত্যা করা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তথ্য সরবরাহকারী ভগীরথীকে তার নির্দেশেই মোটর সাইকেলের পিছনে বেঁধে পাঁচ মাইল পথ টেনে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাপ্টেন আজিজের সঙ্গে তার সুসম্পর্কের কারণে তিনি তাকে নারী 'সাপ্লাই' দিতেন বলে জানিয়েছেন আলী হায়দার খান।

পাড়েরহাট ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন খান জানিয়েছেন, সাঈদীর পরামর্শ, পরিকল্পনা এবং প্রণীত তালিকা অনুযায়ী এলাকার বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের পাইকারি হারে নিধন করা হয়। পাড়েরহাটের

আনোয়ার হোসেন, আবু মিয়া, নূরুল ইসলাম খান, বেণীমাধব সাহা, বিপদ সাহা, মদন সাহা প্রমুখের বসতবাড়ি, গদিঘর, সম্পত্তি এই দেলোয়ার হোসেন সাঈদী লুট করে নেন বলে তিনি গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন।

ইন্দুরকানী থানার পাড়েরহাট বন্দরের আনোয়ার উদ্দিন আহমেদ জনিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঈদী এবং তার সহযোগীরা পিরোজপুরের নিখিল পালের বাড়ি তুলে এনে পাড়েরহাট জামে মসজিদের গনিমতের মাল হিসাবে ব্যবহার করে। মদন বাবুর বাড়ি উঠিয়ে নিয়ে সাঈদী তার শ্বশুরবাড়িতে স্থাপন করেন।

বেণীমাধব সাহা জানান যে, সাঈদী এবং তার সহযোগীরা তদানীন্তন ইপিআর সুবেদার আবদুল আজিজ, পাড়েরহাট বন্দরের কৃষ্ণকান্ত সাহা, বাণীকান্ত সিকদার, তরণীকান্ত সিকদার এবং আরও অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছেন। হরি সাধু এবং বিপদ সাহার মেয়ের ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন। বিখ্যাত তালুকদার বাড়ি লুটতরাজ করেছেন। ঐ বাড়ি থেকে ২০/২৫ মহিলাকে ধরে এনে পাক সেনাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদের পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও দেলোয়ার হোসেন সাঈদী জড়িত ছিলেন বলে শহীদের কন্যা সুফিয়া হায়দার এবং জামাতা আলী হায়দার খান অভিযোগ করেছেন। তাঁরা জানান যে, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সহযোগিতায় ফয়জুর রহমান আহমেদকে পাকিস্তানী সৈন্যরা হত্যা করে এবং হত্যার পরদিন সাঈদীর বাহিনী পিরোজপুরে ফয়জুর রহমান আহমেদের বাড়ি সম্পূর্ণ লুট করে নিয়ে যায়।

একাত্তরের ঘাতক দালাল জামায়াত নেতা সাঈদী বিভিন্ন ওয়াজ তফসিরের নামে এখন বাঙালী জাতিসত্তা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন।"

৩. আব্দুল খাঁলেক মজুমদার : এর সম্পর্কে আগে বিস্তারিত লিখেছি। খালেক কী ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় আমিনুলের লেখায়। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ না হলে এক রাজাকার সম্পর্কে আরেক রাজাকার এমন মন্তব্য করে না। বিস্তারিত হওয়া সত্ত্বেও আমি বিবরণটি উদ্ধৃত করছি কারণ এতে একজন রাজাকার সম্পর্কে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হবে। আমিনুল লিখছেন, খালেক "একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকা সিটি জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব হিসাবে কারাগারে তার আচার আচরণ, তার সন্ত্রস্ত অনুভূতি, তার প্রলুব্ধ চেতনা, তার স্বজনপ্রীতির বহির্প্রকাশ আমাদের যথেষ্ট আহত করেছে। অন্য কোন সংগঠনের নেতা তেমন কোন ঘটনার অবতারণা করলে আমার মনে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না এবং সেটা স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু একটা মৌলবাদী সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যমূলক জীবনবোধ বিকাশ ঘটানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালু থাকা অবস্থায় তার নেতার অধোপতিত মানসিকতা দেখে আমার পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক। এটা তাকে খাটো করার জন্য নয়, এই বাস্তবতার নিরিখে তিনি স্বয়ং এবং আরও শত শত নেতা ও কর্মী দিকনির্দেশনা পাবে। তা না হলে এ সব দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখার অর্থ হবে আমি জেনেশুনে একটা বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করলাম।

১০, সেল ডিভিশনে আমার সেলে আমার সাথে তিনি থাকতে শুরু করলেন। তফসির ক্লাস পুনরায় চালু হলো। আমার খুব ভাল লাগছিল একজন আলেমকে আমার সাথে পেয়ে। তিনি আমার সাথে ১০, সেল ডিভিশনে থাকলেও তার অফিসিয়াল যোগসূত্র তৃতীয় শ্রেণীর সাথে রয়ে যায়। কয়েদী অবস্থায় তিনি বড় চৌকির ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। শিক্ষিত মানুষ বলে জেল কর্তৃপক্ষ তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। একদিন দেখলাম ১০, সেল ডিভিশনের ২০ জনের জন্য রান্না করা ২০টা মাছের মাথা নিয়ে একজন মেট হাজির। জিজ্ঞাসা করলাম –'কে পাঠিয়েছে?' জবাব পেলাম– 'ম্যানেজার সাহেব।' এতে আমার ডিভিশনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। আমার মোটেও ভাল লাগেনি। তৃতীয় শ্রেণীতে এমনিতেই খাদ্য সঙ্কট, তরিতরকারি মাছ মাংসের দারুণ অভাব। তাদের বঞ্চিত রেখে খালেক ভাই কোন্ মানবিক তাগাদায় ২০টি মাছের মাথা আমাদের সেল ডিভিশনে পাঠালেন বুঝলাম না। তাও যদি এখানে তেমন খাদ্য সঙ্কট থাকত তাহলে সেটা মেনে নেয়া যেত। অনেকে আবার টিপ্পুনি কাটলেন, 'এরা আবার ইনসাফ কায়েম করবে?' এরা মানে তো আমরা। আমিও তো জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট। কথাটা আমার অসহ্য মনে হলো। লজ্জিত হলাম।...

রাতে ঘুমাতে এলেন। তাঁর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। চুপ করে অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম। আমরা যে সাধারণ কয়েদীদের বঞ্চিত করা উপহার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি এটা তিনি টের পেয়েছেন। প্রসঙ্গ আমি তুললাম। বললাম–'আপনার বিবেক বলে তো একটা কিছু থাকা উচিত। থাকা উচিত আপনার দূরদর্শিতা। এখানে প্রত্যেকটা মানুষ সংবেদনশীল। আপনার প্রতি এখানকার সকলের কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এক নিমিষে সেটা ধ্বংস করে দিলেন। আপনার এ হাল্কা চেতনাবোধ আন্দোলনের ওপর কত বড় আঘাত করে, আপনার এটা বোঝা উচিত ছিল। অথচ সংগঠনের সব মানুষই এমন নয়। কত হাজার হাজার মানুষ দৃষ্টির আড়ালে কত বড় বড় কোরবানি দিচ্ছে। তাদের কৃতিত্ব আর কোরবানিগুলো হয়ত ভেসে উঠবে না। কিন্তু আপনাদের এই ত্রুটিগুলো দুর্গন্ধ হয়ে ভেসে বেড়াবে।' আর বললাম, 'যা কিছু করবেন একটু ভেবেচিন্তে করবেন। আপনাদের উপদেশ দেয়া তো সাজে না।'

পাবনা আটঘরিয়ার মওলানা বেলাল আমাদের সংগঠনেরই একজন। তিনি একাত্তরের তথাকথিত চেতনার শিকার। প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন তিনিও। ১০, সেল ডিভিশনের এক কোণে আমার সাক্ষাতে আব্দুল খালেক মজুমদারের উদ্দেশে রাগতভাবে বললেন, 'আপনি সংগঠনের একজন নেতৃস্থানীয় লোক হয়ে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে কী করে টাকা নিলেন? ঐ টাকা কি আপনাকে তারা বকশিশ দিয়েছে? এতে কি সাধারণ কয়েদীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? আপনি বলুন হলপ করে বলুন যে, কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আপনি টাকা নেননি?' আব্দুল খালেক মজুমদারকে নীবর থাকতে দেখেছি। দেখেছি রাগে দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় বিমূঢ় হতে। আবারও আমি খালেক ভাইকে সংগঠনের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সংযত হতে বললাম। প্রতিবাদী কণ্ঠ বেলাল ভাইকে বললাম 'এ নিয়ে আর এগুবেন না।'...

সব চাইতে বেশি আমি ঘৃণা করতাম তার কাপুরুষোচিত অভিব্যক্তি। আমি মনে করি একজন মুসলমান জীবনের সঙ্কটে অথবা কোন দুর্বল মুহূর্তে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু বুঝদীল হতে পারে না। যখন কেউ মনে করবে পুরস্কার ও শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ্ এবং কিসমত যখন নির্ধারিত হয় ওপরে। জিন্দেগীর ফায়সালা যখন আসে লওহে মাহফুজ থেকে তখন একজন ইমানদার মুনাফেক ও কাফেরদের পদচারণায় ভীতসন্ত্রস্ত হবে কেন? অথচ তাঁকে দেখেছি কারাগারের নিভৃত কোণেও তটস্থ থাকতে। হতে পারে আগে যে অমানুষিক জুলুম আর অত্যাচার তাঁর ওপর হয়েছে তা থেকেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই ভীতি।

কারগারে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে আমাকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। তাদের সাথে আমার বিরোধ শুধুমাত্র আদর্শগত। আমি জেলখানায় দাওয়াতী ও তরবিয়তী প্রোগ্রাম বলতে গেলে ভালমতো চালু করেছি। খালেক ভাইয়ের উচিত ছিল আমার পাশে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো। অথচ আমি তাঁকে তেমনভাবে পাইনি। বরং আমার আবেগ আর অনুভূতিকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন–কারাগারে আমার অবস্থান থেকে একটু পিছু হটে আসতে। একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। কারাগারে কিভাবে তিনি সন্ত্রস্ত থাকতেন। একদিন আমি তিন রাস্তার এক মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলছি। বলছিলাম–আওয়ামী লীগ আমাকে টার্গেট করে তাদের ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। ডিআইজি পর্যন্ত আমাকে নিয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এতে শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কায় ডিআইজি হয়ত এখান থেকে আমাকে অন্য কোন জেলে পাঠিয়ে দেবেন। যেটা আওয়ামী লীগ চায়। এমনটি হলে তারা সফল হবে। আমরা হব ব্যর্থ। আমাদের মিশনও হবে ব্যর্থ। আমাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। 'আপনি তো আমাদের নেতৃস্থানীয়।

বাইরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যায় কিনা?' তিনি কি বলতেন জানি না। দূর থেকে রুহুল আমিন ভূঁইয়াকে দেখে আড়ালে সরে গেলেন। বুঝলাম ভীতি তাঁকে পেয়ে বসেছে। আমাদের সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ রয়েছে অথবা আমাদের জন্য কোন অনুভূতি রয়েছে এমনটি প্রতিপক্ষের কাছে ধরা পড়ুক তিনি তা চাইতেন না।

রুহুল আমিন ভূঁইয়া চলে যাওয়ার পর তিনি আবার এলেন। আমি তাঁকে বললাম—'প্রাচীরের আড়াল হয়ে কি পরিচয় লুকাতে পারবেন, নাকি আমাদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে তাদের সহানুভূতি পাবেন? সহানুভূতি পাবার কোন সম্ভাবনা থাকলে মিথ্যা মামলায় আপনাকে ওরা জড়াত না। নেতার এমন আচরণের প্রকাশ ঘটলে কর্মীরা তো দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্তত আপনার কাছে আমি এমনটা আশা করি না। কাপুরুষতা আর বুঝদীলির নাম হিকমত নয়।' তিনি লা জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

ওদিকে মেজর জয়নাল আবেদীন একটি বই লেখায় হাত দিয়েছেন। তিনি মনে করলেন আব্দুল খালেক মজুমদার তার সহযোগী হলে তার কাজে সুবিধা হবে। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমার কাছ থেকে খালেক সাহেবকে তাঁর নিজের সান্নিধ্যে টেনে নিলেন। আলবদরের ডেরা থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে খালেক ভাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।"

৪. শফিউল আলম প্রধান ঃ " তার ভারতবিরোধী চেতনা আমাদের মতোই মজবুত।"

৫. অলি আহাদ ঃ "হিন্দুস্তানবিরোধী একটি বলিষ্ঠ বিবেক একটি সংগ্রামী চেতনা, একটি সোচ্চার কণ্ঠ।" এনএসএফ নেতা সৈয়দ নেসার নোমানী আমিনুলকে পরিচয় করিয়ে দেন অলি আহাদের সঙ্গে। অলি আহাদ তাঁকে আবার পরিচয় করিয়ে দেন যাদু মিয়ার সঙ্গে।

৬. মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) আমিনুলকে বলেছিলেন, "তোমাদের ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। বাতাস উল্টো বইছে। জেল থেকে বেরিয়ে আমরা ব্যাপক গণআন্দোলনে নামব। ঐ জালেম মুজিবের তকতে তাউস ভেঙ্গে আমরা খান খান করে দেব। এ দেশের মাটিতে হিন্দুস্তানের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে, তোমরা দেখে নিও।... মুজিব তাঁর নাটকের শেষদৃশ্যে এসে গেছে।"

৭. মেজর (অব) জলিল ঃ "জাতীয় স্বার্থ এবং আদর্শ বিরোধী অভীষ্ট অর্জনের জন্য জাসদের নায়কেরা এবং আসম আবদুর রব স্বয়ং দেশপ্রেমিক মেজর জলিলের ভারতবিরোধী ইমেজ চাতুরীর সাথে ব্যবহার করেছেন।"

৮. আসম আবদুর রব ঃ "তাঁর সদম্ভ অভিব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করতাম একাত্তরের আগে থেকে। মালেক হত্যার নেপথ্যেও তিনি ছিলেন। আদিম স্বৈর মানসিকতার বহির্প্রকাশ তাঁর প্রতিটি বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন তিনি বলেন, 'আমি মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা দিয়েছিলাম আমিই আবার প্রত্যাহার করে নিলাম। এ যেন ছেলের হাতের মোয়া।" রব জেলে পরীক্ষা দেবার সময় নকল করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেন।

৯. খাজা খয়ের উদ্দিন ঃ " আমি এই দেশ, এই বাংলার মাটিতে আর নয়। আমাকে শূন্য হাতে যেতে হলেও কারামুক্তির পর এ দেশ থেকে হিজরত করব। এ দেশ আর সেই দেশ নেই। মুর্শিদাবাদ হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের দেশপ্রেমিক সম্মানী ব্যক্তিত্বগুলো যেমন মুনাফেক গাদ্দারের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, তেমনি দু' শ' বছর পর এ দেশের হাওয়ায় মুর্শিদাবাদের গন্ধ।"

১০. এ্যাডভোকেট শফিকুর রহমান ঃ "শেখ মুজিব আমাদের চেয়ে বেশি অসহায়। তাঁর ইচ্ছা-সদিচ্ছা যাই থাক না কেন, তাঁর করার কিছু নেই। হিন্দুস্তানী চক্রের কাছে তাঁর হাত-পা বাঁধা। তাঁর চারপাশে রুশ-ভারত চক্র এমন ব্যূহ রচনা করে রেখেছে যে তা থেকে তিনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সন্ত্রাস আর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে কোন্ শাসক না চায়? কিন্তু চাইলেই সেটা করা সম্ভব নয়। এটা করলে মুজিব যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা ধসে পড়বে। আর সেও নিক্ষিপ্ত হবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সেনাবাহিনী ময়দানে নামিয়ে সে চেষ্টাও তো করেছিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হয়। এর চেয়ে বড় কথা হিন্দুস্তান বাংলাদেশকে এক অরাজক পরিস্থিতির দিকে টেনে আনতে চাচ্ছে এবং সেটা সুপরিকল্পিতভাবে। হিন্দুস্তানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও বাংলাদেশকে দৈন্য-দুর্দশা ও অরাজকতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। রুশ-ভারত চক্র থেকে দেশটাকে মুক্ত করা মুজিবের পক্ষে সম্ভব নয়। মুজিব আস্ফালন, তর্জন-গর্জন এবং গালভরা বক্তব্য যা কিছুই করুক না কেন ইন্দিরার চোখের দিকে চোখ রেখেই সেটা করতে হয়। বলতে গেলে মুজিব এখন একটা রোবট, এর রিমোট কন্ট্রোল ইন্দিরার হাতে।"

১১. ফজলুল কাদের চৌধুরী : ...এই শার্দুল নেতার কণ্ঠরোধ করার জন্য সম্ভবত হিন্দুস্তানের কালোহাত, কারাপ্রাচীর আর লোহার গরাদ ভেদ করে ক্ষুদ্র সেল প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কারাগারের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি যতটুকু জেনেছি– এক কম্পাউন্ডার দ্বারা জনাব চৌধুরীর দেহে সিরিঞ্জ দিয়ে বিষ প্রয়োগ করা হয়। এই বিষক্রিয়ার ফলে ফজলুল কাদের চৌধুরী মুসলিম বাংলার এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, শাহাদাতবরণ করেন। তার সমস্ত শরীর নাকি

নীল হয়ে গিয়েছিল। মুজিব প্রশাসন পরবর্তীতে সেই কম্পাউন্ডারকে সরকারী খরচে তাঁর সচেতন গুনাহ মাফের জন্য হজে প্রেরণ করে।"

আমিনুল যাঁদের কথা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন খাস রাজাকার। এদের মধ্যে খাজা খয়েরের উক্তিটি দেখুন। শান্তি কমিটির প্রধান বলছেন, "রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ"কে সম্মান দেখান হচ্ছে না। আগেই উল্লেখ করেছি, রাজাকাররা এ ধরনের উক্তি প্রায়ই করেছে। কিন্তু কখনও এ কথা আসেনি যে, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা তাদের "রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ"-এর কথা দূরে থাকুক সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী আচরণ করেছে। বিপাকে পড়লেই তারা আশা করে শত্রুর সঙ্গে বন্ধুর আচরণ। ফজলুল কাদের সম্পর্কে যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তা গল্পই। আমরা বরং শুনেছি, ফজলুল কাদের চৌধুরীকে জনরোষ থেকে বাঁচাবার জন্যই শেখ মুজিব তাঁকে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন।

এ ছাড়া উপর্যুক্ত যেসব ব্যক্তির কথা আমিনুল আলোচনা করেছেন তারা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে রাজাকারি দর্শনে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাদের কার্যকলাপ আমাদের অজানা নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি খাস রাজাকার ও রাজাকারি দর্শনে দীক্ষিতদের সঙ্গেই আমিনুলের পরিচয় হয়েছিল এবং তাদের প্রশংসাও তিনি কোন না কোনভাবে করেছেন, রব ও খালেক ছাড়া। তবে এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন দল করলেও তাদের মতাদর্শে তেমন কোন ভিন্নতা ছিল না। রাজাকারই চেনে রাজাকারের মন।

## ৩৫

এরি মধ্যে চলে এলো ১৫ আগস্ট। এ ঘটনা শুনে রাজাকার কী মুনাজাত করলেন তা বলি–"ইয়া মাবুদ, তুমি ছিলে, তুমি এখনও আছ। তুমি কোন ব্যাপারে গাফেল নও। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। তুমি আধুনিক দুনিয়ার নব্য নমরুদ-সাদ্দাদের পতন ঘটিয়ে প্রমাণ করলে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই সমস্ত সার্বভৌমত্বের মালিক।" রাজাকারের মন কেমন নির্দয় বা নিষ্ঠুর এ মুনাজাত তার প্রমাণ। কোন রাজাকার ১৯৭১-এর পর মারা গেলেও শুনিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ এমন মুনাজাত করেছেন। সেখানে শিশু, মহিলাসহ একটি পরিবারকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার পর যদি কেউ এ ধরনের মুনাজাত করে তাকে কী অভিধা দেয়া যায়? এখানেই শেষ নয়,

হত্যাকারীদের বিষয়ে তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে–'ইয়া মাওলা, এই বীর সৈনিকদের হাতগুলো মজবুত করে দাও, হিম্মত দাও এদের বাহুতে।' নারী-পুরুষ যে হত্যা করে সে বীর হয় কীভাবে? তবে এ ধরনের উক্তি কিন্তু এখনও শোনা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখে। এর যোগসূত্র ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭৫ সালের পর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক অনেককে কারাগারে নেয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আমিনুলের কথোপকথনের বিবরণ আছে। এঁদের অনেকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় বলে উল্লেখ করেছেন। মুজিব হত্যাকাণ্ডে যে তাঁরা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তা ঐ বিবরণ থেকে বোঝা যায়।

আগরতলা মামলার আসামী আহমদ ফজলুর রহমানের সঙ্গে তার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতাকালে আমিনুল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকার একটি অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। তার মতে, আওয়ামী লীগ বিহারীদের ওপর 'বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড' ঘটিয়েছে। "গণউত্তেজনা সৃষ্টি করে শত শত ইপিআর, সেনাবাহিনীর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে ছাগলের মতো হত্যা করা হয়েছে। এর পরও সশস্ত্র বাহিনী তাদের হত্যাকারীকে চুমু খাবে? এমনটি হবে না জেনেই আওয়ামী লীগ ইচ্ছা করে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তারা চেয়েছিল সেনাবাহিনী জনগণকে অত্যাচার করুক। তাহলে তারা হিন্দুস্তানে যেতে বাধ্য হবে। এই দুর্বলতার সুযোগে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে অস্ত্র।"

প্রথমত, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 'শত শত' লোককে হত্যা করা হয়নি। যদি হতো তাহলে পাকিবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা চালাতে পারত না। দ্বিতীয়ত, ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীই নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যারা আগে থেকে সতর্ক ছিল তারা বেঁচেছে এবং যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের আত্মরক্ষার্থেই করতে হয়েছে। তৃতীয়ত, কথিত হত্যাকাণ্ডের কারণে পাকিবাহিনীরা যদি কথিত হত্যাকারীকে 'চুমু' না খায় তাহলে আলবদরদের হত্যাকাণ্ডের জন্য তাদের 'চুমু' খাওয়া হবে কেন? কেন প্রতিটি রাজাকার তাদের বইতে লিখেছে তাদের প্রতি 'অমানবিক' ব্যবহার করা হচ্ছে? 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে অমানবিক ব্যবহার করা অনুচিত'–এ অভিযোগ কেন তারা করছে? এই যুক্তি ধরেই বলা যায়, হত্যাকারী তো হত্যাকারীই, সে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয় কীভাবে?

আমিনুল তার বক্তব্যের রেশ ধরে আরও বলেছিলেন, "পাকিস্তান ছিল জনগণের রায়। এটা চাপানো কোন বস্তু ছিল না। আপনারা এই রায়কে পাল্টে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের অপরাধ নৈতিকতার মাপকাঠিতে কী পর্যায়ের ভেবে দেখেছেন কি? অথচ যারা সেই রায়কে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেছে তারাই দেশের শত্রু, আপনাদের পরিভাষায় দালাল।"

পাকিস্তান যদি জনগণের রায় হয়, বাংলাদেশও জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান যত লোক চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি মানুষ বাংলাদেশ চেয়েছিল। তাহলে একই যাত্রায় পৃথক ফল হলো কেন?

আহমদ ফজলুর রহমান ও কামাল (পরিচয় জানা যায়নি। আগরতলা মামলার কি?) তাঁদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। সেনাবাহিনীর ঐ সদস্যদের সঙ্গে মিল আছে নাকি আদর্শের, যে আদর্শ পাকিস্তান থেকে ধার করা। সে জন্যই আগে উল্লেখ করেছি, মুক্তিযুদ্ধ করলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব নয় যদি মনের গহীনে রোপিত থাকে রাজাকারি আদর্শ।

আহমদ ফজলুর রহমান বলেছিলেন–"পশুসুলভ আচরণ করা হয়েছে আমাদের ওপর। উল্টো করে টাঙ্গিয়ে চাবকাল তারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত। সব চাইতে বড় কথা, তারা যে ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেটা বাংলা নয় উর্দুতে। মনে হলো আমি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী।"

কামাল বলেছিলেন, সেই সব সৈনিকের "নির্মমতা পাকিস্তানীদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের ওপর তাদের যেন এক আদিম আক্রোশ জমে ছিল। পাকিস্তানী মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ আজও সেনাবাহিনী দখল করে আছে।"

এর বিপরীতে আমিনুলের ভাষ্য "মুক্তিফৌজরা গ্রামবাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে জাতীয় বিবেকগুলোকে ধ্বংস করার জন্য।"

আরও অনেকের সঙ্গে আমিনুলের আলাপ হয়েছে জেলে। কোরবান আলী তাঁকে বলেছিলেন, জেল থেকে বেরিয়ে তিনি জামায়াতে ইসলাম করবেন। এতে কতটুকু সত্যতা আছে জানি না। তবে কোরবান আলী পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ময়মনসিংহ জেলে তোফায়েল আহমেদ নাকি তাকে বলেছিলেন, "আমিন, আমরা কি একাত্তরে ভুল করেছিলাম?" তোফায়েল আহমেদ এ কথা বলতে পারেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমিনুলের ক্রোধ বেশি হিন্দু জেলার নির্মল রায়ের প্রতি। হিন্দু ধর্মের হওয়ায় জনৈক সেকশন অফিসার রাখাল বাবুর ওপরও তার ক্রোধ ছিল। কিন্তু ক্রোধ বেশি ছিল অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের প্রতি। কারণ, মযহারুল ইসলাম তাকে পাত্তা দেননি এবং সবাইকে পরামর্শ দিতেন রাজাকারদের এড়িয়ে চলার জন্য। সে কারণে, মযহারুল ইসলাম সম্পর্কে আমিনুলের মন্তব্য, "তার রবীন্দ্রপ্রীতির আতিশয্য এত অধিক ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেটা পরিবর্তিত হয়ে হিন্দুপ্রীতিতে পরিণত হয়। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ পেয়েছিল পুরোপুরি। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহন করার ব্যাপারে এতটুকু সংশয় ছিল না। কোন জাতির মগজে পচন ধরলে সে জাতির

অধঃপাত ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার সাথে [তাঁর] মতবিরোধের প্রেক্ষিতে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, আওয়ামী লীগের কেউ যেন আমার সাহচর্যে না আসে আওয়ামী লীগ নেতারা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এটা হয়েছিল ডক্টর মযহার সাহেবের ইঙ্গিতে।"

নির্মল রায় সম্পর্কে মন্তব্য, "নির্মল রায় একাত্তরের সঙ্কটেই ভারতে পাড়ি না জমিয়ে হিন্দুস্তানের সপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য দুঃসাহসে ভর করে ঢাকায় যায়।" নির্মল রায়ের অপরাধ হিন্দু হয়ে কেন তিনি ভারতে যাননি। অর্থাৎ বাংলাদেশ মুসলমানদের জন্য, হিন্দুদের জন্য নয়। রাখাল ভট্টাচার্য সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা কল্পকাহিনী মনে হবে। প্রতিপক্ষ বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে রাজাকাররা এ ধরনের গল্পের অবতারণা এখনও করে। কীভাবে রাজাকার আমিনুলরা দেখেছেন হিন্দুদের তার আরেকটি বিবরণ– "একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ের কোন হিন্দুর বাংলাদেশে থাকার কথা নয়। অথচ তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলমানদের ছদ্মাবরণে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। কালামে পাকের অনেক সূরা অর্থসহ তাঁর জানা। নামাজের নিয়ম-পদ্ধতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। একাত্তরে তিনি বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়িয়েছেন। এমনকি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট মসজিদে ইমামতি করেছেন বলেও তিনি আমাকে জানান। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার অনেক আগে থেকে তিনি হিন্দুস্তানের সপক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে 'লরেন্স অব এরাবিয়ার' মতো বাংলাদেশের মুসলমানদের মগজে ঘুণ ধরিয়েছেন। ভাল মানুষগুলোকে পাকিস্তানের শত্রু চিহ্নিত করে হত্যা করিয়েছেন। এ দেশের তথ্য হিন্দুস্তানে পাচার করেছেন। তার মুসলিমবিদ্বেষী জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি কারাগারের অভ্যন্তরেও। এখানে মুসলমান অবুঝ তরুণদেরকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

আমি একদিন আমার সেলে বিশ্রাম নিচ্ছি। একটা উত্তেজিত কণ্ঠ আমার কানে এলো। বলতে শুনলাম—"আমরা একাত্তরের আলবদর, রাজাকার আর শান্তি কমিটির লোকদের ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। সামনের দিনগুলোতে আমরা আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। বঙ্গবন্ধু এদের জেলে পাঠিয়ে রক্ষা করেছেন। ওরা জেলখানাকে ট্রেনিং সেন্টারে পরিণত করেছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, কি দুঃসাহস! একাত্তরের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ওরা জেলখানায় বীজ বপন করছে। ওদের ক্ষমা করা আর ঠিক হবে না।"

আজ ত্রিশ বছর পর মনে হয়, রাখাল ভট্টাচার্য যদি সে কথা বলেই থাকেন তাহলে কি খুব ভুল বলেছিলেন? গল্পের এখানেই শেষ নয়। আমিনুল নিজের সেল থেকে বেরিয়ে দেখেন এ উক্তি রাখালের। আমিনুল রাখালকে বলেন,

"এটা একাত্তর নয়, ছিয়াত্তর, একাত্তরে অন্ধ তরুণ, যাদের দিয়ে জঘন্যতম কাজ করিয়েছেন। তাদের বিরাট অংশ এখন আমার পাশে।"

আমিনুলের এই উক্তির প্রথম লাইনটি ঠিক। '৭৫ সালের পর থেকে নতুন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়, যার নাম পাকি-বাংলাদেশ হলেও তাদের আপত্তি হতো না। '৬৯-৭১ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আদর্শ তরুণরা গ্রহণ করেছিল, '৭৫-এর পর থেকে পাকি-বাংলা নামে একটি আদর্শ জোর করে চাপিয়ে দেয়া হলো। ঐ সময়ের পাঠ্য বই, টিভি/সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণা তার উদাহরণ।

এ প্রসঙ্গে আমিনুল আরেকটি মন্তব্য করেছিলেন যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। লিখেছেন তিনি, '৭৫ সালের পর আওয়ামী ও আওয়ামী সমর্থক বন্দীতে জেল ভরে উঠতে লাগল। জেলে আমিনুলরা হটে যেতে লাগল, তাদের ভাষায়, আওয়ামীদের উদ্ধত আচরণের কারণে-"আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী উদ্ধত আচরণের আর একটি কারণ হলো পঁচাত্তরে আওয়ামী প্রশাসনের পতনের পর থেকে ক্রমশ কারামুক্তির ফলে আমাদের সংখ্যা কমতে থাকে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে গ্রেফতার হয়ে আওয়ামী সমর্থকদের সংখ্যা বেড়ে যায়।"

আওয়ামী লীগের শাসনে আল-বদর বা রাজাকাররা অন্তত জেলে ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের মানুষরা জেলে ছিল আর রাজাকারদের মুক্ত করা হয়েছিল।

১৫ আগস্টের পর বড় ঘটনা জেলহত্যা। রাজাকাররা কি খুশি হয়নি জেল হত্যায়? হয়েছিল। তবে, সেই খুশিটা প্রকাশের ভাষা ছিল অন্য। আমিনুল জেলহত্যা সম্পর্কে লিখেছেন, "এটা অমানবিক বর্বরতা। এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিকে আমরা ঠেকাব কি দিয়ে। একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ বালির বাঁধকে ভেঙ্গে দিতে পারে। আশ্চর্য হলাম দু'শ' বছর পর একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখে। মোহাম্মদী বেগরা অপঘাতে মরবে এটাই তো স্বাভাবিক।"

এ প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমান ও খন্দকার মোশতাককে রাজাকাররা কীভাবে মূল্যায়ন করেছে দেখা যাক। আমিনুল ছাড়া অন্য রাজাকাররা এ বিষয়ে খুব একটা আলোকপাত করেননি।

জিয়া সম্পর্কে রাজাকারদের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। জিয়া ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে হয়ত তাঁর ভূমিকাও থাকতে পারে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল কর্নেল ফারুকের, খন্দকার মোশতাকের। সুতরাং শেষোক্তদের বিশ্বাস করা যায়। জিয়া সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল, জিয়া তাদের লোক ঠিক আছে। হয়ত পাকিস্তান-বাংলা আদর্শকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতাও পাকাপোক্ত করবেন কিন্তু প্রয়োজনে তাদের আবার

ত্যাগও করতে পারেন নিজের সুবিধার জন্য। এ বিষয়ে আমিনুলের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলেই তা প্রমাণিত হবে।

"পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের ঝুঁকি গ্রহণকারী তরুণ সেনা নায়করা দেশের মাটিতে আর নেই। দারুণভাবে দুঃখ পেলাম। মনে হলো সেই জানবাজদের কাছে জাতির অনেক পাবার ছিল। দেশের প্রতি জাতির প্রতি ঐকান্তিক দরদ ছিল বলেই তারা চূড়ান্ত কোরবানির প্রস্তুতি নিয়ে মুজিবকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের তত্ত্বাবধানে তিন মাসের বাংলাদেশ অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের বাংলাদেশ। তাদের সদিচ্ছা তাদের প্রাণের স্পর্শের সাথে কারও তুলনা করা যাবে না। জিয়ার ক্ষমতারোহণ, এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। কেননা দেশের পটপরিবর্তনে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু পরিস্থিতির সুফলটা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আমার মনে হয়েছিল পঁচাত্তরের চেতনা তাঁর মধ্যে নেই বলে ক্ষমতায় আট-ঘাট হয়ে বসবার চিন্তা-চেতনা দ্বারাই তিনি চালিত হবেন। অর্থাৎ আদর্শ নয়, ঐতিহ্য নয়, জাতি নয়, দেশ নয় তাঁর কর্মের কেন্দ্রবিন্দু মসনদ। ফাঁসির সেলে বসে জিয়া সম্বন্ধে আমার যে ধারণার উন্মেষ হয় জিয়া তার শাসনকালের প্রতিটি কর্মে অনুরূপ স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথমত, পঁচাত্তরের নায়কদের বাংলাদেশে আসতে দেননি। আসলেও তাদেরকে জুলুম নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিচারপতি সায়েমকে সরিয়ে তিনি নিজেই মসনদে সমাসীন হয়েছেন। তৃতীয়ত, বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তোয়াবকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছেন। কেননা এ দেশটাকে ইসলামী দেশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাঁর সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করা সত্ত্বেও কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন বিমানবাহিনী অফিসারদের হত্যা করিয়েছেন। শত শত তরুণ সামরিক অফিসার ও জোয়ানকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। শত শত সৈনিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। রাজনীতিকদের তেজারতের মালে পরিণত করেছেন। তাঁর শাসনামলে রাজনীতিকদের কেনা-বেচা শুরু হয়। তিনিই সেনাবাহিনীকে রাজনীতির মোহে আবিষ্ট করেছেন। তাঁর ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ না করে ভাঙনের দিকে নিয়ে যায়। বিসমিল্লাহর ছত্রছায়ায় তিনি ইসলামী চেতনাকে নস্যাত করার সুযোগ করে দেন। কর্নেল নাসেরের মতো একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার লক্ষ্যে তাঁর সমস্ত কাজ বিঘূর্ণিত হতে থাকে। সরকারী ব্যয়ে তরুণদেরকে তাঁর রাজনীতির মুখাপেক্ষী করে তোলেন। সবচেয়ে বড় কথা এ দেশটার স্বকীয় সত্তার বিকাশ না ঘটিয়ে আমেরিকা ও রুশ-ভারত অক্ষশক্তির চারণভূমিতে পরিণত করেন।"

এরপর আমিনুল ইরান যান। ইরানী বিপ্লব তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। তারপর যান মক্কা। সেখানে ইরানী বিপ্লবের পক্ষে হাজীদের মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করেন। আমিনুলের কাহিনী এখানেই শেষ।

১৯২ পৃষ্ঠার বইটি পড়ে জানা গেল, আল-বদররা দেশের জন্য কাজ করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল কিন্তু যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। এই পরাজয় সাময়িক। রাজাকারদের অন্যভাবে চিত্রায়িত করা হয় যা ঠিক নয়। এগুলো স্বল্প কিছু লোকের কারসাজি। রাজাকারি জজবার প্রতি লোকের আস্থা আছে, এমনকি বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজনীতিবিদদেরও। সচেতন পাঠক যদি না হন তাহলে 'আমি আলবদর বলছি' পড়ে এই ধারণাই হবে। এবং মনে হবে, 'রাজাকার ছিল তো কি হলো?' এই মনে হওয়াটাই বিপজ্জনক। এই মনে হওয়ার অর্থ রাজাকারির দিকে এক পা এগোনো এবং পাকিস্তান-বাংলা আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রথম ধাপ। আর সব রাজাকার এ ধারণাটিই সবার মধ্যে আগে সঞ্চারিত করতে চায়।

## ৩৬

সা'দ আহমদ পেশায় অ্যাডভোকেট। এখন তার নাম ডাক তেমন শোনা যায় না বটে কিন্তু ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার রাজাকার হিসেবে মশহুর ছিলেন তিনি। শান্তি কমিটির প্রধান হিসেবে কুষ্টিয়া অঞ্চলে যা যা করার তা করেছিলেন। স্বাধীনতার পর গ্রেফতার হন, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তারপর সাধারণ ক্ষমায় ছাড়া পেয়ে যান। ১৯৯০ সালে তার লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়, নাম *মুজিবের কারাগারে পৌনে সাত'শ দিন*।

কী বলতে চেয়েছেন তিনি ? তার ভাষায়–"এই বইতে কারাজীবনের কাহিনীই শুধু ভাষায় রূপ পায়নি, এতে স্থান পেয়েছে এই দেশের একটি অধ্যায়ের ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস, একটি নূতন রাজনৈতিক ভূখণ্ডে সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনের করুণ আর্তনাদ, সর্বনাশা বিভেদ ও অনৈক্যের সয়লাব এবং নব্য শাসক ও শোষকের 'পৌনেসাতশ' দিনের সীমাহীন লুণ্ঠন ও নির্যাতনের কাহিনী।"

এবার শব্দগুলি অনুগ্রহ করে লক্ষ করুন। তিনি স্বাধীনতার পর দুই বছরের কাহিনী মূলত বিধৃত করতে চান যেখানে শাসক ছিলেন 'শোষক'। এবং সে সময়টা ছিল 'সীমাহীন লুণ্ঠন ও নির্যাতনের সময়। যখন বাংলদেশে

খালি শোনা গেছে 'সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনের করুণ আর্তনাদ।' এর আগে বা ঠিক ১৯৭০-৭১-এ সময়টা কী ছিল ? নিশ্চয় সুসময়,-তাই বলতে চান সা'দ আহমদ।

অন্যান্য রাজাকার স্বাধীনতার পর যা আশা করেছিলেন সা'দ আহমদও তাই চেয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ হবে আবার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগের মতো। ১৯৭১ এ কী হয়েছিল তা কেউ মনে রাখবে না। ভাই বুকে জড়িয়ে ধরবে বোনের ধর্ষণকারিকে, পিতা কাঁধে হাত রাখবে পুত্রের হত্যাকারীর, বিধবা স্ত্রী সানন্দে আসন পেতে দেবে স্বামীর হত্যাকারীকে। কেন তা হলো না এটিই তার বা তাদের বড় ক্ষোভ। লিখেছেন সা'দ—

"দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনের ধারা প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গণতান্ত্রিক দেশে মতপার্থক্য স্বাভাবিক তবে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে কারও মনে কোন দ্বিমত ছিল না। আশা ছিল পৃথিবীর মানচিত্রে যে নূতন দেশের পত্তন হল তাকে গড়ে তোলবার ডাক পড়বে সবার। অতীতের রাজনৈতিক মত পার্থক্যের দরুন নূতন রাষ্ট্রশক্তির ছোবল দিয়ে কাউকে দংশন করা হবেনা, আর সমৃদ্ধি ও উন্নতির পূর্বশর্ত শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিজয়ী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দলমত নির্বিশেষে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবেন। কিন্তু নূতন রাজনৈতিক ভূখণ্ডে নব্য শাসকরা সেবা, ভালবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধনে সর্বস্তরের মানুষকে না বেঁধে শুধুমাত্র ঘৃণা, আক্রোশ ও প্রতিশোধের বহ্নি জ্বালিয়ে যাত্রা শুরু করলেন এবং সাড়ে তিন বছর শাসন ও শোষণ করে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলেন।"

সমস্যা হচ্ছে এতদিন পরও আবার দালাল-অদালাল কথা তোলা হচ্ছে। এ সব না তুলে জিয়াউর রহমানের মতো কেন সমন্বয়ের রাজনীতি করা হচ্ছে না এ ক্ষোভটা তার প্রকট। মনে রাখা দরকার যে সেই সময় নতুন করে ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে দলমত তৈরি হচ্ছিল। বিষয়টি পছন্দ হয়নি রাজাকারদের। তাই সা'দ আহমদ ভূমিকায় লিখেছেন—

"দেড় যুগ পর তাদের উত্তরসূরীদের উৎকট পদধ্বনি আবার নূতন করে শ্রুত হচ্ছে নিজেদের দুষ্কৃতিকে আড়াল করার প্রচেষ্টায় 'দালাল'-'অদালালের' পার্থক্য সৃষ্টির পুরানো হাতিয়ারকে ধারাল করে জাতীয় ঐক্যের ফাটল ধরানোর উন্মত্ত খেলায় তারা মেতে উঠেছে। বৈরী প্রতিবেশীর আগ্রাসী থাবার মোকাবিলায় দুর্জয় জাতীয় ঐক্য যে মুহূর্তে বেশী কাম্য সেই সময়কেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই সর্বনাশা খেলার জন্য। আদর্শহীন ও লক্ষ্যহীন সরকারের প্রচারযন্ত্রও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। রাষ্ট্র পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতা, জনগণের ধূমায়িত অসন্তোষ, বিপর্যস্ত জনজীবনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ঢাকা

দেবার কৌশল হিসাবে প্রতি বছর ঘটা করে 'দালালদের কে কোথায়' প্রচারের নামে রেডিও, টিভি, পত্রিকা মারফত ঘৃণা ও প্রতিশোধের বহ্নিকে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা চরছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তীর ১৯ বছর পরও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচারণার শিকার।"

সা'দ লিখেছেন–"সময়' বা 'কালই' হচ্ছে সাক্ষী, সময়ই ইতিহাস হয়ে তার বিশাল পাঠাগারে সব কিছু ধারণ করে রাখে। তাই তথাকথিত 'দালালদের' একটি বক্তব্য ইতিহাসের পাঠাগারে অবশ্যই রক্ষিত থাকা উচিত" এবং সে কারণেই এই গ্রন্থ রচনা। আর রাজাকাররা কীভাবে ভ্রান্ত দলিল রেখে যাচ্ছে তা তুলে ধরার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

## ৩৭

বারো অধ্যায়ের ১৯২ পাতার বই *মুজিব কারাগারে পৌনে সাত'শ দিন*। বইটি উৎসর্গ করেছেন তার স্ত্রী ও "সেই সব সংগ্রামী বন্ধু, সাথী ও মর্দে মুজাহিদদের উদ্দেশে, যাদের ত্যাগ কোরবানী ও ঝরানো রক্তে এই দেশে তাওহিদের আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে হাজার কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছে" ইত্যাদি। অর্থাৎ ১৯৭১-এ যারা সাথী ছিল তারা অর্থাৎ রাজাকাররা। এখানেই সে কথা আবার প্রমাণিত হয়—যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার। রাজাকারি ভোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে আড়াই দশক পর জেনারেল নিয়াজী তার লেখা বই উৎসর্গ করেন রাজাকারদের।

সা'দ আহমেদের কাহিনী শুরু ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। জনতা চলছে রেসকোর্সের দিকে। মতিঝিলের একটি ইমারতে বসে সা'দ বিষণ্ন মনে তা দেখছেন এবং তার মনে হয়েছে–"শুধুমাত্র কয় বিঘা জমি নিয়ে একটি দেশের জন্য গর্ব করার কিছু নেই। একটি দেশের আসল বস্তু হচ্ছে মানুষ। মানুষ এখানে সুখী কিনা, শোষণমুক্ত কিনা, সামাজিক বিচার ও ন্যায়নীতি এ সমাজে আছে কিনা এটাই দেখার বিষয়। বেইনছাফীতে ভরা একটি বিরাট ভূখণ্ডের চাইতে ইনছাফ ও কল্যাণ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বর্গমাইলের একটি রাষ্ট্রও অনেক শ্রেয়।" এখানেই প্রশ্ন ওঠে পাকিস্তানে ইনসাফ ছিল কিনা? ছিল না। তা' হলে সা'দ আহমদদের পাকিস্তান নিয়ে গর্ব করার কি আছে? মানুষ যদি একটি দেশে আসল হয়, তা' হলে মুষ্টিমেয়

কয়েকজন ছাড়া সবাই বাংলাদেশ চেয়েছিল এবং সে আশা যদি পরিপূর্ণ হয় তা'হলে নতুন রাষ্ট্রে গর্বিত না হওয়ার কি থাকতে পারে। জানি, সা'দ এর কোন উত্তর দিতে পারবেন না।

নতুন সরকার আসার পর কি হলো ? "কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাবে পাক বাহিনীকে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ক্ষতিসাধনে সাহায্যকারী ছাড়াও নিষিদ্ধ দলগুলোর সদস্য ও কর্মী যারা অতীতে আওয়ামী লীগের মতাদর্শের সাথে একমত হতে পারেনি, উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উর্দুভাষী জনসাধারণ, পাক আমলে অনুষ্ঠিত স্কুল কলেজের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী, রেডিও টেলিভিশনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ, বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ ইত্যাদি সবাইকে দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করা শুরু হল।" বাক্যটি লক্ষ্য করুন। মুক্তিযুদ্ধ কি আওয়ামী লীগের ছিল, না আপামর জনসাধারণের ছিল ? আর যে সব কর্মের কথা তিনি বলেছেন তাতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা কি একধরনের সহযোগিতা করেনি পাকিস্তানী হানাদারদের। যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাদের'দালাল না বলে কী আখ্যা দেয়া যেতে পারে ?

তারপর 'ভয়াবহ খবর' সব পেতে থাকলেন সা'দ। যে সব অঞ্চল "ভারতীয় সেনাদের দখলে চলে যায় সেখানে পাইকারী হত্যা ও নির্যাতন শুরু হয়েছে সংজ্ঞাবিহীন দালালদের উপর।" অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীও এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু, অনেক রাজাকারই তাদের কাহিনীতে জানিয়েছেন ভারতীয় বাহিনী তাদের 'প্রটেক্ট' করেছে। আর পাইকারিভাবে দালাল নিধন করতে পারলে তো আজ ত্রিশ বছর পর আবার দাবি উঠত না ঘাতকদের বিচারের। সা'দ আহমদের মনে হয়েছে—"কোন আইন লংঘনের জন্য আমি অপরাধী ? অন্ততঃ ১৯৭২ সনের ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রচলিত এবং জারিকৃত কোন আইনে আমি দোষী নই। সুতরাং আমি 'অপরাধী' এই ধারণাই বা মনে স্থান দেব কেন ?"

মনে হচ্ছে সা'দ আহমদ নিষ্পাপ শিশু। তিনি জানেন না কেন তিনি দোষী। শুধু শান্তি কমিটিতে থাকার কারণেই তিনি অপরাধী। কিন্তু, সব রাজাকারই মনে করে, তারা দোষী নয়। তাদের শুধু শুধু হেনস্থা করা হচ্ছে। পাকিস্তান রক্ষার জন্য তারা খুন, ধর্ষণ করেছে। এটাতো কোন অপরাধ নয়। যে কারণে, কোন রাজাকার আজ পর্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করেনি।

এর মধ্যে সা'দের ভাষায় তাকে 'হাইজ্যাক' (অর্থাৎ ধরে নিয়ে যাওয়া হয়) করা হয় এবং মুক্তিপণের মাধমে তিনি মুক্তি পান। ইতোমধ্যে খবর পান যে, কুষ্টিয়ায় রাজাকারদের ধরা হচ্ছে, হত্যাও করা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। এটি তার মনে বেদনার সৃষ্টি করে। তার মনে হয়েছে, তিনি শান্তি কমিটিতে

ছিলেন বটে কিন্তু অপরাধতো করেননি। আর, তার ভাষায়, "শান্তি কমিটি করে আমরা সামরিক বাহিনীর কোন অন্যায় কাজে সাহায্য করি নাই বরং এই দেশে সামরিক বাহিনী যে আগুন জ্বালিয়েছিল এবং সে আগুনে দেশের মানুষ পুড়ছিল তা শান্ত করার জন্য জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছিল?"

বাঙলাদেশে যারা ছিলেন তাদের কি এই বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে? তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "সরকারের হিসাব গ্রহণ যোগ্য হলেও অর্থাৎ এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিলেও [ যেন এ হিসাব মিথ্যা ] এদেশের সাড়ে ছয়কোটি মানুষ দেশের মাটি কামড়ে ছিল এবং তারা পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচারেরও শিকার হয়েছে। স্বাধীনতা পর বেশ অনেক দিনই যুক্তিবাহিনীর ধারণায় এই সাড়ে ছয় কোটিই ছিল দালাল এবং তাদের উপর যে কোন অত্যাচার করা জায়েজ মনে করা হত...."

এই বাক্যের মাধ্যমে সা'দ রাজাকার ও দেশে অবস্থানরত মুক্তিযুদ্ধে জয়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষদের এক করে ফেলেছেন এবং সবার সমবেদনা পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু, তিনি ভুলে গেছেন দেশে অবস্থানরত মানুষ রাজাকারদের কখনই তাদের অংশ বলে মনে করেনি। মনে করেছে তারা হানাদার পাকিস্তানীদের সহযোগী। রাজাকার এবং মানুষে তারা পার্থক্য করেছে এবং তা এখনও বিদ্যমান।

## ৩৮

বাংলাদেশে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। সবার আশা বঙ্গবন্ধু এসে হাল ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। রাজাকাররাও সে আশা করছিল, তবে তা অন্যকারণে। এবং কেন রাজাকাররাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বঙ্গবন্ধুর প্রতি সে বিবরণ দিয়েছেন সা'দ দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

১০ জানুয়ারি শেখ সাহেব ফিরলেন। "কিন্তু দুভার্গ্য–শেখ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় জনতাকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ না দিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির বাণী শুনালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, দালালদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কোন মতেই মায়া করা হবে না।"

এই ঘোষণা দালালদের ক্ষুব্ধ করেছে। এর বিপরীতে তাদের যুক্তি লক্ষ্য করার মতো। লিখেছেন সা'দ—"পাক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বহু

তিক্ততা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। বহু মানুষের রক্ত ঝরে উভয় দেশের মাটিই লাল হয়েছিল। কোটি কোটি মানুষ বৃটিশের শাসনযন্ত্রের অংশ হিসাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুভলগ্ন পর্যন্ত বৃটিশের হয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু এসব কারণে না ভারতে না পাকিস্তানে কাউকে দালাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, আর না কাউকে হয়রানি করা হয়েছে। ভারত বা পাকিস্তানে দালাল আইন রচিত হয়নি। সংজ্ঞাবিহীন দালালদের বিরুদ্ধে শেখ সাহেবের হুঙ্কার মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগ কর্মী ও নব্য দুষ্কৃতিকারীদের মনে জিঘাংসা জাগিয়ে তুলল। ...কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, রেশনের দোকান, মায় ফুটপাতের ক্ষুদে হকার সর্বত্রই এ আগুন ছড়িয়ে গেল। হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাওয়া এক কোটি বাদে অবশিষ্ট সাড়ে ছয় কোটিই তটস্থ, সন্ত্রস্ত– না জানি কখন দালালির অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা নিশ্চিহ্ন হতে হয়।"

বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ দুটোর পরিপ্রেক্ষিত, প্রকৃতি যে একেবারে আলাদা তা সা'দ বিচার্য মনে করেন নি। এবং আবারও লক্ষনীয় সবসময় রাজাকারদের তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত সাড়ে ছয়কোটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করছেন কৌশলগত কারণে যাতে রাজাকাররা যে অপরাধ করেছে তা বাধ্য হয়ে করেছে সে কথা প্রমাণের জন্য।

দালাল আইন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সা'দ লিখেছেন—

"কিন্তু একি ? এ সংসারে অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে মন চায়না তবুও বিশ্বাস করতে হয়। বিচারপতি রাষ্ট্রপ্রধান গদিতে আসীন হয়ে প্রথমেই যে ফরমান জারী করেছেন, তাতে ইনছাফের ভিত্তি শুধুমাত্র নড়েই উঠেনি বরং ধ্বসে গিয়েছে। বিচারের মূল কেন্দ্রে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের ১৯৭২ সনের ৫নং ফরমান বা হুকুম যা হাইকোর্ট অব বাংলাদেশ ১৯৭২ বলে পরিচিত, গত ২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা হাইকোর্টকে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে এবং সেস্থলে নতুন হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আদেশ জারী হয়েছে ১৯৭২ সনের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে। এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য হলো যে নতুন রাষ্ট্রের নতুন হাইকোর্টকে সর্বপ্রকার রিট জারী করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। অর্থাৎ ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত পরাধীন বাংলাদেশের পরাধীন ঢাকা হাইকোর্ট সরকারী যন্ত্রের বেআইনী কার্যকলাপ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে পরাধীন দেশের নাগরিককে নিরাপত্তা দানের জন্য যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করত তা স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন ঢাকা হাইকোর্ট প্রয়োগ করতে পারবেনা। অপূর্ব স্বাধীন দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট পদক্ষেপ।"

দালালদের জন্য দালাল আইন করা হবে নাতো কী হবে ? রাজাকারদের বক্তব্য একটিই তারা যা করার করেছে কিন্তু তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া যাবে না। শাস্তি দিতে গেলেই 'ইনসাফ' আর থাকে না। কিন্তু শাস্তি না দিলে যে সাতকোটির বিরুদ্ধে 'ইনসাফ' চলে যায় এ যুক্তিটি স্বাভাবিকভাবেই তারা এড়িয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, আমরাও তাই করেছি।

ক্রুদ্ধ হয়ে সা'দ লিখেছেন—"প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে দেশের প্রচলিত আইনের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে কতকগুলো অত্যাচারমূলক ধারা এই হুকুমের মধ্যে সামিল করা হলো।" এবং আশ্চর্য হয়ে তিনি লিখেছেন, কেউ এর প্রতিবাদ করল না। তার একবারও মনে হয়নি, নরঘাতকদের কাঠগড়ায় নিলে কেউ তার পক্ষে কথা বলবে কেন ? তারপর তিনি লিখছেন—

"দালাল পাকড়াও করার নামে এবং দালালের বাড়ীঘর তল্লাসের নামে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার মহাসুযোগ এইসব আইনগুলো সৃষ্টি করে দিল। সুতরাং তারা জানাল খোশ আমদেদ এবং চতুর্গুণ উদ্দীপনার সাথে দালাল নিধন ও দালালদের সম্পত্তি লুটপাট শুরু হলো। দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল দৈনিক পত্রিকাগুলোর কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করাই ভাল। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ইয়াহিয়া সরকারের গুণগানে মুখর ছিল তারা এখন বর্তমান সাকারের নজরে 'গুড বয়' হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, যা সি, আই, ডি পুলিশের পক্ষেও সম্ভবপর নয়, সে কঠিন কাজও তারা করছে। সামরিক শাসনামলে কোন মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি,ডি,পি নেতা বা রাজাকার আলবদর কোথায় কত শত, হাজার বা লক্ষ নরনারী হত্যা করেছে তা এরা অবলীলাক্রমে নিজেদের অফিসে বসে বলে চলেছে, কাগজের পাতায় ছাপিয়ে চলেছে। কোন ডোবা বা ইন্দারা থেকে উদ্ধারকৃত কোন কংকাল বা হাড়ের স্তূপের ফটো দেখেই এরা বলে দিচ্ছে, কোন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের লাশ এগুলো আর কোন ধর্মান্ধ ব্যক্তি হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগের স্বীকার মতে যে পঁচিশ হাজার পাক সেনাকে এদেশে হত্যা করা হয় বা আন্দোলনের নয় মাসে মুক্তিবাহিনী বিভিন্ন স্থানে দালাল হিসাবে যাদেরকে হত্যা করে এবং উর্দূভাষী নরনারী বিভিন্ন সময়ে যারা মৃত্যুর শিকার হয়, তাদের কোন কংকাল বা হাড়ের চিহ্ন এদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল সাংবাদিকরা দেখতেই পেলেন না। রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জারীকৃত হুকুমনামাগুলোর এবং বিশেষ করে দালাল আইনের জারী গান গাইতে এরা শুরু করেছে। সামরিক বাহিনীর যে কোন কু-কর্মকে সরকারের প্রতিপক্ষদের উপর এমনকি নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। আমর সম্পর্কে লিখা হলো 'কুষ্টিয়ায় প্রখ্যাত দালাল সা'দ আহমদের বাসার নিকটে একটি ইন্দারার মধ্যে বহু মাথার খুলি পাওয়া

গেছে....।' বহু বিশ্লেষণ দিয়ে আমাকে বিভূষিত করা হয়েছে এবং আমি যে একজন বিরাট খুনী সে রায়ও তারা দিয়ে দিয়েছে। আমার নিজের বাড়ীতে বা বাড়ীর পার্শ্বে কোন ইন্দারার অস্তিত্ব ছিলনা বা নাই। অনেকগুলি বাড়ী পার হয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে রেল কর্মচারীদের বাসার কাছে ওদের ব্যবহৃত একটি ইন্দারা আছে। ওখানে কোন মাথার খুলি পাওয়া গেছে বলে কারো জানা নেই। তবে যদি পাওয়া যায়ই সেটা কি আমার বাড়ীর পাশ হলো ? আর শহরের কোন প্রান্তে বা অপর কোন স্থানে ইন্দারা থাকলে নিশ্চয়ই তাও আমার বাড়ীর পাশে অবস্থিত একথা বলা চলে না।"

এখানে কয়েকটি বক্তব্য আছে, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সে সব পত্রিকা পাকিস্তানের গুণগান গেয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে,ঐ সময় যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তারা স্বাধীনভাবে বেরুত নাকি পাকি বাহিনীর নির্দেশে প্রকাশিত হতো। সা'দ বলছেন, নয়মাসে তারা যে সব হত্যাকাণ্ড করেছেন সেগুলির চাক্ষুষ কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেনি। সামরিক বাহিনীর কার্যাবলী প্রতিপক্ষের ওপর চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তিই বা কী আছে আর প্রতিবাদই বা কীরব। ব্যাপারটা এরকম। গোলাম আযম এখন যদি বলেন, বাংলাদেশ হয় নি। আপনি, আমি এর বিরুদ্ধে কী যুক্তি দেব ?

এ পরিপ্রেক্ষিতে সা'দ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন যা আগে উল্লেখ করেছি এবং তা মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়–* গ্রন্থেও একই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সে রিপোর্টটি আমি উল্লেখ করছি— "কুষ্টিয়া জেলা জামাতে ইসলামী ও শান্তি কমিটির সভাপতি সাদ আহমেদ। স্বাধীনতার পর তার বাড়ির কাছে একটি কূপ থেকে ২৫টি মাথার খুলি ও নরকঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়। দালালীর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়ে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।"

## ৩৯

অবশেষে সা'দ আহমদ গ্রেফতার হলেন। জেলে নেয়ার পর উচ্চপদস্থ এক পুলিশ অফিসার এসে তাকে সালাম করে, সাদরে ভেতরে নেয়ার বন্দোবস্ত করলেন। এ ধরনের ঘটনার কথা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। হত্যা করেও যে রাজাকাররা বেঁচে গেল তা আমাদের সাতকোটির কিছু মানুষের কারণে।

এখন মনে হয়, সমাজের সেইসব লোকগুলোকেও রাজাকারদের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা জরুরী ছিল। জেলে ঢুকেই সা'দ দেখেন—

"প্রায় লোকের শরীরে যখম। তাজা রক্তের প্রলেপ দেহের সর্বাঙ্গে মনে হলো বন্দী করবার পর প্রচুর মারপিট করা হয়েছে। অফিসে জনৈক সুঠাম দেহী ও সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোক প্রবেশ করলে সবাই উঠে দাঁড়ালো। সেই ফ্যাসীকাট গোঁফওয়ালা দু'জন যুবকও তার কাছে এগিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দিল। কথাবার্তায় জানলাম উনি জেলার বাস্তব ক্ষেত্রে জেলের হর্তাকর্তা নাম নির্মল চন্দ্র রায়। মুক্তিবাহিনীর এই সদস্যদের যথেষ্ট ইজ্জত দেখালেন জেলার বাবু। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাই পাশের কামরা থেকে একজন উর্দূভাষীকে নিয়ে আসলো জেলারের কাছে এবং বললো "এই সেই লোক"। লোকটি বৃদ্ধ, বয়স আশির উর্ধে, সাদা দাড়িতে, ফর্সা চেহারায় ও খুন ঝরা শরীরে তাকে অপূর্ব লাগছিল আমার কাছে। লোকটিকে দেখামাত্র জেলার গোটা কয়েক লাথি মারল। আর সেই সঙ্গে গোঁফওয়ালা যুবক দু'টির মধ্যে একজন বৃদ্ধের শরীরে উপর্যুপরী আঘাত হানতে লাগল। কি অপরাধ ছিলো বৃদ্ধের জানিনা—কেন মারা হলো, তাও জানিনা—তবে এরূপ মারপিট করবার কোন বিধান ধর্মে বা দেশের আইনে নাই তাই জানি। মনের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, কিন্তু আমিও বৃদ্ধের মত বন্দী। মন দূর অতীতের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে পঁচিশ বছর আগে আমরা মুক্তির একটি পথ বেছে নিয়েছিলাম। কালের ঘটনা প্রবাহে 'মুক্তিকে' অভিশাপ মনে করে 'দেবতাদের কাছ থেকে বাঙ্গালী হবার "বর" চেয়ে নিয়েছি।' জাতীয়তাবাদের আগুনে জীবনের পবিত্র মূল্যবোধ, মানবীয় অনুভূতিগুলোকে জ্বালিয়ে ছাই করেছি। আপন পরের পার্থক্য বিস্মৃত হয়েছি, অমৃত ও হলাহলের পার্থক্য ভুলে গেছি। অতীতে নির্মল বাবুরা এইভাবেই মেরেছেন। কিন্তু অতীতে যা ছিল দোষনীয় বর্তমানে তা নয়। অতীতের মানবিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে আর সহনশীল মনোভাব গড়তে আমাদের মত সেকেলেদের সময় লাগবে বৈকি! এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ কায়েমের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নির্মল বাবুদের পদচারণার মধ্য দিয়েই শুরু হোকনা!"

এ ঘটনাগুলো কতটা সত্যি জানি না। জানার উপায়ও নেই। করে থাকলেও, সে মুহূর্তে তা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মূল বিষয় তা নয়। মূল বিষয় হলো বক্তব্য ও পরিবেশনা। ঢাকা জেলে যে সব রাজাকার ছিল তারা সবাই নির্মল রায়ের কথা উল্লেখ করেছে। নির্মল রায়কে তারা দেখেছে হিন্দু আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে আর কয়েদীরা মজলুম মুসলমান প্রজা। এই বাক্যটি উল্লেখ্য– "অতীতে নির্মল বাবুরা এইভাবেই মেরেছেন।" অর্থাৎ

সাবধান, হিন্দুরা এ ধরনের কাজ করবেই। তারপরের বাক্য— "জাতীয়তাবাদের আগুনে জীবনের পবিত্র মূল্যবোধ, মানবীয় অনুভূতিগুলিকে জ্বালিয়ে ছাই করেছি।" অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ যত নষ্টের মূল। মানলাম। ১৯৭১ সালে কি রাজাকারদের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ছিল ? যদি থেকে থাকে তবে তাদের কাণ্ডকারখানা কি পবিত্র মূল্যবোধ বা মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ১৯৭১ সালে যদি জাতীয়তাবোধ না থেকে থাকে তবে সা'দ আহমেদ পাকিস্তানী হানাদার ও রাজাকারদের কর্মকাণ্ড কী পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবেন। কারাগারে প্রথম ফজরের নামাজ পড়ার সময় তার মুনাজাতের বর্ণনা আছে যার সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত আলবদর আমিনুলের মুনাজাতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাবেন–"জুলুমের বন্যায় লক্ষ লক্ষ নারী শিশু অসহায় মানুষ ভেসে চলছে।" খোদার কাছেও মিথ্যা ফরিয়াদ করা যায় জানতাম না। একমাত্র আল-বদর রাজাকারদের পক্ষেই বোধ হয় তা সম্ভব। এখানেই শেষ নয়, তিনি আরো ঘোষণা করেছেন— "স্বাধীনতা পরবর্তী আমলের হাজারো অপরাধমূলক ঘটনায় কোন মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপির কর্মী বা সদস্য, রাজাকার, আলবদর, আল শামস এর বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ আনতে পারেনি।"

## ৪০

তৃতীয় অধ্যায়ে সা'দ আহমদ আওয়ামী লীগের অতীত রাজনীতি ও ভূমিকার ওপর একটি থিসিস পেশ করেছেন। এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য কী হবে তা প্রথম লাইনেই বিধৃত–"বিভিন্ন সভা বা কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব বা পলিসির মধ্যে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে যে কোন কৌশলকেই হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করাই তাদের লক্ষ্য ছিল।" এরপর তিনি বর্ণনা করেছেন অন্যান্য দলও নেতৃত্ব ও 'চরিত্রবান' নেতার প্রভাবে কীভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর, হ্যা তারপরই বোঝা যায় সা'দ আহমদ কোন দলের কর্মী বা পক্ষপাতী এবং কেন তিনি রাজাকার হয়েছিলেন। তার থিসিসের শেষপর্বে দেখা যায়। ১৯৭০ সালে 'চরিত্রবান' নেতাদের আদর্শবাদী দল ছিল জামায়াত। এবং আওয়ামী লীগের পরই ছিল তার স্থান। তার ইঙ্গিতটি এমন যে, জামায়াত প্রথমই হতো কিন্তু আওয়ামী লীগের 'বর্বরোচিত' ব্যবহারের কারণে তা সম্ভব হয়নি। এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ছিল ন্যক্কার জনক।

সা'দ আহমদ বর্ণিত জামায়াতের উদ্ভব ও বিকাশের বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। জামায়াত কী ভাবে নিজেদের মূল্যায়ণ করেছে এ ভাষ্য তা স্পষ্ট করবে–

"এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত অথচ অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং নির্বাচনী ফলাফলে দ্বিতীয়স্থান অধিকারী জামায়াতে ইসলামী প্রায় দুই যুগ উর্ধকালব্যাপী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বয়সে প্রাচীন হলেও প্রভাব ও নির্বাচনী অভিজ্ঞতায় যে কোন আদর্শবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এই অবস্থা স্বাভাবিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সার্বজনীন দাওয়াত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ ছাড়া এই ব্যবস্থা প্রদত্ত নেয়ামত পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আদর্শবাদী আন্দোলনের জন্য আদর্শবাদী ও চরিত্রবান কর্মী ও নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে জামায়াতের সমর্থক সৃষ্টি, কর্মী সংগ্রহ ও ট্রেনিং দান, নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি ইসলামী সমাজ গঠন সম্পর্কীয় জ্ঞান ও তথ্যের প্রচার ও প্রসার দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রচলিত অতীত ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বেসাদৃশ্য নিরূপণের জন্য গবেষণা, সেবা ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি ও এইরূপ আরও বহু বিষয় সম্পর্কে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত কাজগুলি প্রায় পাশাপাশি চলেছে এবং এইরূপ আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গতি ধীর অথচ বলিষ্ঠ হতে বাধ্য। এইরূপ প্রতিষ্ঠান আদর্শের আগুনে ঝলসানো কর্মী নিয়ে লোভ, মোহ জয় করে এগিয়ে চলে এবং কোন জালেমের বর্বর হস্তের আঘাতে সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়লেও এই পরিবেশে ধৈর্য না হারিয়ে হিম্মত ও হেকমতের সঙ্গে নতুন শক্তির সঞ্চার করে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত এগিয়ে চলে।

পঞ্চাশ দশকে জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক প্রচার কাজ এই দেশে শুরু হলেও বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আদর্শবাদী আন্দোলন হিসাবে প্রতিটি জায়গায় এর লক্ষ্য থাকে প্রথমে কিছু জ্ঞানী, কর্মক্ষম, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সৎ চরিত্রের মানুষের সন্ধান করা এবং তাদেরকে একটি দলগত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা। এইরূপ চরিত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ গড়া সম্ভব হলেও ব্যাপক প্রচার ও সংগঠনের সম্প্রসারণের কাজ ১৯৫৮ সনের পর সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৬২ সনের পর জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জামায়াত আইয়ুব সরকারের

রোষানলে পতিত হয়। ১৯৬৩ সন থেকে বিভিন্ন সরকারী হয়রানীমূলক হামলা শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশের জামায়াতের সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে বহু নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। প্রায় গোটা বছরটাই নেতৃবৃন্দকে কারাগারে কাটাতে হয় এবং ১৯৬৪ সনের শেষের দিকে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সরকারী বিধিনিষেধ বেআইনী সাব্যস্ত হওয়ায় জামায়াত শৃংখলামুক্ত হয়ে পুনরায় কাজ শুরু করে। ১৯৬২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সনের মার্চ পর্যন্ত জামায়াত এদেশে এককভাবে শুধুমাত্র নিজ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্যে সাংগঠনিক কাজ করতে পারে নাই। কেননা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অন্যান্য গণতন্ত্রকামী দলগুলোর সঙ্গে মিলে সাধারণ দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিলো। অতীতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলন এন,ডি এফ, মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনী অভিযান (কপ) পি–ডি–এম, ডাক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই জামায়াতের ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। ১৯৬৯ সনের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্যে জনসভার উপর সরকারী বিধিনিষেধ ছিল। তবে কর্মী বৈঠক বা গৃহাভ্যন্তরে সম্মেলনের উপর কোন বিধিনিষেধ না থাকায় জামায়াত পুরাপুরি সময়টা সমর্থক সৃষ্টি, কর্মী সংগঠন এবং জামায়াতের পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা চলতে পারে এই দেশে জনসাধারণের পর্যায়ে জামায়াতের ইতিহাসে ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন ও প্রচারের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৯৭০ সনের জানুয়ারী থেকে। অতীতের শত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক অধ্যাপক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মধ্যে জামায়াত যুক্তি ও জ্ঞানের অস্ত্রের সাহায্যে অধিকতর উন্নত চরিত্রের যে দল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো ১৯৭০ সনের জানুয়ারী মাসে প্রত্যেকেরই সম্মিলিত ব্যাপক গণঅভিযান একদিকে যেমন সমর্থক ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করল তেমনি ইসলাম বিরোধী মহল ও ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতালোভী মহলে বিস্ময় ঈর্ষা ও গোস্বার সৃষ্টি করল। ১৯৭০ সনের ১৮ই জানুয়ারী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় আওয়ামী লীগের বর্বরোচিত হামলায় এই সত্যের বাস্তবতা প্রমাণিত হলো। ট্রাকে ভর্তি করে আনা গুন্ডাবাহিনী, লোহার রড, ইটের টুকরার সদ্ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পল্টনের বিপুল জনসমাবেশ তছনছ করে, প্যান্ডেলে বার শত কর্মী যখম এবং ২ জনকে শহীদ করে আর পরের দিন নিজেদের প্রভাবান্বিত খবরের কাগজের মাধ্যমে মনমত গল্প ছাপিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। এরপর পরই কিছু দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা নারায়ণগঞ্জে ন্যাপের অফিস ঘর ভেঙ্গে ফেলে এবং ন্যাপ, পি,ডি,পি, মুসলিম লীগ, জাতীয়

লীগ ইত্যাদি প্রায় সব দলের জনসভায় মারপিট করে ইট ছুঁড়ে, মাইক কেড়ে নিয়ে বানচাল করতে শুরু করে। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগের কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রশ্নে যারা সন্দেহ পোষণ করত, পরবর্তী ঘটনা সমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের মনে আর কোন সংশয় রইলো না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকারী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। গভর্ণর থেকে আরম্ভ করে মহকুমা প্রশাসক পর্যন্ত কেউই আওয়ামী লীগের এই মারমুখো আচরণের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করলেন না।"

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা ছিল কেমন?

১. কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা

২. সমস্ত আইন বিধি ভেঙ্গে নির্বাচনী প্রচারনা

৩. "জামায়াতের উপরই আওয়ামী লীগের আক্রোশ সবচাইতে বেশী হলো এবং ক্ষমতা দখলের একমাত্র প্রতিবন্ধক মনে করে জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে দিলো।"

ফলে, সবাই নিশ্চিত ছিল যে ফলাফল কি হবে।

"যে পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তাতে ফলাফল একরূপ নিশ্চিত ছিল। বহু নির্বাচনী কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের এজেন্ট ও কর্মী ছাড়া অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্ট ও কর্মীরা উপস্থিত হতে পারেনি। দু'টি মাত্র পক্ষ জোর গলায় ঘোষণা করল নির্বাচন অত্যন্ত নিরপেক্ষ হয়েছে। এক পক্ষ হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও অপর পক্ষ হচ্ছে ইয়াহিয়া সরকার। আর এখন এই দুই পক্ষের মধ্যে রাজনীতির খেলা সীমিত হলো। নির্বাচনী ফলাফলে অন্যান্য দলের কোন গুরুত্ব ছিলনা। জামায়াতে ইসলামী যদিও ভোটারের সমর্থনের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল, কিন্তু পার্থক্য ছিল অত্যন্ত বিরাট। অবশ্য সমস্ত মহলই স্বীকার করলেন যে অল্প সময়ের মধ্যে এই দেশের রাজনীতিতে জামায়াত প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং জামায়াতের ক্রমবর্ধনশীল শক্তি সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ ছিলনা। যাই হোক জনতার রাজনীতি থেকে দেশ এবার পার্লামেন্টের রাজনীতির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। নির্বাচনের ফলাফলে বিপুল ভোটাধিক্যের অধিকারী হয়ে নিজের মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত থেকে গণপরিষদের অধিবেশনের দিনটির জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা না করে ৬ দফার উপর আপোষ নেই এই মর্মে হুমকি ছাড়লেন শেখ সাহেব।"

দেশের এ পরিস্থিতিতে কি সামরিক বাহিনী চুপ থাকতে পারে। সা'দ আহমদের ভাষায় পারে না— "দুনিয়ার কোন দেশের সামরিক বাহিনী এরূপ অবস্থায় চুপ থাকতে পারে না। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অরাজকতা গোটা প্রদেশকেই ছেয়ে ফেলে।" ২৬ মার্চের পর পাক বাহিনীকে হটিয়ে দেয়

মুক্তিপাগল মানুষরা। অবশ্য সা'দরা বিষয়টি দেখেছেন ভিন্নভাবে। তাদের ভাষায়– "গোটা জেলার সর্বত্র অব্যবস্থা বিশৃংখলা এবং নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দল। ভারত ও কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে বর্ডারে কোন অস্তিত্ব রইলো না। সীমান্তবর্তী বাজারগুলোতে প্রত্যহ হাজার হাজার ভারতীয়দের ভীড়– চাউল, মাছ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি খরিদ করে নিয়ে যাচ্ছে আর বিনিময়ে দিচ্ছে ভারতীয় মুদ্রা।.....ভারতীয় বিড়ি ও পচা মালামাল এসে আমাদের বাজার বোঝাই হতে লাগল। ভারতীয় সংবাদপত্র পেল নতুন বাজার।"

অর্থাৎ আওয়ামী লীগ দেশটাকে ভারত করে ফেলল। ভারত হলেই 'পচা মালামাল' খেতে হবে, পরতে হবে। এ প্রপাগান্ডা লাইন নতুন নয়। পাক ও জামায়াতরা এই লাইন সবসময় অনুসরণ করেছে। এখনও করছে। এ সমস্ত দেখে সা'দ আহমদ গ্রামে পালালেন। আসলে পালিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ভয়ে। এটি অবশ্য তিনি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু, আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি।

গ্রামে গিয়ে দেখেন সেখানেও পরিবেশ পর্যুদস্ত। আওয়ামী লীগ নেতারা নেই। সা'দ আহমদের বক্তব্য–"পাক আর্মী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে অথচ নেতারা জনগণের বাঁচবার ও আত্মরক্ষার কি ব্যবস্থা করে গেল ? যুদ্ধের জন্য চাঁদা তুলে যুদ্ধ না করেই যদি পালিয়ে যাবে তবে দেশের মানুষকে এ পথে লেলিয়ে দিলো কেন ?...কিন্তু পালিয়ে যাবার পূর্বে বিভৎস ও নারকীয় কাণ্ড আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটিয়ে গেল এবং দেশের যে সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল তা চিন্তা করলে লজ্জায় ঘৃণায় মাথা হেট হয়ে আসে। জেলার সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে উর্দূভাষী পুরুষ, নারী, শিশুদের জড়ো করে হত্যা করা এবং সম্পদ লুট করার কাজগুলো তারা ১২ই এপ্রিল থেকে ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে করেছে। ট্রেজারী, ব্যাংক ইত্যাদি হতে কোটি কোটি টাকা, সরকারী খাদ্য গুদাম থেকে কয়েক লক্ষ মণ খাদ্য, কয়েক শত সরকারী জীপ, ট্রাক, ওয়াগন ক্যারিয়ার, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও বগী ইত্যাদি লুট করে ভারতে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যক্তিগত সম্পদ যা রেখে গেলেন—নিয়ে গেলেন তার চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশী। স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে এত বড় ব্যবসার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল এবং তাও জনগণের নামে নিজেদের স্বার্থে। কারও বাধা দেবার উপায় ছিল না। কেননা আওয়ামী লীগের বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে কিশোর পর্যন্ত সবার হাতেই অস্ত্র। ই.পি.আর পুলিশ ইত্যাদি সবাই আওয়ামী লীগের সাথে একাকার হয়ে গেছে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারে। সুতরাং পলায়নমুখী হিংস্র হায়েনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার মত অবস্থা কারও ছিলনা।"

অন্যদিকে, হানাদাররা কুষ্টিয়ায় ফেরার পথে বাধা পেলনা বটে, "কিন্তু উর্দূভাষী পুরুষ, নারী ও শিশুদের উপর অমানুষিক পশুসুলভ আচরণ, বর্বর হত্যালীলা তাদের জিঘাংসাকে বাড়িয়ে তুলল। কাপুরুষরা মাছুম শিশু ও নারীদের হত্যা করে নিজেদের বীরত্ব দেখিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা পাক আর্মীর মনে অত্যাচারিত উর্দূভাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলল এবং প্রতিটি উর্দূভাষী কিশোর, যুবক ও প্রৌঢ়ের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিল। যাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই হাতিয়ার দেওয়া হলো তারাত সবাই ভারতে পালিয়ে গেছে। সুতরাং এ অস্ত্রে এখন কি প্রয়োজন ? সরকার প্রায় ১৫ মাস ধরে আওয়ামী লীগের গুন্ডামীকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাদের পশু শক্তিকে বৃদ্ধি করবার সমস্ত প্রকারের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, নিজেরা মরেছে, শান্তি প্রিয় নাগরিককে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে এখন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়েছে। নিজেদের শক্তি যথেষ্ট নয় মনে করে জনসাধারণের একাংশের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু এমন লোকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো, যারা মা-বাপ, সন্তান হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রিয়জনের হারানোর ব্যথা মুছে না যেতেই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হল স্বাভাবিকভাবেই অশুভ। আওয়ামী লীগারদের অত্যাচারের তুলনায় এর পরিমাণ কম হলেও ভবিষ্যতের জন্য উর্দূভাষীদের এই দেশে তাদের জীবন ও মালামালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করল এবং উর্দূভাষীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টিতে সহায়তা করল।"

বিবরণ দু'টি একটানা পড়ে গেলে এ ধারণাই হবে যে আওয়ামী লীগ [এখানে বুঝতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক] সমর্থকরা সবাইকে বিপদে ঠেলে দিয়ে, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে লুট করে দেশ ত্যাগ করল। সা'দ ও রাজাকাররা বারবার এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, বাঙালিরা উর্দুভাষীদের ওপর প্রচণ্ড জুলুম করেছে। একথা কখনও লেখেননি যে, বাঙালির ওপর জুলুম চালান ও সেনাবাহিনীর সমর্থক হওয়ায় প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে উর্দুভাষীদের ওপর হামলা হয়েছে। এবং উর্দুভাষীরা যে অত্যাচার করেছে "আওয়ামী লীগারদের অত্যাচারের তুলনায় এর পরিমাণ কম"।

## ৪১

সা'দ আহমদ ফিরে এলেন কুষ্টিয়ায়। সব কিছু বিধ্বস্ত বিশৃংখল। এরপর তিনি যে বর্ণনাটি দিয়েছেন তা কৌশলগতভাবে চমৎকার। চারদিকে বিশৃংখল

পরিবেশ, আওয়ামী লীগ ও হানাদার বাহিনীর ভয়ে সবাই ভীত। কিন্তু, বেঁচে তো থাকতে হবে। এবং মানুষকে এই বাঁচার জন্য সাহায্য করছে কারা ? রাজনৈতিক দলগুলি। সে দলগুলির নাম কী ? যারা আওয়ামী ভাবাপন্ন নয়। তারাই দেশে এখন শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল। এবং কীভাবে ? কেন, শান্তি কমিটির মাধ্যমে। অর্থাৎ দেশে শান্তি আনা ছাড়া শান্তি কমিটির কোন কাজ ছিল না। উদ্ধৃতিটি লক্ষ করুন—

"বিবদমান পক্ষ ছিল দু'টি– আওয়ামী লীগ ও সামরিক সরকার। উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটিতে যে বর্ণনাহীন সমসার উদ্ভব হলো। তার অন্তত মানবীয় দিকটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অন্যান্য দলগুলির জন্য রাজনীতির উর্ধে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে দেখা দিল। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত লাশগুলোর সৎকার করা, গৃহহীনদের মাথা গুজবার ঠাঁই করে দেওয়া, সর্বহারাদের এক মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করা, ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, মানুষের ঘরে ফিরে আসবার ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরী কাজ বলে মনে হলো। এইসব কাজের সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত ছিল। তাই মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করাই ছিল একমাত্র পথ। এই বিশেষ প্রয়োজনেই গড়ে উঠল শান্তি কমিটি। অরাজনৈতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। সামরিক সরকারের স্বার্থ নয় বরং জনসাধারণের স্বার্থেই দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। শান্তি কমিটির উপরোক্ত কাজগুলো একদিকে দুর্দশাগ্রস্থ জনসাধারণের কষ্টকে লাঘব করেছ, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহায়তা করেছে—অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর রোষানলের তীব্রতাকে কমিয়ে দিয়েছে।"

এরপর রাজাকার বাহিনী সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি এক ফ্যান্টাস্টিক থিউরির জন্ম দিয়েছেন। হালে তৈরি জেনারেল মীর শওকতের মুক্তিযুদ্ধের 'ড্রামতত্ত্বে'র মতোই এই থিউরি। রাজাকারদের উদ্ভব নিয়ে রাজাকারের 'স্রষ্টা' জেনারেল নিয়াজি পর্যন্ত এ ধরনের থিউরি দিতে পারেনি। 'শান্তি কমিটি গড়ে উঠল গ্রামে গ্রামে'– এই শিরোনামের অধীনে লেখা দুটি অনুচ্ছেদই আমি উদ্ধৃত করছি কোন রকম মন্তব্য ছাড়া। পড়া মাত্রই সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না জামায়াত বা রাজাকাররা মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

"গ্রামে পালিয়ে থাকা মানুষ শহরে ফিরে এল। গ্রামের মানুষও দৈনন্দিন কাজে শহরের পথ ধরল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামেও শান্তি কমিটি গড়ে উঠল। যে সমস্ত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা আওয়ামী লীগের

আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। তারাও প্রাণের দায়ে পালিয়ে গেছে ভারতে। সুতরাং গ্রামে রেশন, রিলিফ, বিলিবন্টন ইত্যাদি কাজে যে শূন্যাবস্থা বিরাজ করছিল, তা সাময়িকভাবে ইউনিয়ন শান্তি কমিটির মাধ্যমে চালু হলো। কিন্তু সমসা দেখা দিল জনসাধারণের জীবন ও মালামালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। মার্চের আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থানাসহ যে সমস্ত অস্ত্রাগার লুট হলো, তার একটি মোটা অংশ দেশের চোর ডাকাতদের হাতে পড়ে গেছে। জেল ভাঙ্গা কয়েদীরা এ সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করবার সর্বপ্রকার সুযোগই গ্রহণ করেছে। চোর ডাকাতদের অনেকেই ভারতে আশ্রয় নিয়ে বিপ্লবী সাজল, আর যারা এদেশে রয়ে গেল তারাও সুযোগ সুবিধামত পুরনো অভ্যাসটাকে কাজে লাগাতে শুরু করল। এদের মোকাবিলা করবার জন্য যথেষ্ট পুলিশ বা অন্য কোন বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ছিল না। গ্রাম্য বাহিনী হিসাবে যে আনসার বাহিনী প্রায় দুই যুগ উর্ধকাল ধরে কাজ করে আসছিল তারাও ছিন্ন ভিন্ন। অনেকেই ভারতের বুকে আশ্রয় নিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। এই শূন্যতাকে পুরণ করবার জন্যই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আনসার বাহিনীর স্থলে রাজাকার বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, প্রাদেশিক সরকার। জেলার প্রতিটি জায়গায় সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠল এবং অতীতের আনসার এ্যাডজুট্যান্ট ও কর্মকর্তারাই রাজাকার এ্যাডজুট্যান্ট ও কর্মকর্তা হিসাবে গৃহীত হলো। শূন্যস্থানগুলো নতুন অফিসার দিয়ে পূরণ করা হলো। গ্রামে গ্রামে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠল এবং পুলিশ বাহিনীর অনুপস্থিতিতে এরাই শান্তি শৃঙ্খলার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে নূতন সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের খবর আসতে আরম্ভ করল বিভিন্ন গ্রাম থেকে। কে বা কারা রেলওয়ে ব্রীজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা যেন গ্রামের পথে না যায়। এটাই ছিল আমাদের সবারই কাম্য। বেসামরিক শাসনযন্ত্রের সক্রীয়তার পেছনেও এই-ই ছিল উদ্দেশ্য। কেননা যে কোন গ্রামে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সন্ত্রাসমূলক কাজগুলো সামরিক বাহিনীকে গ্রামের পথ দেখাল। সামরিক আইনানুযায়ী অকুস্থলের একশত গজ বা তদূর্ধ স্থানের জনসাধারণকে এই সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য দায়ী করা হলো এবং কিছু কিছু ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রদত্ত হলো। এতে আইন জারী করা হলো বটে, কিন্তু মানুষের মন জয় করা গেল না। কোন স্থানে রাতের অন্ধকারে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে আশে পাশের লোক দোষী নাও হতে পারে। এতে তাদের কোন জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু সামরিক ব্যক্তিদের হিসাব নিকাশ বেসামরিক ব্যক্তিদের মাপকাঠির বাইরে, তাই অনেকের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামরিক

বাহিনীকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা গেল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই জানমালের নিরাপত্তার খাতিরে গ্রামবাসীরা রাত জেগে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পাহারা দেবার ব্যবস্থা করল। এ সত্ত্বেও কোথাও কোন সন্ত্রাসমূলক ঘটনা পুনরায় ঘটলে আশে পাশের জনসাধারণ ভিটে ছাড়া হয়ে দূরের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের এই অবস্থার জন্য সন্ত্রাসবাদীরাই দায়ী, না সামরিক বাহিনী দায়ী, এ বিচার করবে কে ? কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার সন্ত্রাসবাদীদের এই কার্যকলাপে নিশ্চুপ থাকতে পারে কি ?"

সা'দ আহমদ বেশ কল্পনাপ্রবণ জামায়াতী। তার মতে, শান্তি কমিটি যেভাবে কাজ করছিল তাতে দেশে শান্তি ফিরে আসত। কিন্তু শান্তি এল না ভারতীয় প্রপাগান্ডার কারণে। তারপরও মানুষ ফেরা শুরু করেছলি ইয়াহিয়ার আহ্বানে কিন্তু ভারতীয় সরকার শরণার্থীদের ফেরায় বাধা দিচ্ছিল। শুধু তাই নয়, শান্তি কমিটি অনেক লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। একসময়ের শান্তি কমিটির নেতা সা'দ আহমদের মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ অনুচ্ছেদটি এখন উদ্ধৃত করছি—

"ইয়াহিয়া সরকারের এ সমস্ত সিদ্ধান্ত তার সামরিক উপদেষ্টাদের সাহায্যে গৃহীত হয়নি বরং এ দেশেরই মানুষ যারা সামরিক শাসনামলে সৃষ্ট বহুবিধ মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্য ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছিল তাদেরই প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগের ফলে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো। তাছাড়া আরও একটি বিষয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। বিভিন্ন সময় সামরিক বাহিনীর হাতে যারা ধরা পড়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শান্তি কমিটির সদস্যরা তাদেরকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। বন্ধন আত্মীয়তার হলেও দলগত কারণ পেশ করা হয়েছে মুক্তির জন্য। বন্দীকে মুসলিম লীগ, জামায়াত ইত্যাদির সমর্থক বানিয়ে সামরিক বাহিনীর রোষানল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই শান্তি কমিটির সদস্যদের এ সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। কারাগারে আবদ্ধ সরকারী কর্মচারীদের স্বপক্ষে শান্তি কমিটি প্রশংসা পত্র দিয়েও তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। এরূপ বহু ঘটনার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত যা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দেরই উপরকার যুগিয়েছে বেশী। দেশের সবাইকেই মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি,ডি,পি ইত্যাদি হিসাবে পরিচিত করা হয়েছে। সামরিক বাহিনীর অনেক অফিসার ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছেন, দেশবাসীর সবাই যখন মুসলিম লীগ, জামায়াত, পি,ডি,পি তখন আপনারা ভোট পেলেন না কেন ? উত্তর আমাদের জানা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্নেই চেপে যেতে হয়েছে। যাই হোক এতদসত্ত্বেও ইয়াহিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হলো না। ভারত থেকে শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসার উপর কড়াকড়ি আরোপিত হলো ভারত সরকারের তরফ থেকে। আওয়ামী লীগ

নেতৃবৃন্দের চলাচলের উপরও সন্ধানী সৃষ্টি রইলো সদা জাগ্রত। আর সেই সঙ্গে ভারতের প্রচারাভিযান চলল আরও জোরে। ফিরে আসা শরণার্থীদের নানা মনগড়া হয়রানীমূলক কাহিনী প্রচার করে ভীতি ও আশংকার সৃষ্টি করল, ভারতে রয়ে যাওয়া শরণার্থীদের মনে। দেশের মানুষের দেশে ফিরে আসার পিছনে কোনই প্রতিবন্ধকতা ছিল না–ছিল শুধু মিথ্যা ও অপপ্রচার আর ছিল অমূলক ভয় ও আতঙ্ক—যারও উৎস ছিল মিথ্যা কাহিনী ও কল্পনা।"

রাজাকাররা উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কেন ? কারণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। সা'দ আহমদের লেখার কোথাও এ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না যে, ১৯৭০ সালের অখণ্ড ম্যান্ডেট পাওয়ার পরও যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না তখন আবারও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় কীভাবে। আর সেই ম্যান্ডেট কার্যকর না করার জন্যইতো মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু প্রবাদইতো আছে 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।' উপনির্বাচনে রাজাকারদের অংশগ্রহণের ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায় তখন কাল্পনিক কাহিনী। যেমনটি সা'দ আহমদ লিখেছেন—

"দেশের সংহতি ও অখণ্ডতাকে বজায় রেখে এবং অচলাবস্থাকে দূর করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবার জন্য ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। অসহযোগিতার মাধ্যমে কোন মতেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত হতো না। আবার ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান হতে এদেশকে বিচ্ছিন্ন করবার পক্ষপাতি আমরা ছিলাম না। কেননা ইতিহাসের শিক্ষানুযায়ী দেখা যায় এরূপ আন্দোলন আযাদীর পথে দেশবাসীকে এগিয়ে দেয় না বরং গোলামীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে মানুষের জন্য নিয়ে আসে অন্তহীন সমস্যা। সাড়ে ৪ কোটি পশ্চিম পাকিস্তানীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 'পঞ্চান্ন কোটি' ভারতবাসীর খপ্পরে পড়ে আমরা তাদের জন্য শোষণের স্থান করে দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের স্বাধীন বলে দাবী করতে পারি না। সাড়ে ৪ কোটি পশ্চিমার শোষণে সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা শক্তি দিয়েও বন্ধ করতে পারবে, কিন্তু ৫৫ কোটির শোষণ থেকে বাঁচবার কোন প্রচেষ্টাই কার্যকরী হবে না। শুধু সংখ্যার প্রশ্নেই নয় ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়েও ভারতের প্রভাব থেকে কোন দিনই মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশই যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শোষণ ও বঞ্চনার অভিযোগে আন্দোলনের পথে এগুচ্ছে। তখন ভবিষ্যতে 'এদেশের মানুষও বিভিন্ন স্বার্থের প্রশ্নে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব দেখাবে। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতকে ডিঙ্গিয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কঠিন হবে। ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রশ্নগুলো বাদ দিয়েও শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও আমরা ভারতের অস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হবার

পক্ষপাতি ছিলাম না। কেননা এই 'দুর্দিনের দেনা' কোন দিনই পরিশোধ হবে না। অর্থের পূজারী ভারতীয় হিন্দু জাতি 'আসলের দায়ে' নয়। শুধুমাত্র সুদের দায়েই আমাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে বন্ধকী মাল হিসাবে নিলামে গ্রাস করে নেবে। তাই আমরা এদেশের স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে ছিলাম না, দাবী দাওয়া আদায়ের বিরোধী ছিলাম না। ভারতীয় অস্ত্র ও কূটনীতির সাহায্যে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হবার বিরোধী ছিলাম। ইয়াহিয়ার ঘোষণা মোতাবেক উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান করা, তখনকার পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আর এই নীতির উপর জনমত গড়ে তোলাও ছিল আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব। ইয়াহিয়া খান তাঁর ঘোষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সামরিক গভর্ণরের স্থলে রাজনীতিবিদ গভর্ণর নিযুক্ত করলেন এবং এর পর পরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'অস্থায়ী মন্ত্রীসভা' এই ঘোষণার আন্তরিকতা প্রমাণে সাহায্য করল।"

সা'দ আহমদের ভাষায় এরপর দেশে "সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল", অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাক হানাদার ও রাজাকারদের কাছে মুক্তিবাহিনী ছিল "দুস্কৃতকারী" ও তাদের লড়াই ছিল 'সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ'। তারা ভারতের সাহায্যে দেশে প্রবেশ করতে শুরু করল। সা'দের ভাষায়–

"শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ, পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী নেতৃস্থানীয় নাগরিক, গ্রাম্য রাজাকার ইত্যাদি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো। গ্রাম্য রাজাকাররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সাহসিকতা ও মনোবলের দিক দিয়ে রাজাকারদের চাইতে অনেক নিম্ন শ্রেণীর ছিল, কিন্তু হাতিয়ারের দিক দিয়ে ছিল সুসজ্জিত। আধুনিক ও হালকা আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর গুলী ও রসদ নিয়ে মুক্তিবাহিনীরা ভারত থেকে অনুপ্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে হামলা করত। আর রাজাকারদের ছিল সেকেলে রাইফেল ও পাঁচ থেকে দশ রাউন্ড গুলী। সামরিক বাহিনী রাজাকার বাহিনী গঠন করল ঠিকই, প্রয়োজনীয় ট্রেনিংও দিল, কিন্তু সময়োপযোগী হাতিয়ার ও প্রয়োজনীয় গুলী রসদ তাদের হাতে তুলে দিল না। মনে হয় বিশ্বাসের অভাব ছিল। এসত্ত্বেও অনেক আক্রমণে বা খণ্ডযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিহত হয়েছে এবং অনেকে ভারতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই সমস্ত ফলাফলে অবশ্য রাজাকারদের উপর সামরিক বাহিনীর বিশ্বাস বেড়েছে এবং রাজাকারদের উন্নত ট্রেনিংদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু ততদিনে পরিস্থিতি মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। সন্ত্রাসমূলক কাজ চালিয়ে ও মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজাকার

পাকিস্তানপন্থী মানুষ বা সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সংখ্যককে হত্যা করে এদেশকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। একথা ভারতীয়রা ভাল করেই উপলব্ধি করলো। একমাত্র পশু শক্তি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে ধ্বংস করতে পারে এই বিশ্বাসের উপর ভারত মরণ কামড় দিবার জন্য সমরায়োজন শুরু করল।"

উপ-নির্বাচনে রাজাকাররাই দাঁড়িয়েছিল। যারা জিতেছিল তাদের ইসলামাবাদ নিয়ে যাওয়ার কথা হলো তাদের প্রভু ইয়াহিয়াকে কুর্নিশ করে আসার জন্য।

## ৪২

সা'দ আহমদের কাহিনীর একটি বড় অংশ জুড়ে আছে ১৯৭২-৭৩ এর ঘটনাবলী ও জেল জীবনের বিবরণ যার কোনটিই আমাদের রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। জেলে থাকতেই তার বিচার হয় এবং "দণ্ডবিধির ১২১ ধারায় আমার শাস্তি ছিল ২০ বছর, উপনির্বাচনের অভিযোগে ৫ বছর, জেলা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার অভিযোগে ৫ বছর এবং শেষোক্ত দুই ধারায় দশ-বিশ করে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের জেল। যদিও মোট ৩১ বছর তবে শাস্তিগুলো যুগপৎ চলবার হুকুম থাকায় শাস্তির মোট মেয়াদ ছিল ২১ বছর।" অবশ্য পৌনে সাত'শ দিন পরই তিনি ছাড়া পেয়ে যান।

জেলের যে বিবরণ দিয়েছেন সে বিবরণে অসাধারণত্ব কিছু নেই। জেলের বিবরণ যারা দিয়েছেন তাদের সবার বিবরণ প্রায় একই রকম। তবে, রাজাকাররা উল্লেখ করেন ১৯৭২-৭৩-এর সময়টায় জেলে, বিশেষ করে ঢাকা জেল ছিল বিদ্বান ও ইসলামী জলসায় পূর্ণ মানুষে ভর্তি। সা'দও সেই কথা লিখেছেন। জেল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সিতারায় সিতারায়। তার ভাষায়—

"পুরনো হাজতের হল ঘরটিতেই যে শুধু এই নীরব সংগঠন গড়ে উঠেছিল তা নয়, বরং গোটা জেলের বিভিন্ন খাতায়, বিভিন্ন দেওয়ালের মাঝে একই পরিবেশ গড়ে উঠছিল। সরকারের কল্যাণে কত জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষাবিদ, হাফেজ, কারী, মওলানা, মোহাদ্দেসীন, ইসলামী আন্দোলনকারী নেতা-কর্মী ও ছাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত গোটা জেলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ডুবে থাকে। ছিন্ন ময়লা বস্ত্রের আড়ালে, অযত্ন ও অবহেলার ছাপ সারা শরীরে, জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিম্ন পর্যায়ের কাজের পরিবেশে অনেককেই প্রথমে চেনা যায়নি। কিন্তু এসব নক্ষত্রের উজ্জ্বল

আভায়, প্রতিভা দৃপ্ত চাউনী আর সারা মুখে নিষ্পাপ ও নির্দোষীতার পবিত্র ও নির্মল ছাপ থেকে তাদের চিনে নিতে দেরীও হয়নি। সময় সুযোগ মত বুকে চেপে ধরেছি। আর উভয়ে উভয়কে ধৈর্য্যের সবক দিয়েছি। এরাই নিজ নিজ স্থানে হাজতীদের ভাঙ্গা মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ক্ষণেক বিপর্যয়ের মুখে উন্নত শির নিয়ে দাঁড়াতে বলেছে, আর সালাত ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবার শিক্ষা দিয়েছে। প্রচেস্টা সফল হয়েছে। নামাজীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েছে, আল্লাহর রহমতে নূতন দিনের সোনালী প্রভাত দেখব। এই আত্মপ্রত্যয় সবার মনে বলিষ্ঠভাবে রূপ নিয়েছে। রাত্রে এশার নামাজ বাদে যখন আমাদের ৩০/৩৫ জনের কণ্ঠে আল্লাহর ধ্বনি ওঠে তখন যেন শুনতে পাই সারা জেলে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার হাজতীর বলিষ্ঠ আওয়াজ, জেকের, দরুদ। আমাদের কম সংখ্যকের ক্ষীণ আওযাজ ওদের বলিষ্ঠ আওয়াজের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়— মজলুমের ফরিয়াদ হয়ে আহকামুল হাকেমীনের দরবারের দিকে ছুটে চলে রকেটের চাইতেও তীব্র বেগে।"

অন্যান্য রাজাকারদের তুলনায় সা'দ আহমদের রচনা খানিকটা নমনীয় এবং বৈচিত্র্যহীন। এবং এর প্রথম ১০০ পাতাই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় যেখানে বিধৃত হয়েছে রাজাকারি মন। সবশেষে তার একটি মুনাজাতের কথা উল্লেখ করব। এ ধরনের মুনাজাতের বয়ান আল-বদর আমিনুল বা আয়েনউদ্দিনের বইয়েও আছে।

"প্রভু হে— জালেমের কারাগারে বন্দী থেকেও এক মাস সিয়াম সাধনা করে তোমার হুকুম পালন করেছি, প্রভুহে মজলুমদের রোজাকে কবুল করে নিয়ে একে তোমার সাহায্য ও সন্তুষ্টি পাওয়ার ওছিলা বানিয়ে নাও। প্রভু হে—বিভিন্ন কারাগারের অন্তরালে আজ অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ গুমরিয়ে কাঁদছে, জালেমের গুলী ও লাঠি এখানেও বহু ভাইয়ের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানে অবহেলায়, বিভিন্ন রোগ ব্যধিতে বহু ভাই প্রাণ দিয়েছে, অনেকেই ধুকছে আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। কারাগারের বাইরেও লক্ষাধিক মানুষের পিছনে হুলিয়া লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিবার পরিজন শুভাকাঙ্ক্ষীরা সীমাহীন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আছে। সরকারের ভ্রুকুটি আর্থিক দুর্গতি ও হাজারো ব্যথা বেদনায় তারা মানবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রভু হে—তুমিই একমাত্র হেফাজতকারী, তুমি শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, তোমার পরিকল্পনা দ্বারা জালেমের সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থকরে দাও। প্রভু হে—জালেম ও অত্যাচরীদেরকে নিজেদেরকে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যস্ত রেখে শান্তি ও ইজ্জতের সংগে আমাদের মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করে

দাও। প্রভু হে—পৌত্তলিকতার কালো ছায়া তাওহীদের মশালকে নির্ভিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসছে। আমরা অসহায়, বন্দী, লৌহ কপাটের অন্তরালে আবদ্ধ তাই তোমার রহমত ও সাহায্যের উপরই নির্ভর করছি। তুমি মানুষের অন্তর রাজ্যেরও বাদশাহ–যারা এদেশের দ্বীনি বুনিয়াদ নষ্ট করে পৌত্তলিকদের ছলনায় মোহগ্রস্ত হয়েছিল তাদের অন্তরকে তুমি পরিবর্তন করে দাও-ওদের মনে তোমার দ্বীনের প্রতি ভালবাসা পয়দা করে দাও। প্রভুহে—বাতিলের মধ্য থেকে ওমর, হামজা, খালেদ, মুছা, তারিক পয়দা করে দাও। বিভ্রান্ত জাতির মধ্য থেকে তোমার দ্বীনের নিশান বরদার পয়দা করে দাও, আর সামান্যতম একজন কর্মী হিসাবে ঐ নিশানের অধীনে কাজ করবার তৌফিক দাও। নির্যাতনমূলক ও মানবতা বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় তোমার নুরের মশাল জ্বালিয়ে মুক্তির পথকে আলোকিত করে কল্যাণ ও শান্তির পথে চলবার সুযোগ দাও। আর এ জাতির বিভ্রান্তির ঘোর যদি না কাটে তবে আমাদের ব্যথিত প্রাণের আওয়াজ তোমার বান্দা অনাগত কোন মুহাম্মদ বিন কাসিমের কানে পৌছে দাও। প্রভু হে— আমাদের দোয়া কবুল কর। প্রভু হে— আমাদের বর্তমান নির্যাতীত অবস্থা দোয়া কবুলের ওছিলা বানিয়ে নাও। আমীন।”

মুনাজাতের মূল বিষয় হলো– আমরা বিভ্রান্ত জাতি। জালেম ও অত্যাচারী। আমাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ত্বরান্বিত করে তাদের মুক্তির পথ সুগম হোক। নির্যাতন মূলক ও মানবতাবিরোধী সমাজ গড়েছি আমরা স্বাধীনতার পর। আর এর বিপরীতে হচ্ছে রাজাকাররা যারা বিভ্রান্ত নয়, জালেম বা অত্যাচারীতো নয়ই। তারা মানবতার পক্ষে ও পরোপকারী। জীবিত অবস্থায় স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও রাজাকারের কাছ থেকে এ বাণী শুনতে হলো। জানি না খোদার ইনসাফ কাকে বলে ?

## ৪৩

জামায়াতের একসময়ের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের গ্রন্থের নাম *‘স্মৃতি সাগরে ঢেউ।’* ১৯৭৬ সালে ক্রাউন সাইজের প্রায় দু'শ' পাতার এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আটটি ‘নিবন্ধের’ সঙ্কলন গ্রন্থটি। নিবন্ধগুলো আত্মকাহিনীর ঢংয়ে লেখা। তাঁর বাল্য ও যৌবনকালের কিছু ঘটনা এতে বিধৃত হয়েছে। ‘গ্রন্থের পটভূমি’তে তিনি জানিয়েছেন, “অতীত জীবনের বিভিন্ন সময়ের কিছু সত্য ঘটনা বাংলা সাহিত্যের তুলি দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করেছি

মাত্র।"

*'স্মৃতি সাগরে ঢেউ'* থেকে আমরা জানতে পারি আব্বাস আলীর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। হুগলীর মাদ্রাসায় কিছুদিন পড়াশোনা করেছেন। কিছুদিন সরকারী চাকরি তারপর পূর্ববঙ্গে হাইস্কুলে মাস্টারী করেছেন। একটি 'স্মৃতি চিত্রণ' থেকে জানা যায় আইয়ুব খানের সময় তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন। ব্যস এইটুকুই।

আমরা যে আব্বাস আলী খানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত সে আব্বাস আলী খানের কোন পরিচয় নেই এই গ্রন্থে। শুধু জানা যায়, তিনি জেলে বসে আটটি 'নিবন্ধ' রচনা করেছিলেন।

'গ্রন্থের পটভূমি'তে তিনি লিখেছেন— "একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর আমরা দশজন ফ্যামিলিসহ ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে উঠলুম। এটাকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের নিউট্রাল জোন (নিরপেক্ষ এলাকা) ঘোষণা করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। সারাদেশে তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। ঢাকা পতনোন্মুখ। দিবালোকে রাশিয়ান মিগ-২১-এর উপর্যুপরি হামলায় ঢাকাবাসীদের এক প্রাণান্তকর অবস্থা।"

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আব্বাস আলী কেন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে উঠলেন? তিনি জানাননি। আমরা জানি সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী কেষ্ট বিষ্টুরা। এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি আব্বাস আলী ছিলেন হানাদারদের সহযোগী। এই কয়েক লাইনেই কিন্তু আবার বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন– মিগ-২১-এর হামলায় ঢাকাবাসীর প্রাণান্তকর অবস্থা। না, ঢাকাবাসীর নয়, প্রাণান্তকর অবস্থা ছিল হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকারদের। ঢাকাবাসীরা দিব্যি ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে সে অবস্থা উপভোগ করেছে মাত্র।

আব্বাস আলী এরপর জানিয়েছেন– " ষোলই ডিসেম্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের হোটেল ঘেরাও করা হলো। ঘেরাওকারীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলুম আমরা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘেরাওকারীদের মুখে মুহুর্মুহু ধ্বনি হচ্ছিল– 'গভর্নর ডাঃ মালেক ও তার মন্ত্রীদের মুণ্ডু চাই'।"

এই ঘেরাওকারী কারা তা আব্বাস আলী জানাননি। এই ঘেরাওকারীরা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা মন্ত্রীদের "মুণ্ডু" চাচ্ছিলেন। আব্বাস আলী ছিলেন এই মন্ত্রীদের একজন। মালেক মন্ত্রিসভার তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী।

তাঁদের বাঁচাবার জন্য রেডক্রস নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে। "যাই হোক দেড়মাস কাটালুম ক্যান্টনমেন্টে। বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রেডিওর পালিশ করা খবরগুলো শুধু শুনতে পেতুম।" "পালিশ করা খবর" মানে বাংলাদেশের খবর। সেগুলো পালিশ করা অর্থাৎ মিথ্যা। প্রাক-স্বাধীনতা আমলের খবর পালিশ করা ছিল না কারণ সেগুলো ছিল পাকিদের।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাদের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়? লিখেছেন তিনি– "বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদেরকে আর ঘরে ফিরে যেতে দেয়া হলো না। প্রত্যেকের ঘরে ছেলেপুলে মায়ের কোলে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। পুরুষ মানুষ বলতে কারও ঘরে কেউ নেই। আমাদেরকে যেন টোপ দিয়ে ডেকে এনে বেঁধে ফেলা হলো। এমনটি অতীতে কাউকে করা হয়েছে বলে জানা নেই। নিজ নিজ বাসায় না ফিরেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে শেষ বিদায় নিলুম।"

এই অনুচ্ছেদটি পড়ে মনে হবে কতো না অন্যায় করা হয়েছে আব্বাস আলীদের ওপর! আসল কথা অন্য। ক্যান্টনমেন্টে, আব্বাস আলীর ভাষায়ই, রাখা হয়েছিল জামাই আদরে। পাকি অফিসারদের কোয়ার্টারে তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে ছিলেন। ভারতীয় বাহিনী তাঁদের পাহারা দিয়ে রেখেছিল। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারতীয় বাহিনী তাদের হস্তান্তর করে বাংলাদেশ সরকারের হাতে। পুলিশ তাদের জেলে নিয়ে যায়, তাদের পরিবার পরিজনদের পাঠিয়ে দেয়া হয় নিজ নিজ বাসায়। আব্বাস আলী উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন 'টোপ'। ইচ্ছাকৃতভাবেই, যাতে পাঠকদের মনে হয় তারা নিরীহ। ছাগলকে যেমন বাঘের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে আব্বাস আলীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, তারা যখন রাতের আঁধারে পুরুষদের হত্যা করার জন্য নিয়ে যেত, তখন খালি বাসায় নারী-শিশুদের কেমন লাগত ? কারণ, তারা জানত, তাদের প্রিয় মানুষটি ফিরে আসবে না। আব্বাস আলীদের পরিবাররা জানত, বাংলাদেশের পুলিশ কোথায় তাদের নিয়ে যাচ্ছে– জেলে। জেল একটি ঠিকানা, আশ্রয়। অবশ্য, শেষে প্রমাণিত হয়েছে, জেল মুক্তিযোদ্ধাদেরও শেষ আশ্রয় নয়, সেখানে তাদের হত্যা করা হয় কিন্তু রাজাকাররা বেঁচে থাকে।

সুতরাং ঠাট্টা করে আব্বাস আলী খানই লিখতে পারেন, "দুর্ভাগ্য বলুন আর সৌভাগ্যই বলুন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ছ'শ' উনআশি দিন কাটিয়েছিলুম। এটাকে আমি আলবত সৌভাগ্যই বলব। সুধীজন তা অবশ্যি বুঝে ফেলবেন।" না, কিছুই বোঝার উপায় নেই। অন্তত বর্তমান প্রজন্ম বুঝবেই না আব্বাস আলী কী ছিলেন। হয়ত মনে প্রশ্ন জাগবে, নিরীহ লোকটাকে কেন জেলে নেয়া হয়েছিল?

আব্বাস আলীকে জেলে নেয়া হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি জামায়াতের শুধু নেতৃস্থানীয়ই ছিলেন না, ছিলেন শান্তি কমিটির অন্যতম সংগঠক। এই আব্বাস আলীই ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঘোষণা করেছিলেন– "গুজব রটনাকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, হিন্দুস্থান অথবা কল্পনা রাজ্যের তথাকথিত বাংলাদেশের স্বপক্ষে প্রচারণাকারীরা আমাদের দুশমন। তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। প্রথম সুযোগেই তাদের বিষদাত ভেঙ্গে দিন। আমাদের রাজাকার,

আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনীগুলোর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ রক্ষার কাজে নেমে পড়ুন।" শুধু তাই নয়, ১৯৮০ সালে জামায়াতের কর্মকাণ্ড শুরু করার সময় প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন— "৭১-এ আমরা যা করেছি ঠিক করেছি।" খাঁটি রাজাকারের মন। কিন্তু, এই মনের কোন পরিচয় রাখেননি আত্মস্মৃতিতে। সেটিও রাজাকারের একটি বৈশিষ্ট্য।

## ৪৪

ডাঃ আবদুল বাসেত এক সময় বেশ নামকরা চিকিৎসক ছিলেন। রাজাকার হিসেবে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। জেলে বসে তিন খণ্ডে তিনি একটি আত্মজীবনী রচনা করেন– *গাঁয়ের নাম মিঠাখালী, হৃদয় আমার কাঁদেরে* ও *চক্রবৎ পরিবর্তনান্তে।*

গ্রামের একটি ছেলে কীভাবে নানা প্রতিকূলতা জয় করে প্রতিষ্ঠিত হলো সে কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে এই তিন খণ্ডে। রাজাকার হিসেবে যে ডাঃ বাসেত গ্রেফতার হয়েছিলেন সে কথা আজ হয়ত কারও মনে নেই। সরকারও তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দাঁড় করাতে পারেনি। ১৯৭১ সালে হয়ত হানাদারদের সাথে তার সামান্য যোগসাজশ ছিল। তার আত্মজীবনীর তিন খণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই এসব সম্পর্কে কোন বিবরণ নেই। কিন্তু ডাঃ বাসেত কি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন? না, করেননি, তাঁর বইতে এ ধরনের কোন প্রমাণ নেই।

মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় একটা ঘটনা তিনি সেরেছেন এক পৃষ্ঠায়। বিলাত ভ্রমণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি পৃষ্ঠা খরচ করেছেন। অর্থাৎ বিলাত ভ্রমণ মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে বড় ঘটনা! ১৯৭১ সালের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে–

"১৯৭১ সনের মার্চ মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে সঙ্কটময় অবস্থা দেশে দেখা গিয়াছিল সেইটি একটি দুঃস্বপ্ন, ইংরাজিতে যাহাকে বলে নাইটমেয়ার। যাহা গল্পের বইতেও ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম এবং মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বহু দূর দেশের ঘটনাবলী শোনা যাইত। তাহা কখনও নিজের দেশে দেখিতে পাইব ভাবি নাই। আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। কি সাংঘাতিক মারামারি, কাটাকাটি, ধ্বংসলীলা। হাজার হাজার লোকের দলে দলে গৃহত্যাগ, যে সাধ করিয়া বাড়ীঘর, সংসার, টাকা-পয়সা, ধনদৌলত করিয়াছিলো সবই

শুধু তাহার জান বাঁচাইবার জন্য সব কিছু পিছনে ফেলিয়া শূন্য হাতে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কাহারো মুখে কোন কথা নাই।"

কোথাও ৭ মার্চ, ২৫ মার্সের কোন উল্লেখ নেই। গণহত্যার কোন বিবরণ নেই। শুধু আছে "সাংঘাতিক মারামারি, কাটাকাটি, ধ্বংসলীলা"। কিন্তু কারা 'মারামারি'বা 'কাটাকাটি' করছে তার কোন উল্লেখ নেই। ডাঃ বাসেত ভেবেছিলেন, ১৬ ডিসেম্বর এসব থেমে যাবে। "১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নাইটমেয়ার (দুঃস্বপ্ন) শেষ হইয়া যাইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু চোখের সামনে দেখিতে পাইলাম নতুন নাইটমেয়ারের সূত্রপাত। পুরা উদ্যমে ধরপাকড়, ডাকাতি, হাইজ্যাক ইত্যাদি।" দুঃস্বপ্ন দীর্ঘায়িত হলো যখন তাকে গ্রেফতার করা হলো। কিন্তু কেন তাকে গ্রেফতার করে জেলে নেয়া হলো তার কোন কারণ তিনি দেখাননি। কোন রাজাকারই দেখায়নি। সবচেয়ে বড়কথা ১৯৭১-৭২ সংক্রান্ত তাঁর এক শ' পৃষ্ঠার বিবরণে কোথাও মুক্তিযুদ্ধ বলে কোন শব্দ নেই। অর্থাৎ রাজাকারদের পক্ষেই ছিলেন তিনি, সাহায্য-সহায়তাও করেছিলেন; কিন্তু নগ্ন রাজাকার হতে পারেননি। এইটুকুই যা তফাৎ।

## ৪৫

রাজাকারের মন কেমন বা কীভাবে সে চিন্তা বা কাজ করে তা পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। সে আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা যেতে পারে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তানের। বাঙালি মুসলমান তাতে পালন করেছিল অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু পঞ্চাশের দশকেই আবার বাঙালি মুসলমানের প্রগতিবাদী অংশ এই তত্ত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

এর বিপরীতে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সমর্থন করা দলগুলো। নতুন ভূখণ্ডে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তারা। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পদ দখল করে বিত্তবানও হয়েছিল তারা।

ফলে নব্য এলিটদের মধ্যে তাদের একটা ভিত্তি তৈরি হয়। ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার জন্য একটি 'আদর্শ'-এর প্রয়োজন হয়। কারণ, সাধারণ মানুষকে তো বলা যায় না যে, আমি লুট করার জন্য ক্ষমতায় যেতে চাই। মুসলিম লীগ ও সমমনাদের সেই আদর্শ ছিল। সেটি হলো দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং

ক্ষমতা যতই পাকাপোক্ত হতে লাগল ততই এর সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল নানাবিধ উপাদান।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গণতন্ত্রের একটা ভাব ছিল। আমলা শাসন তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে শাসকদের তত্ত্ব জোর করে চাপানো সম্ভব হয়নি। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও ততটা জোরদার হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পরে পটভূমিকা সম্পূর্ণ বদলে গেল। দ্বিজাতিতত্ত্ব রইল, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হলো ভারতবিরোধী প্রচারণা। এটিও সেই তত্ত্বেরই অন্য রূপ। এর অর্থ ঃ পাকিস্তান=মুসলমান, হিন্দু= ভারত। যদিও পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হলো নেপাল। অন্যদিকে সামরিক শাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একাংশের লোভ— সবকিছু মিলে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ করে দিল। সেই কারণেই আমলাতন্ত্র ও ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যে কমবেশি আঁতাত থাকে। এদের মাধ্যমেই আদর্শের মডেল ছড়িয়ে দেয়া হতে লাগল প্রচার মাধ্যম, পাঠ্যবই এবং সংস্কৃতিতে। সামরিক বাহিনীর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাকুল কালচারের বিষয়টিও যুক্ত হতে লাগল তত্ত্বে। কাকুলের সামরিক একাডেমীতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এদের শিক্ষার মূল নির্যাস ছিল— সামরিক বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। ইসলামী পাকিস্তানের শত্রু ভারত। সামরিক বাহিনী সৎ, রাজনীতিবিদরা অসৎ ইত্যাদি। আসল বিষয় হলো কর্তৃত্ব। 'আদর্শ' এভাবে হয়ে ওঠে ক্ষমতা রক্ষার ঢাল।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের ওপর শাসকদের তত্ত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ, সেখানে সমাজে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব ছিল বেশি। রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত কর্তৃত্ব করায়ত্ত ছিল সামন্তপ্রভুদের হাতে। হয়ত, অশিক্ষিত সমাজে ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য এ ধরনের কর্তৃত্বপরায়ণ আদর্শের দরকার ছিল, গণতান্ত্রিক আদর্শের নয়।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানে এই আদর্শ শাসকবর্গ বার বার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, পূর্ববঙ্গের সমাজ সামন্তসমাজ নয়। উঠতি মধ্যবিত্ত ছিল গণতন্ত্রমনা। ফলে ঐ আদর্শ বার বার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছিল। ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, মনি সিংহ এবং সবশেষে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জের বিপরীতে শাসক দল ও তাদের সহযোগীদের সামনে দু'টি পথ ছিল। এক. চ্যালেঞ্জ মেনে নেয়া, দুই. চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা। শাসকরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিল এবং তাদের সহযোগীরাও তাদের সমর্থন যুগিয়েছিল। সমর্থন যোগানোর কারণ, তাহলে তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ক্ষমতার প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা এবং সেখানে থাকতে হলেও মতাদর্শগত একটি

ঢাল থাকতে হবে মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য। সুতরাং এখানে পাকিস্তানের সেই আদর্শটির রক্ষক হয়ে উঠল তারা। এটির একটি উদাহরণ পাঠ্যপুস্তক।

মার্কিন গবেষক ইয়েভেত রোজার এর ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন পাকিস্তান যে আদর্শ (অতীতে ও বর্তমানে) প্রচার করতে চায় সেখানে ঐতিহাসিক সত্য দরকার নেই। আগে ইতিহাসের পাঠ্যবইতে উপমহাদেশে প্রাচীন ইতিহাস, বিশ শতকের ইতিহাসের কিছুটা থাকত। সামরিক শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেসব বিষয় উধাও হয়ে যেতে লাগল। পাকিস্তানের ইতিহাসের শুরুই হয় মুহম্মদ বিন কাসেমের সময় থেকে। আমাদের এখানেও পাঠ্যবই সেভাবে বদলে যেতে লাগল। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের *পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টির* কথা মনে পড়ছে। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার বইটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিএনআর (ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন) গঠিত হয়। কিন্তু এ অঞ্চলে সচেতন মানুষের কারণে এ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

এই দ্বন্দ্ব বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এক সময় আওয়ামী লীগই শাসকদের বিরুদ্ধে প্রধান দল হয়ে ওঠে। ছয় দফা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আদর্শের বিপরীতে বাংলাদেশ আদর্শের রূপটা স্পষ্ট হতে থাকে। এর প্রবক্তা হয়ে ওঠেন মুজিব। তাঁর দলও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে এ অঞ্চলে। শেখ মুজিব পরিণত হন বঙ্গবন্ধুতে। বাংলাদেশের স্বপ্নটা তখনই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

## ৪৬

১৯৫২ সালের পর পাকিস্তান আদর্শ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় ১৯৭১-এ। পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকরা তাঁদের দেয়া সাক্ষাতকারে আমাকে জানিয়েছেন, বাঙালির গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ তাঁদের পছন্দ হয়নি এবং তাঁরা জানতেন এক সময় পাকিস্তান থেকে বিযুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠবে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকেই মানসিকভাবে তারা এ জন্য প্রস্তুত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে ঝেড়ে ফেলার জন্য ১৯৭১ সাল ছিল একটি অজুহাত। কিন্তু সেটি যে অজুহাত, এটি স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানী শাসকরা বুঝতে দিতে চায়নি। কারণ তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানও কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারে।

১৯৭১ সালে, বাংলাদেশবিরোধীদের সামনে দু'টি পথ ছিল। বাংলাদেশ সমর্থন অথবা পাকিস্তান সমর্থন। বাংলাদেশ সমর্থন করলে রাজনৈতিকভাবে তাদের অস্তিত্ব থাকে না। আদর্শগত অবস্থানও নস্যাত হয়ে যায়। পাকিস্তান সমর্থনই ছিল স্বার্থগত দিক থেকে কাম্য। এছাড়া, তাদের পক্ষে এ কথা গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করার ব্যাপার ছিল যে, তাদের আদর্শের ধারাবাহিকতা আছে। তারা সৎ, অন্যরা নয়। এ কথাটিই কিন্তু সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁর আত্মজীবনীতে বার বার বলতে চেয়েছেন। বাংলাদেশবিরোধী আদর্শ ফলে ১৯৭১ সালে পরিণত হয় রাজাকারী আদর্শে। এ আদর্শ নিয়ে লড়াই করার আরেকটা বড় কারণ ছিল এই যে, তাদের অটুট বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান বাহিনী অজেয়।

পাকিস্তান আদর্শ কীভাবে চুইয়ে পড়েছিল নিচে তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকরা পাকিস্তান ভাঙার জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করেন, সেগুলো হলো–

১. হিন্দু শিক্ষকরা বাঙালিদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ফলে হিন্দুত্বের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি।

২. ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে প্ররোচিত করেছে বিদ্রোহে এবং লড়াইটি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের।

৩. ১৯৭১-এর যুদ্ধটা ছিল গৃহযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ হলো ভারতের অনুগত একটি দল। আওয়ামী লীগার ও সমর্থকরা সে কারণে ভারতের এজেন্ট।

৪. সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তারাই পাকিস্তান রক্ষা করবে।

৫. মুক্তিযোদ্ধারা দুষ্কৃতকারী।

৬. পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য ইয়াহিয়া ভুট্টো মুজিব দায়ী।

রাজাকারদের ভাষ্যগুলো পড়লে দেখা যাবে উপর্যুক্ত কথাগুলোই তারা বলছে এবং এখনও তাদের ও তাদের সমর্থকদের বক্তৃতা-বিবৃতির ধাঁচ সেই একই রকম। তারাও বলছে, হিন্দু ভারত পাকিস্তান ভেঙ্গেছে। এটি ছিল বাংলাদেশের মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ (অন্তিম লড়াই)। ১৯৭১ সালে যা ঘটেছিল তা'হলো গৃহযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধারা দুষ্কৃতকারী (সাজ্জাদ হোসায়েনের ভাষায় 'গ্যাংস্টার')। মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থকরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ধামাধরা, ভারতের দালাল এবং পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং ভারতই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র শত্রু।

## ৪৭

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যে সব রাজাকার আত্মজীবনী লিখেছেন, তাদের সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। শুধু তাই নয়, রাজাকারি আদর্শের প্রতি যে সব

শিক্ষিত অনুগত তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। এ কারণে, রাজাকাররা মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। এবং তা আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু সবসময় একে সমর্থন করা হয় এবং এ সমীকরণটি তুলে ধরা হয় ইসলাম = মাদ্রাসা। যে কারণে, এখনও মাদ্রাসার সমর্থনে অনেক রাজনৈতিক দল সোচ্চার, যদিও তাদের কারও সন্তান মাদ্রাসার ছাত্র নয়। তাদের ধারণা, গ্রামের অশিক্ষিত মানুষকে এভাবে উত্তেজিত রেখে দলে টানা যাবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সহজ হয়ে যায়। অথচ. এ সমীকরণটি সম্পূর্ণ ভুল।

মাদ্রাসা সনাতনী ধারণার প্রতীক। এই ভুল ধারণার ফলে সমাজের একটি অংশে বিশেষ করে গ্রামীণসমাজে সনাতনী ধারণা চক্রবৃদ্ধি হারে আধিপত্য বিস্তার করছে। আবুল মোমেন মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন–"মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলানারা অধিকাংশ সামাজিকভাবে এমন এক রক্ষণশীলতার পক্ষাবলম্বন করে থাকে যা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও নানারূপ কূপমণ্ডুকতাকে প্রশ্রয় দেয়।" যে কারণে, আমরা দেখি, প্রাকচল্লিশের মাদ্রাসার ছাত্র সাজ্জাদ হোসায়েন ও ষাটপরবর্তী মাদ্রাসার ছাত্র খালেক মজুমদারের চিন্তার মধ্যে মৌলিক কোন তফাত নেই। থাকে না।

১৯৪১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটির সদস্য মৌলভী মোজাম্মেল হক লিখেছিলেন, "সংস্কারের চেষ্টা চালিয়েও গত এক শ' বছরেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসায় সবচেয়ে বড় সঙ্কট এই খানেই যে, শিক্ষাঙ্গন হওয়া সত্ত্বেও এখানে তত্ত্ব ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ, পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পরিবেশ অনুপস্থিত। নানা সংস্কার ও পরিমার্জন ও উন্নয়ন সত্ত্বেও সম্ভবত একারণেই মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজ ও জাতীয় জীবনে কোন বড় অবদান রাখতে পারছে না।" [আবুল মোমেনের পুস্তিকায় উদ্ধৃত]

এ মন্তব্যের আরো ৫০ বছর পর একথা বলতে হয় যে, এখনও সংস্কারের চেষ্টা দূরে থাকুক বরং মাদ্রাসা শিক্ষা পরিপুষ্টির একটা প্রচেষ্টা সবসময় নেয়া হয়। কারণ, একে ঘিরে রয়েছে অবৈধ অর্থ রোজগার, ধর্ম ব্যবহার করে প্রতিপত্তি অর্জন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ ইত্যাদি। এসব কিছু আরো বেশি অর্থ লাভের উপায় করে দেয়। ফলে, জাতীয় জীবনে সঙ্কট আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাবে। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষা কোন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে না।

মাদ্রাসা শিক্ষিতরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বিরোধিতা করেছে, করছে এবং করবে। পাকিস্তান আদর্শের প্রতি তারা যতটা আত্মিক টানা অনুভব করে, বাংলাদেশ আদর্শের প্রতি ততটা নয়। 'মাদ্রাসা ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ে একটি সমীক্ষায় লিখেছেন আবুল মোমেন, "জাতীয় চেতনাবিহীন এই শিক্ষার আরও ভয়াবহ বিকৃতির প্রকাশ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়। কি ওহাবী কি সুন্নী বাংলাদেশের প্রায় সকল মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ছিল স্বাধীনতার বিপক্ষে। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম একেবারে হাতে গোনা দু'চারটি। অধিকাংশ মাদ্রাসা

পাকিস্তান রক্ষার দুর্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরাকে জিহাদ হিসেবে ধরা হয়েছিল। এখনও মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে অনেককে পাওয়া যাবে যারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র নিয়েছিল।

পরবর্তীকালে এর বিরোধী যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছে ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে তাতে শরিক হয়েছে এবং এই পরিবর্তনের ধারায় নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থন যুগিয়েছে। তাই দেখা যায়, মাদ্রাসার বিকাশ ও বিস্তারের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ ও আদর্শের বিরোধী চেতনার যেন শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।"

মাদ্রাসার নামে টাকা আদায় বিদেশী অনুদান গ্রহণ, পীর সংস্কৃতির বিকাশ— এ সমস্ত করে এক ধরনের শোষণ বজায় রেখেছিল এ চক্র। বাংলাদেশ হওয়ার পরও সে প্রক্রিয়া থামেনি। বরং আরো প্রশ্রয় পেয়েছে। কারণ সেই একই– ধর্মের জুজু। আবুল মোমেনের ঐ রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, "অধিকাংশ মাদ্রাসা দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় ভরা। এই মাদ্রাসাসমূহ সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিবছর বার্ষিক সভা, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি থেকে ভাল অংকের চাঁদা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া অনেক মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহের কাজে লাগায়।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, ১৯৭১ সালে অধিকাংশ মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বিপাকে পড়ে। কারণ, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তারা পরিবর্ধিত হতে পারে না। ১৯৭৫ সালের পর তারা অবলম্বন পেয়ে যায়। এর উদাহরণ, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সালের ভেতর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভূত বিস্তার। এবং এ কারণেই, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধীদের একটি শক্তিশালী কনসটিটিউন্সি তৈরি হয়েছে যা বাংলাদেশের আধুনিকায়নে একটি প্রতিবন্ধক।

## ৪৮

রাজাকারদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তারা কৌশলী। অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা করতে সে পিছ পা হয় না। ১৯৭১ সালের ঘটনার মধ্যে তারা অমানবিকতা খুঁজে পায় না। পাকিস্তানীরা বলে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়নি। রাজাকাররাও তাই বলে। কিন্তু আজ প্রায় ২৯ বছর পর মিরপুরের মুসলিম বাজারে যে বধ্যভূমি পাওয়া গেছে তা কোন্ সত্য তুলে ধরে?

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ১৯৭১ সালে গোলাম আযমের ভূমিকা কী ছিল তা বাঙালি মাত্রেরই জানা। এমনকি কেউ যদি প্রমাণের কথা বলেন তাহলে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার খবরই বড় প্রমাণ। হানাদার বাহিনীর তিনি শুধু অন্যতম সহযোগীই ছিলেন না, হত্যা, খুন, ধর্ষণের জন্য প্ররোচিতও করেছিলেন। কিন্তু রাজাকাররা এ কথা কখনই স্বীকার করবে না। শেখ আখতার হোসেন *জননেতা গোলাম আযম* গ্রন্থে লিখছেন--"পাকিস্তানের সামরিক সরকার যখন দেশ ও জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে হত্যা, জুলুম ইত্যাদি শুরু করলো তখন গোলাম আযম চুপ করে থাকেননি। মানুষ মরবে আর তিনি দেখবেন সে রাজনীতি তিনি করেন না। তাঁর জন্মভূমি পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাযত করার ক্ষেত্রে সে দেশের নাগরিক হয়ে যতটুকু দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তাই বলে দেশের মানুষকে হত্যা করতে হবে, এমন চিন্তার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ সত্য কথা বিরোধীদের জানা থাকলেও তারা এখন তা স্বীকার করবে না। ১৯৭১ সালকে তারা গোলাম আযমের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন গোলাম আযম তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এদেশের নিরীহ নিরপরাধ জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা যুগ কাল ধরে বলেও দেশের মানুষকে বোকা বানানো যায়নি। এবং যে ভারত ১৯৭১ সালে দেশের বন্ধু হিসাবে পরিচিত ছিল ভারতের বন্ধুরাই পরে জনপ্রিয়তা হারালো। গোলাম আযম যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বরং আরও বলা যায় তিনি এখন দেশের ইসলামী জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা।

১৯৭১ সালের ঘটনায় গোলাম আযমকে যে দৃষ্টিতেই দেখা হোক এটা সত্য যে তিনি গণহত্যার সাথে কোন দিক দিয়েই জড়িত ছিলেন না। কোন সরকারই তার প্রমাণ দিতে পারেনি। শুধু রাজনৈতিক ও আদর্শিক কারণেই তাঁকে স্বাধীনতাবিরোধী বলা হয়।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দিলাম এ কারণে যে, রাজাকারদের সম্পর্কে আগে যে মন্তব্য করেছি তা প্রমাণের জন্য। এখানে প্রচার করা হচ্ছে, গোলাম আযম কোন কিছুর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন না। তার একটি আদর্শ আছে যা অনেকের পছন্দ নয় তাই তাকে স্বাধীনতাবিরোধী বলা হয়। অর্থাৎ তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটের সঙ্গে জড়িত নয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পার্থক্য আদর্শিক। তেমনি, জামায়াতের সঙ্গে অন্যান্য দলের পাথর্ক্য আদর্শিক। ১৯৭১ একটি অজুহাত মাত্র।

এ কারণেই, ১৯৭১-এ যে তারা ভুল করেনি তা সগর্বে সভাসমিতিতে ঘোষণা করে সেই আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা প্রমাণের জন্য। আর ১৯৭১ সালে কি বাংলাদেশে কোন হিংস্র বা অমানবিক ঘটনা ঘটেছিল? এ প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চুপ থাকে বা এড়িয়ে যায়।

মার্কিন গবেষক ইয়েডেৎ রোজার এ বিষয়ে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"Denial and erasure are the primary tools of historiography as it is officially practiced in Pakistan." পাকিস্তান সরকার ও তার সহযোগীরা তাদের প্রচার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে এ কাজটি করে থাকে। তিনি জানিয়েছেন, সেখানে শিক্ষকরা ১৯৭১ সালের "আসল" ঘটনা বলে না চাকরি হারাবার ভয়ে। আমার অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম। পাকিস্তানী জেনারেল, সচিব, বুদ্ধিজীবী অনেককেই ১৯৭১ সালের গণহত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা কিছু জানেন না। (দু'একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়)। ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তাঁরা একই কথা বলছেন, রাজাকারদের ভাষ্যও সেই একই রকম।

পাকিস্তানের জনগণ বিশ্বাস করত পাকি সেনাবাহিনী অজেয়। ১৯৭১ সালেও তারা জয়ী হয়েছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন প্রায় এক লক্ষ অজেয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করল তখন তাদের মনোজগতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যে কারণে, ইমেজ তৈরির জন্য তাদের আফগানিস্তানে যেতে হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর বিজয়ও সেই একইভাবে এখানকার রাজাকারদের মনোজগত চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। তাদের আত্মজীবনীগুলো তাই তুলে ধরে।

সেই অবস্থা থেকে রাজাকাররা আবার নিজেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। পুরনো ত্রুটি শুধরে আবার নতুন করে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করছে। রাজাকারবাদের উপাদান হিসেবে আবার ভারত বিরোধিতা, ইসলামী উম্মার নামে পাকিস্তানী ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা ও ইসলামের নামে উম্মাদনা সৃষ্টি-এসব কিছুই যুক্ত করেছে। তাদের সহযোগী হিসেবে আছে কয়েকটি বড় দল। এবং লক্ষণীয় যে, বৈদেশিক ক্ষেত্রে তারা সে সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গড়তে চায় যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিরোধী ছিল।

## ৪৯

স্বাধীন বাংলাদেশে আবার রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে ১৯৭১ সালে তা কেউ ভাবেনি। এমনকি ১৬ ডিসেম্বরের পরও রাজাকারদের তা মনে হয়নি। কিন্তু তা হয়েছে, এবং এর জন্য আমরা সবাই কমবেশি দায়ী। যুদ্ধাপরাধীদের আমরা বিচার করিনি বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের সহযোগী করে তুলেছেন। সহযোগী না হলে এখনও কেন অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজাকারদের বক্তব্যের এতো মিল থাকে?

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে দু'ধরনের যুদ্ধাপরাধী ছিল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকার। এ বিষয়ে জে. এন. দীক্ষিতের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ *'লিবারেশন এ্যান্ড বিয়োন্ড ঃ ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশনস'*-এ নতুন অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দীক্ষিত জানিয়েছেন, পাকিস্তানী বাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এপ্রিল ১৯৭২-এর মধ্যে শেখ মুজিব এ সংখ্যা হ্রাস করে প্রথমে ১৯৫ এবং তারপর ১১৮তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি। তাঁর মতে, " One wonders whether this was deliberate on the basis of some understanding through back channels between Bangladesh and Pakistan at that time or whether it was a zenuine failure of not being able to gather credible evidence for an international court to try these war crimes. There was no doubt among Bangladeshi public that war crimes had heen committed."

এই যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তাই চাইছিল। দীক্ষিতের বই পড়ে তাই মনে হয়, যদিও কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেননি। শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যার্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে, "The substantative motivation for Mujib's decision might have been his long-term strategy of not doing anything which would prevent recognition of Bangladesh by Pakistan and other Islami countries; In the larger interest of peace and normalcy in the sub-continent Mujibur Rahaman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কি প্রার্থিত "stability" এসেছে ? না উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে?

তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ তাঁর *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম* গ্রন্থে লিখেছেন, দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তৎকালীন "সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিল না"। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন, রাজাকারদের বিচার শুরু হয়েছিল এবং দালাল আইন জারির পর "১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এতসব আইনগত বিধান, ছাড় ও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২,৮৪৮টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। তার মধ্যে মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দণ্ডিত হয়। বাকি অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাশ পান। ... যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টির এবং দিনে ৩/৪টির

বেশি বিচার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।"

এরপর তিনি অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক চাপ, একই পরিবারে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার- দুই-ই ছিল। এবং রক্ত সম্পর্কের কারণে অনেকে রাজাকারদের বাঁচাতে চেয়েছিল। রাজাকাররাও তাদের আত্মজীবনীতে এ ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ ত্রিশ বছর পর প্রশ্ন জাগছে, ঐ সব যুক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় কি সমাজে, রাজনীতিতে শান্তি এসেছে? আসেনি। কারণ, রাজাকারদের চরিত্র বিচার সে সময় করা সম্ভব হয়নি। এ প্রশ্ন সোচ্চারিত হয়ে ওঠেনি যে, যে অনুকম্পা রাজাকারদের প্রতি দেখান হয়েছে সে অনুকম্পা কি রাজাকাররা প্রদর্শন করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? বা কখনও কি তারা স্বীকার করেছে তারা ভুল করেছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর–না। হত্যার বিচার না হলে সভ্যতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। তা হলে যত চাপই থাকুক রাজাকারদের বিচার করাই উচিত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা রাজাকারদের প্রতি আমরা অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি। তাদের পুনর্বাসিত করেছি এবং আজ আবার রাজাকারদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু যে ত্রিশ লাখ শহীদ হলেন তাঁদের প্রতি কি এ পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য বিচার করা হয়েছে? তাঁদের প্রতি কি যথাযথ মর্যাদা দেখান হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরও হচ্ছে–না। এ প্রসঙ্গে দীক্ষিত উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যুদ্ধাপরাধী রাও ফরমান আলীকে যখন কলকাতায় পাঠান হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন, ভারতীয়রা ভাবছে বাঙালিদের সাহায্য করেছে দেখে বাঙালিরা তাদের পক্ষে থাকবে? থাকবে না। কারণ, "They had no capacity for gratitude" হয়ত, এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। কিন্তু ১৯৭১ পরবর্তী ঘটনাবলী কি এ মন্তব্যের যথার্থতাই প্রমাণ করে না?

আজ ত্রিশ বছর পর আমরা দেখছি, ঘটনাবলী যেন একটি বৃত্ত পূর্ণ করার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। রাজাকারদের বিচারের দাবি উঠছে এবং তা করছেন প্রধানত তাঁরাই যাঁরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং রাজনৈতিক দলের একটা বড় অংশের বক্তৃতা-বিবৃতিতে রাজাকারবাদের বিভিন্ন উপাদান ফিরে আসছে। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন দেশে এমনটি ঘটেনি। আর কোন দেশে এমনটি ঘটেনি যে, দুর্নীতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে এ কলুষ থেকে মুক্ত রাখার একটি উপায়ই আছে, স্বাধীনতা মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছিল তা রক্ষার একটি উপায়ই আছে এবং তা হলো প্রতিনিয়ত বলে যাওয়া–যে একবার রাজাকার সে সবসময় রাজাকার।

# পরিশিষ্ট : ১

যোগসাজশকারি বা রাজাকার বা দালালদের বিচারের বিষয়ে ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নেয়া মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান :

SECRET
MOST IMMEDIATE

Enclosed please find extracts from the decisions of the Cabinet meeting held on December 13, 1971 on the subject Trial of collaborators" and "Screening of employees of Government, semi-Government and autonomous bodies" This is for favour of information and necessary action. (H.T. Imam)
Cabinet Secretary.
15.12.71
U.O. No. ....(9)/Cab. Dated 15.12.71.

1. Acting Secretary-General.
2. Secretary, Foreign Affairs.
3. Secretary, Defence.
4. Secretary, G.A.
5. Secretary, Home/D.G., Police.
6. Secretary, Home Affairs.
7. Secretary, Finance.
8. Secretary, Information and Broadcasting.
9. Secretary, Agriculture.

EXTRACTS FROM THE MINUTES AND DECISIONS OF THE CABINET MEETING HELD ON DECEMBER 3. 1971.

AGENDA NO. 2.... Trial of Collaborators.

The Cabinet considered the summary on the subject "Trial of collaborators" and after due deliberation decided as follows

a) An announcement should be made forthwith to the effect that a machinery of justice is being established for the trial of collaborators and that pending trial all alleged collaborators should.

b) The recommendations contained in the summary on the subject "Trial of Collaborators", submitted by the Secretaris' Commettee, were accepted as noted below

(i) Tribunals will be formed for different categories of collaborators.

(ii) An announcement should be made through radio and other media of communication that local authorities under the Government of the People's Republic of Bangladesh have been authorised to arrange immediate arrest and safe custody of collaborators pending trial.

c) The Subject "Trial of Collaborators" should be immediately examined in details by a Committee of jurists and legal experts, who will advise the Government. particularly on the following matters

(i) Whether new law should be drafted to give legal form to the reommendations made to the Cabinet by the Secretaries' Committee or this should be done within the framework of the existing law. If the law on the trial of collaborators is to be framed according to the existing law/laws, under the provisions of the Proclamation of Independence Order dated April 10, 1971 and the laws Continuance Order dated April 10. 1971. how should it be fitted therein.

(ii) Whether the offence of collaboration should be given precise definition or it is covered sufficiently by the existing law dealing with such crimes as waging war against the State, sedition, murder, loot, arson etc.

(iii) What should be the composition of the tribunals or Special Courts ?

(iv) What category of Persons should be tried ?

(v) What other allied factors are to be considered and brought within the legal framework ?

(d) The Committee of Jurists and legal experts should be immediately constituted by the Ministry of Law and parliamentary Affairs and further neessary action should be taken by that Ministry. If necessary, the Ministry of Law and Parliamentary affairs may ask for the services of legal experts from the Government of India.

## পরিশিষ্ট : ২

রাজাকারদের বিচারের জন্য ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের জারিকৃত ফরমান

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLLAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

NOTIFICATION

No. 58-Pub.-24th January, 1972-The following Order made by the President, on the advice of the Prime Minister of the Peoples' Republic of Bangladesh on the 24th January 1972, is hereby Published for general information.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division).

President's Order No. 8 of 1972.

BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) ORDER. 1972.

WHEREAS certain persons, individually or as members of ogranisations, directly or indirectly, have been collaborators of the Pakistan Armed forces, which had illegally occupied Bangladesh by brute force, and have aided or abetted the Pakistan Armed forces of occupation in committing genocide and crimes against humanity and in committing atrocities against men, women, and children and against the person, property and honour of the civilian population of Bangladesh and have otherwise aided or co-operated with or acted in the interest of the Pakistan Armed forces of occupaton or contributed by any act, word or sign towards maintaining, sustaining, strengthening. supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by the Pakistan Armed forces or have waged war aided or abetted in waging war against the People's Republic of Bangladesh

AND WHEREAS such collaboration contributed towards the perpetration of a reign of terror and the commission of crimes against humanity on a scale which has horrified the moral consciences of the people of Bangladesh and of right-thinking people throughout the world

AND WHEREAS it is impertive that such persons should be dealt with effectively and be adequately punished in accordance with the due process of law

AND WHEREAS it is expedient to provide for the setting up of Special Tribunals for expeditious and fair trial of the offences committed by such persons

NOW THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972 and in exercise of all powers enabling him in the behalf, the President is, pleased to make the following Order.

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of March, 1971.

2. In this Order.

(a) "Code' means the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(b) "Collaborator" means a person who has—

(i) participated with or aided, or abetted the occupation army in maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by such army ;

(ii) rendered material assistance in any way whatsoever to the occupation army any act, whether by words, signs or conduct;

(iii) waged war or abetted in waging war against the People's Republic of Bangladesh ;

(iv) actively resided or sabotaged the efforts of the people and the liberation forces of Bangladesh in their liberation struggle against the occupation army;

(v) by a public statement or by voluntary participation in propagandas within and outside Bangladesh or by association in any delegation or committee or by participation in purported bye-elections attempted to aid the occupation army in furthering its design of perpetrating its forcible occupation of Bangladesh.

Explanation-A person who has performed in good faith functions which he was required by any purported law in force at the material time to do shall not be deemed to be a collaborator

Provided that a person who has performed functions the direct object or result of which was the killing of any member of the civil population of the liberation forces of Bangladesh or the destruction of their property or the rape of or criminal assault on their women-folk, even if done under any purported law passed by the occupation army, shall be deemed to be a collaborator.

(c) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh

(d) "Liberation forces' includes all forces of the People's Republic of Bangladesh engaged in the liberation of Bangladesh.

(e) "Occupation army" means the Pakistan Armed Forces engaged in the occupation of Bangladesh.

(f) "Special Tribunal" means a Tribunal set up under this Order.

3. (1) Any Police Officer or any person empowered by the Government in that behalf may. without a warrant arrest any person who may reasonably be suspected of having been a collaborator.

(2) Any Police Officer or person making and arrest under clause (1) shall forthwith report such arrest to the Government together a precis of the information or materials on the basis of which the arrest has been made, and, pending receipt of the order of the Government, may, by order in writing, commit any person so arrested to such custody as the Government may by general or special order specify.

(3) On receipt of a report under clause (2), the Government may by order in writing, direct such person to be detained for an initial period of six months for the purpose of inquiry into the case.

(4) The Government may extend the period of detention if, in the opinion of the government further time is required for completion of the inquiry.

(5) Any person arrested and detained before the commencement of this Order who is alleged to be a collaborator, shall be deemed to be arrested and detained under this Order and

AND WHEREAS such collaboration contributed towards the perpetration of a reign of terror and the commission of crimes against humanity on a scale which has horrified the moral consciences of the people of Bangladesh and of right-thinking people throughout the world

AND WHEREAS it is impertive that such persons should be dealt with effectively and be adequately punished in accordance with the due process of law

AND WHEREAS it is expedient to provide for the setting up of Special Tribunals for expeditious and fair trial of the offences committed by such persons

NOW THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972 and in exercise of all powers enabling him in the behalf, the President is, pleased to make the following Order.

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of March, 1971.

2. In this Order.

(a) "Code' means the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(b) "Collaborator" means a person who has—

(i) participated with or aided, or abetted the occupation army in maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by such army ;

(ii) rendered material assistance in any way whatsoever to the occupation army any act, whether by words, signs or conduct;

(iii) waged war or abetted in waging war against the People's Republic of Bangladesh ;

(iv) actively resided or sabotaged the efforts of the people and the liberation forces of Bangladesh in their liberation struggle against the occupation army;

(v) by a public statement or by voluntary participation in propagandas within and outside Bangladesh or by association in any delegation or committee or by participation in purported bye-elections attempted to aid the occupation army in furthering its design of perpetrating its forcible occupation of Bangladesh.

Explanation-A person who has performed in good faith functions which he was required by any purported law in force at the material time to do shall not be deemed to be a collaborator

Provided that a person who has performed functions the direct object or result of which was the killing of any member of the civil population of the liberation forces of Bangladesh or the destruction of their property or the rape of or criminal assault on their women-folk, even if done under any purported law passed by the occupation army, shall be deemed to be a collaborator.

(c) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh

(d) "Liberation forces' includes all forces of the People's Republic of Bangladesh engaged in the liberation of Bangladesh.

(e) "Occupation army" means the Pakistan Armed Forces engaged in the occupation of Bangladesh.

(f) "Special Tribunal" means a Tribunal set up under this Order.

3. (1) Any Police Officer or any person empowered by the Government in that behalf may. without a warrant arrest any person who may reasonably be suspected of having been a collaborator.

(2) Any Police Officer or person making and arrest under clause (1) shall forthwith report such arrest to the Government together a precis of the information or materials on the basis of which the arrest has been made, and, pending receipt of the order of the Government, may, by order in writing, commit any person so arrested to such custody as the Government may by general or special order specify.

(3) On receipt of a report under clause (2), the Government may by order in writing, direct such person to be detained for an initial period of six months for the purpose of inquiry into the case.

(4) The Government may extend the period of detention if, in the opinion of the government further time is required for completion of the inquiry.

(5) Any person arrested and detained before the commencement of this Order who is alleged to be a collaborator, shall be deemed to be arrested and detained under this Order and

an order in writing authorising such detention shall be made by the Government.

Provided that the initial period of detention of six months in the case of such person shall be computed from the date of this arrest.

4. Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law for the time being in force, any collaborator who has committed any offence specified in the Schedule shall be tried and punished by a Special Tribunal set up under this Order and no other Court shall have any jurisdiction to take cognizance of any such offence.

5. (1) The Government may set up as many Special Tribunals as it may deem necessary to try and punish offences under this Order for each district or for such area as may be determined by it.

(2) a Special Tribunal shall consist of one member.

(3) No person shall be qualified to be appointed a member of a Special Tribunal unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge.

6. (1) A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge shall try and punish offences enumerated in Parts I and II of the Schedule.

(2) A Special Tribunal consisting of an Assistant Sessions Judge shall try and punish offence enumerated in Parts III and IV of the Schedule.

7 A Special Tribunal shall not take cognizance of any offence punishable under this Order except upon a report in writing by an officer-in-charge of a police-station.

8. The provisions of the Code in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Order, shall apply to all matters connected with, arising from or consequent upon a trial by a Special Tribunal.

9. (1) A Special Tribunal shall not be bound to adjourn a trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice.

(2) No trial shall be adjourned by reason of the absence of any accused person, if such accused person is represented by counsel, or if the absence of the accused person or his counsel has been brought about by the accused person himself, and the Special

Tribunal shall proceed with the trial after taking necessary steps to appoint an advocate to defend an accused person who is not represented by counsel.

10. A Special tribunal may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to the offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative and to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof; and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 339 and 339A of the Code, be deemed to have been tendered under 338, of the Code.

11. Not withstanding anything contained in any other law for the time being in force,...

(a) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part I of the Schedule shall be punished with death or transportation for life and shall also be liable to a fine;

(b) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part II of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years and shall also be liable to a fine;

(c) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part III of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding five years and shall also be liable to a fine;

(d) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part IV of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for term not exceeding two years and shall also be liable to a fine.

12. Without prejudice to any sentence passed by the Special Tribunal, the property, immovable, movable, or any portion thereof, of a collaborator may, on his conviction, be forfeited to the Government, upon an order in writing made in this behalf by the Government.

13. If any accused is convicted of and sentenced for more than one offence, the sentences of imprisonment shall run concurrently or consecutively, as determined by the Special Tribunal.

14. Notwithstanding anything contained in the Code on person who is in custody, accused or convicted of an offence punishable under this Order shall be released on bail.

15. The provisions of Chapter XXVII of the Code shall apply to a sentence of death passed by a Special Tribunal.

16. (1) A person convicted of any offence by a Special Tribunal may appeal to the Hight Court.

(2) The Government may direct a Public Prosecutor to present an appeal to the High Court from an order of acquittal passed by a Special tribunal; upon intimation to the Speial Tribunal by the Public Prosecutor that such an appeal is being filed, the person in respect of whom the order of acquittal was passed shall continue to remain in custody.

(3) The period of limitation for any appeal under clause (1) shall be 30 days from the date of sentence and for an appeal under clause (2) shall be 30 days from the date of the order of acquital.

(4) The appeal may lie on matters of fact as well as of law.

17 (1) If the Government has reasons to believe that a person, who in the opinion of the Government, is required for the purpose of any investigation, enquiry or other proceedings connected with an offence punishable under this Order, is absconding or is otherwise concealing himself or remaining abroad to avoid appearance, the Government, may, by a written proclamation published in the official Gazette or in such other manner as may be considered suitable to make it widely known

(a) direct the person named in the proclamation to appear at a specified place at a specified time;

(b) direct attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person.

Explanation-"Property belonging to the proclaimed person" shall include property, movable and immovable, standing in the name of the proclaimed person or in the name of his wife, children, parents, minor brothers, sisters or dependents or any benamdar.

(2) If the property ordered to be attached is a attached is a debt or other movable property, the attachment shall be made,–

(a) by seizure; or

(b) by the appointment of an administrator; or

(c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any on his behalf; or

(d) by all or any two of the methods mentioned in subclauses (a). (b) and (c) as the Government may direct.

(3) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment shall be made in the case of land paying revenue to Government by the Deputy Commissioner of the district in which the land is situate and in all other cases.—

(a) by taking possession of the property; or

(b) by the appointment of an administrator; or

(c) by an order writing prohibiting the payment of rent or delivery of the property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or

(d) by all or any two of the methods mentioned in subclauses (a), (b) and (c) as the Government may direct.

(4)If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, the Government may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the Government.

(5) The powers, duties and liabilities of an administrator appointed under this Article shall be the same as those of a receiver appointed under Chapter XXXVI of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908).

(6) If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under this Article, within seven days from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property, and that such interest is not liable to attachment under his Article, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part

Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this clause may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.

(7) A claim or an objection under clause (6) may be preferred or made before such person or authority as is appointed by the Government.

(8) Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part by an order under clause (6) may, within a period of one month from the date of such order, appeal against

such order to an appellate authority; constituted by the Government, for such purpose, but subject to the order of such appeallate authority, the order shall be conclusive.

(9) If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the Government may make an order releasing the property from the attachment

(10) If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the Government may pass an order forfeiting to the Government the property under attachment.

(11) When any property has been forfeited to the Government under clause.

(10) it may be disposed of in such manner as the Government directs.

18. Not withstanding the provisions of the Code or of any other law for the time being in force, no action or proceeding taken or purporing to be taken under this Order shall be called in question by any Court, and there shall be no appeal from any order or sentence of Special Tribunal save as provided in section 16.

SCHEDULE

PART I

Offences under sections 121, 121A, 302, 304, 307, 376, 396 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.

PART II

Offences under sections 308, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 354, 363, 364, 365, 367, 368, 380, 382, 386, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 435, 436, 437, 438, 449 and 450 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.

PART III

Offences under sections 324, 332, 338, 343, 346, 348, 355, 356, 379, 384, 427, 428, 429, 430, 431 and 440 of the Penal Code and attempts to commit or the aberment of the commission of any of the offences.

(a) Offences under sections 336, 337, 341, 342, 352, 357, 374, 426, 447, and 448 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of the offences.

(b) Any act which is mentioned in Clause (b) of Aticle 2 of this Order, but which is not covered by any item under any of the parts in this Schedule.

A.S. CHOWDHURY
President of the
People's Republic of Bangladesh

DACCA;
The 24th January,
1972.

AZIMUDDIN AHMAD
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

NOTIFICATION

NO. 78-PUB.-7th February, 1972-The following Order made by the President on the advice of the Prime Minister of the Peoples' Republic of Bangladesh on the 6th February 1972, is hereby Published for general information.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division).

President's Order no. 11 of 1972.

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) (AMENDMENT) ORDER, 1972.

WHEREAS. it is expedient to amend the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972) for the purposes hereinafter appearing;

Now THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Amendment) Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972);-

(1) in Article 3,-

(a) in clause (2), for the word "Government", occurring for the first and second times, the words "Subdivisional Magistrate" shall be substituted; and

(b) in clause (3), for the word "Government", the words "Subdivisional Magistrate" shall be substituted:

(2) Article 8 shall be renumbered as clause (1) of that Article, and after clause (1) as so renumbered, the following new clauses shall be added, namely

"(2)" A Special Tribunal shall, for the purposes of the provision of the Code, be deemed to be a Court of Session trying cases without the aid of assessors or jury and without the accused being committed to it by a Magistrate for trial, and shall follow the procedure prescribed by the Code for the trial of summons-cases by Magistrates.

(3) in Article 17,-

(a) in clause (2), for the words and comma "shall be made" the words "shall be made by the Subdivisional Magistrate' shall be substituted, and the words "as Government may direct" be omitted;

(b) in clause (3), for the words and commas "in the case of land paying revenue to Government, by the Deputy Commissioner of the district in which the land is situate, and in all other cases, the words "by the Subdivisional Magistrate" shall be substituted; and the words "as the Government may direct" shall be omitted; and

(c) in clause (4); for the words and comma "Government may, if it thinks" shall be substituted;

(4) in Article 18, for the word and figures "section 16", the word and figures "Article 16" shall be substituted; and

(5) After Article 18, the following new Article shall be added, namely

"19. The Government may, by order published in the official Gazette, direct that any power or duty which is conferred or imposed by this Order upon the Government shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by any officer or authority subordinate to it."

A. S. CHOWDHURY
President of the
People's Republic of Bangladesh

DACCA :
The 6th February,
1972.

AZIMUDDIN AHMAD
Deputy Secretary.

FRIDAY, JUNE 2, 1972
PART IILA-Ordinances and Orders promulgated by the President of the People's Republic of Bangladesh.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

NOTIFICATION

No. 470-Pub.-2nd June, 1972-The following Order made by the President on the advice of the Prime Minister of the Peoples' Republic of Bangladesh on the 1st June 1972, is hereby Published for general information.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLAESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division).
President's Order No. 60 of 1972.

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) (SECOND AMENDMENT) ORDER, 1972.

WHEREAS it is expedient further to amend the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), for the purposes hereinafter appearing;

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Amendment) Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972),-hereinafter referred to as the said Order, for Article 6 the following shall be substituted, namely

"6. (1) Special Tribunal consisting of Sessions Judge or an Additional Sessions Judge may try and punish any of the offences specified in the Schedule.

(2) A Special Tribunal consisting of an Assistant Sessions Judge may try and punish any of the offences specified in Parts III and IV of the Schedule.

(3) A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge may transfer any case for trial to, or withdraw any case from, any other Special Tribunal within his jurisdiction."

3. In the said Order, in the Schedule—

(a) in Part III, after the word "sections" the figure and comma "148", shall be inserted; and

(b) In Part IV, after the word "sections" the figures and commas "143, 147", shall be inserted.

A.S. CHOWDHURY
President of the
People's Republic of Bangladesh

DACCA;
The 1st June,
1972.

AZIMUDDIN AHMAD
Deputy Secretary.

## পরিশিষ্ট : ৩

১৯৭৩ সালে জারি করা নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী

The Bangladesh Gazette
Extraordinary
Published by Authoritty
FRIDAY, JUNE 22, 1973
PART III-Act of the Bangladesh Parliament
BANGLADESH PARLIAMENT
DACCA, the 22nd June, 1973

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 21st June, 1973, and is published for general information

Act No. V of 1973

An Act to amend the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions)

order, 1972

WHEREAS it is expedient to amend the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972), for the purpose hereinafter appearing;

In is hereby enacted as follows

(1) short title and commencement.-(1) This Act may be called the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Amendment) Act, 1973.

(2) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of March, 1971.

2. Insertion of new Articles 2A and 2B, P.O. No. 149 of 1972.-In the Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149-1972) after Article 2, the following new Articles shall be inserted, namely—

2A–A person to whom Article 2 would have ordinarily applied and for his residence in the United Kingdom shall be deemed to continue to be permanent resident in Bangladesh within the meaning of that Article

Provided that the Government may notify, in the official Gazette, any person or categories of persons to whom this Article shall not apply.

2B.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in this Order, a person who-

(i) owes, affirms or acknowledges, expressly or by conduct, allegiance to a foreign state, or

(ii) is notified under the proviso to Article 2A shall not qualify himself to be a citizen of Bangladesh"

3. Repeal. The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) (Amendment) Ordinance, 1973 (Ord. X of 1973), is hereby repealed.

S. M. RAHMAN,

Secretary.

## পরিশিষ্ট : ৪

**১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল সরকারি নির্দেশে যে সব রাজাকারের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের তালিকা :**

The Bangladesh Gazette
Extraordinary
Published by Authority
**FRIDAY, JUNE 22, 1973**
**PART III-Act of the Bangladesh Parliament**
**BANGLADESH PARLIAMENT, DACCA.**
**WEDNESDAY, 18 APRIL 1973.**

Order and Notifications by the Government of the People's Republic of Bangladesh, the High Court, Government Treasury. etc.

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Immigration Branch
NOTIFICATION

Imn/III-18th April 1973-WHEREAS it appears that the persons below have been staying abroad since before the liberation of the Bangladesh by their conduct cannot be deemed to be citizens of Bangladesh.

Whereas the said persons have continued to be citizens of Pakistans.

Thenefore, the Government declares under Article 3 of the Bangladesh (Temporary Provisions) Order 1972 (P.O. No. 149 of 1972), that specified below do not qualify themselves to be the citizens of Bangladesh

(1) Hamidul Haque Chowdhury, Advocate s/o Aku Ali Chowdhury.

of Ramnagar P.S. Feni-Dist Noakhali and of Green Road, DACCA.

(2) Mr. A. T. Saddi, Advocate, S/O. Alhaj Nuruddin Abdus Salam of Saidpur, P.S. Shibganj, Dist. Bogra and of DACCA.

(3) Prof. Ghulam Azam, s/o Ghulam Kabir of Birgaon, P.S. Nabinagar, dist. Comilla and of Elephant Road, Maghbazar, Dacca.

(4) Mr. Korban Ali, Bar-at-Law, s/o Imanuddin of Kaijuri, P.S. Shahjadpur, Dist. Pabna.

(5) Prof. Yusuf Ali, s/o Hafizuddin, Vill. Baregaon P.S. Kaliganj Subdivision Sadar North, Dist. DACCA.

(6) Mr. Abu Taher Abdullah, s/o late Maulana Abdul Aziz of Kamardi P.S. Shibpur, Dist. DACCA.

(7) Mr. Shahjahan Chowdhury alias Fazle Rab Choudhury, S/o. Mr. Isamil Choudhury of Sadar Road, Barisal Town.

(8) Mr. Julmat Ali Khan, Advocate, s/o. Shamser Ali Khan of Dhanmondi P.S. Fulpur, Dist. Mymensingh and of Mymensingh Town.

(9) Prof. Abdul Khaleque, s/o. late Meseruddin of Kakua, P.S. Tangail and of Biswas, Betka, P.S. Tangail, Dist. Tangail.

(10). Prof. Abdul Hakim, s/o. Late Munshi Meseruddin of Kakua and of Biswas Betka, P.S. Tangail, Dist. Tangail.

(11) Maulana Fazlur Rahman, s/o Sufr-Ahmed Ali of Dumoria P.S. Nazir pur, Dist. Bakerganj.

(12) Prof. Sk. Ansar (Advocate), s/o. Azhar Ali of Uthail, P.S. Tala Dist. Khulna.

(13) Prof. Molla Harunur Rashid, s/o. Abdul Hamid of Baranal P.S. Terakhada,Dist. Khulna and of Khulna Town.

(14) Mr. Abdul Jabbar Khaddar alias Khaddar Miyan, s/o. Late Abdul Hamid Chaukidar of Gunak, P.S. Sonagazi, Dist. Noakhali and of 55 Nawabpur Road, Dhaka and of Sattar Manjil Rahmatgonj, Chittagong.

(15) Mr. N. A. Laskar, s/o Naser Ahmed Lasker of DACCA (Near Morning News Office).

(16) Mr. Nurul Amin, Advocate, s/o late Zahiruddin of Shabazpur P.S. Sarail Dist Comilla and of Mymensingh Town and Mymensingh and of 20 Eskation Road DACCA.

(17) Mr. Mahmud Ali, s/o Late Mujahid Ali of Sunamgonj Town and of Shaikhghat, Sylhet Town, Dist. Sylhet and also of c/o. Road no 19 Dhanmandi, DACCA.

(18) Mr. Shamsur Rahman, Advocate, s/o. Late Alfazuddin of 26 para P.S. Janjira and of Madaripur Town, Dist. Faridpur.

(19) Mr. Shamsuddin Ahmed, s/o late Zalqader Dewan of Hariadi P.S. Lauhajang DACCA and of N.C. Goswami Road Sutrapur.

(20) Mr. Wahiduzzaman alias Thanda Mia, s/o late Abdul Qader of Sitarampur, P.S. Kasiani and of Gopalganj Town, Dist. Faridpur and also of 3, Ram Krishna Mission Road DACCA.

(21) Mr. Qazi Abdul Qader, s/o late Qazi Abeduddin of Shoulmari, P.S. Jaldhaka, Dist. Rangpur and of Gulshan, DACCA.

(220 Mr. Saiyid Ashghar Hossain Zaidi, s/o. Saiyid Murtuza Hossain Zaidi of Gopalpur P.S. and Dist. Pabna.

(23) Mr.S.A. Sukur, s/o Abdul Gafur of Ashoktala, comilla Town.

(24) Mr. A. Q. M. Shafiqul Islam, s/o Abdus Sobhan of Birgaon, P.S. Nabinagar,Dist. Comilla and of DACCA.

(25) Maulana Abdur Rahim, s/o Haji Khabiruddin of Sealkati, P.S.Kaukhali, Dist. Barisal and of Shahjahanpur, DACCA.

(26) Maulana Abdul Haque, s/o late Maulvi Mr. Sayed of Chandpur Town and of Gobindia, P.S. Chandpur, Dist. Comilla.

(27) Maulana Ashraf Ali, s/o Munshi Wazed Ali of Dhanmandal, P.S. Nasirnagar, Dist. Comilla.

(28) Mr. Saiyid Kamal Hossain Rizvi, s/o Saiyid Jamal Hossin of 46/1-3 Hamendra Kumar Das Road, Sutrapur, DACCA.

(29) Major Raja Tridiv Roy Chakma Chief, s/o late Raja Nalinakshya Roy of Rangamati, Chittagong Hill tcrats.

(30) Mr. Golam Wahed Chowdhury, s/o late Golam Mawla Chowdhury of Habiganj, Dist. Faridpur and of 15, College Road, DACCA.

(31) Mr. Iqbal Idress, s/o Mr. M. Idrees (Rtd. I. G. P.), Chittagong/DACCA.

(32) Dr. Syeda Fatema Sadeque D/o late Mr. Khalilur Rahman of 21, Joynag Road DACCA.

(33) Mr. Abbas Ali alias Rowshan Ali Barrister s/o late Sitabuddin Akhond of Nasirghapara, P.S. Ullapara, Dist. Pabna.

(34) Mrs. Shamim Hussain, W/o late K.N. Hussain, Ex-I.G.P. of 3-D/12, Lalmatia, DACCA.

(35) Maulana Tamizuddin Ahmed, s/o Sujat Ali of Hallpara, P.S. Thakurgaon, Dist. Dinajpur.

(36) Mr. Humayun Khan Panni, s/o late Wazed Ali Khan Panni of Karatia, P.S. Tangail, Dist. Tangail, Ambassador for Pakistan in Syria.

(37) Mr. Shafiqullah, B.A.B.T., s/o late Raushan Ali Pandit of Lamchai P.S. Lakshmipur, Dist. Noakhali.

(38) Mr. Mahiuddin Chowdhury, M.A. Professor, s/o Abdul Wahab of Shamsherabad P.S.Lakshmipur, Dist. Noakhali.

(39) Mr. Sayedul Huq. Advocate, s/o late Ahmed Ali Mia of Bataiya P.S. Sudharam,Dist. Noakhali and of Maijdi Town.

By order of the Government
S. AHMED
Secretary.

## পরিশিষ্ট : ৫

**১৯৯২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি তিন খণ্ডে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকাশ করে। ১৯৯৪ সালে সাজ্জাদ হোসায়েন গ্রন্থটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন যা প্রকাশিত হয় বৃটেনের *'দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড বুক রিভিউ'*-তে। সাজ্জাদ হোসায়েনের *'ওয়েস্টেস অফ টাইম'*-এ আলোচনাটি সংকলিত হয়েছে। এই আলোচনা পড়েও বোঝা যাবে রাজাকারের মন কী ভাবে কাজ করে।**

### MUSLIM NATIONALISM VERSUS BENGALI NATIONALISM
### INTERPRETING THE HISTORY OF BANGLADESH

History of Bangladesh 1704-1971 vols. I-III Ed. by Sirajul Islam Asiatic Society of Bangladesh Dhaka, Bangladesh. 1992, pp. 596, 797 and 820. Each volume Taka 1,000/US$50.00

This book is the fruit of the labours of a large body of scholars, the leading figures in Bangladesh's academic world, assisted by some foreign historians and has been edited by a senior professor of history in the University of Dacca (currently spelt. Dhaka) and, so judged, it is a great disappointment as an academic performance, it is flawed by crude stylistic errors in most of the chapters, which are reinforced by intellectual dishonesty resulting from attempts to give known facts a political slant to support a theory.

Written with a view to justifying the break-up of Pakistan after a fratricidal war, the volumes avoid neither the sin of *suppressio veri* nor the crime of *suggestio falsi* in order that the story narrated might support a hypothesis.The hypothesis is that there has always existed a common Bengali nationalism based on language, a nationalism shared by both Hindus and Muslims. The idea that each community has a distinct and separate cultural identity is rejected as false and unsustainable....

The book is attractively produced and bound. Unfortunately one feels obliged to confess that the expectations aroused by the exterior are not matched by its contents. One is often reminded of a wild fruit which grows plentifully in Bangladesh, comparable to the European colocynth, with an inviting rind but with flesh which is both malodorous and extremely bitter.

There are various reasons for this. One of the most important is language. Apart from the American and British contributors, the writers manage to commit every conceivable sin against grammar and idiom, the worst offender being the editor himself. The liberties he has taken with usage are breath-bereaving. Considering that there is a Bengali edition meant for local readers one supposes that the English edition is intended for those who do not read Bengali and who are likely to be repelled by its stylistic crudities.

As one examines the three volumes one is struck by a confusion in the mind of editorial board as to what they really wanted. The only aim deductible from the introductions by Sirajul Islam and also from the effect that the last chapter in each volume is a kind of summation emphasizing the reality of Bengali nationalism is that the facts marshalled are expected to convince the reader of its truth. They sometimes appear to identify Bangladesh with pre-British Bengal; that is, Suba-i-Bangala which included Bihar and Orissa; sometimes with the presidency of Bengal which continued to have the same boundaries; sometimes with pre-1947 Bengal; sometimes with East Pakistan and sometimes with Bangladesh as it emerged from the separation of East Pakistan from Pakistan in 1971.

In their search for evidence of a common Bengali nationalism cutting across religious and cultural differences between Hindus and Muslims. Sirajul Islam and others from Dacca and Chittagong Universities who wrote under his direcetion explore the whole

area of Bengal. I mean the geographical entity so called, and the only proof for it they succeed in adducing is the agitation of the seventics led by Sheikh Mujibur Rahman. That agitation was of course a historical fact, but they are silent as to why nothing similar arose in West Bengal, and why even after the establishment of Bangladesh in 1971 no Hindu in India showed any interest in seceding from the Union to join a Bengali national state. They would not admit that the separatism which led the Muslims first to support the creation of a province of East Bengal and Assam in 1905, and later to throw themselves heart and soul into the Pakistan movement in the forties, and later still to secede from Pakistan to establish a new state, was essentially an expression of Muslim nationalism.

The debate over Bengali nationalism versus regional Muslim nationalism as the cause of the movement that led to Bangladesh has intrigued many since 1971, but all are or have been until recently agreed that but for the creation of Pakistan in 1947 the area now Bangladesh would have been destined to remain a part of the Indian Union. Some consider the emergence of Bangladesh as a separate state as a fulfilment of what was vaguely referred to in the Lahore Resolution of 1940 as independent states in the north-west and north-east of India. Whether one accepts this view or not, there is no denying the fact that if the Muslim legislators in 1947 had voted not to join Pakistan. East Bengal would today be an integral portion of India. For a little earlier the Congress had rejected the scheme of a Sovereign Bengal outside both India and Pakistan. Its authors were Shahid Suhrawardy and Abul Hashem. The Scheme had received the tacit support of Jinnah and also some local leaders like Sarat Bose. But Gandhi and Nehru set their face against it. Frightened by the prospect of a 'truncated' eastern wing a thousand miles from West Pakistan, even such die-hard Muslim Leaguers as Khwaja Nazimuddin and Fazlur Rahman backed the Sovereign Bengal scheme. This, if it had materialized, would have been a genuinely Bengali state. But the Bengali Hindus decided to listen to Gandhi and Nehru rather than welcome what they could have called a true expression of Bengali nationalism. Its repudiation meant that as far as they were concerned the ties of language mattered to them less than their consciousness of themselves as Indian first.

Yet in the face of these well-known facts Sirajul Islam asserts in the introduction to the first volume that the force of Bengali nationalism would in any case have resulted in the rise of an independent Bangladesh. If there was no trace of this force, as Sirajul Islam calls it in the years from 1901 to 1947, where did he discover it ?

The theoretical hypothesis stated by Sirajul Islam is sought to be fleshed out with proofs by those who write the final chapter in each volume. summing up the arguments for it on political, economic, and cultural grounds A R. Mallick and Syed Anwar Hussain deal with the political aspects of Bengali nationalism, Rehman Sobhan with the economic aspect and Muhammad Shah of Chittagong University with the cultural aspect. Both Mallick and Sobhan are obliged to fall back upon the disaffection of the seventies, the demand for greater autonomy and the complaint about economic disparities as the main basis of their rationalizations of the forces at work against a united Pakistan. Mallick does not go beyond the history of Pakistan years at all, yet according to Sirajul Islam. Bengali nationalism has always been there. Rehman Sobhan in the same way limits himself to the same period to demonstrate what a potent force Bengali nationalism is. If they have to magnify and exaggerate grievances which can be explained differently. Muhammad Shah ties himself into knots by examining the history of Bengali language and literature for proof of a common racial and cultural consciousness. He has a hard time explaining away the hatred for Muslims so pronounced in the novels of Bankim Chatterjee who is known to be the father of Hindu nationalism in Bengal. He hastily moves on to the Pakistani era to discuss the impact of politics on literature and culture Mohammed Shah attributes the rise of Muslim separatism as distinguished from Bengali nationalism to the activities of 'Islamic purists' in the 19th century who considerably purged non-Islamic traditions from Bengali Muslim life'. as though the two communities had never before been conscious of any differences. He refers to the existence of the 'accord' which had continued 'between Hindu and Muslim thoughts' for several centuries. The nature of this accord is not stated. Is the reader to assume, contrary to all evidence, that they worshipped the same deities, observed the same rites, and ate the same food ? How

does he account for the rise of Chaitanya in the 15th century in revolt against Muslim rule ? How would he explain the attempt made by Ganesh in the same century to capture power and re-establish Hindu rule ?

It must be pointed out that the distortion of facts involved in Shah's interpretation concerns two distinct realities one is Muslim nationalism and the other is Muslim separatism. It was not until the thirties of the present century that the idea of a separtate Muslim state on Indian soils arose after all possible avenues of accommodation with the Hindus had been explored and found to lead to a cul-de-sac. But to imply that the Muslims and Hindus had not been conscious of their separate identity until Muslim 'purists' put the notion into the head of their fellow men is to make an observation which had and has no basis in fact.

Shah's distortion is typical of the whole approach in the book. Tapan Raychaudhuri's book *Europe Reconsidered* which he refers to deals with the so-called Hindu Renaissance in the 19th century which led to the emergence of men like Bankim Chandra. Madhusadan. Rabindranath, Bhudev Mukhopadhyaya and Vivekananda who propounded an exclusive Hindu nationalism from which the Muslims were totally excluded. Not that the Muslims can complain about it. What was happening was a natural expression of a feeling of distinctness which runs through the whole of Bengal's history since the arrival of the Muslims. But to admit its existence would be to explode the thesis on which the book rests.

But let us discuss a deeper confusion about the editor's aims. Mallick explains that the choice of 1704 as the date from which to write History of Bangladesh was dictated by two factors one, that at this date the capital of Bengal was transferred from Dacca to Murshidabad; two, that the earlier part of the story had been dealt with adequately in *History of Bengal*, volumes I and II published by the University of Dacca in the forties.

Firstly, there was no Bangladesh in the present geographic sense of the term in 1704. Are they then confusing Bangladesh with Bengal as a whole ? Secondly, if avoidance of repetition is the aim, it should be remembered that the second volume of *Dacca University History* brings the story down to the fall of Sirajuddowla and the advent of British rule. Why has this phase been repeated?

The chapters dealing with social and economic life in Bengal make no distinction between Bangladesh and Bengal. It is when the writers relate the story of the upsurge of 1971 that they shift their vision to the narrower limits.

If the authors aim is to relate the story of rise of Bangladesh in its present form as an independent entity, the transfer of the capital of Bengal from Rajmahal to Dacca decided upon by Islam Khan in 1610 would have been a more appropriate starting point. But it appears from the book's contents that the editors were confused as to how to isolate the history of the present Bangladesh from the history of the larger Bengal, which would bring in West Bengal, without referring to Muslim nationalism whose reality they deny. The chapters do not consequently cohere as a logical narrative. The choice was between adopting the plan of *Dacca University History* of R.C. Majumdar and Jadunath Sarkar in which they make no claim that a common Bengali nationalism existed anywhere and limit themselves to describing what happened within the geographical boundaries of the area called Bengal, or following the plan of Mohar Ali in his *History of the Muslims of Bengal*. The outcome of the plan actually followed is to involve themselves in contradiction at every step, suppression of facts, and distortion and misinterpretation.

The Bengali nationalism they describe in the introductory chapters by Sirajul Islam and the final chapters in each volume runs at cross purposes to much of what has been said by individual contributors like Abdul Karim or Muin-Ud-Din Ahmad Khan. The first discusses Mughal rule, the second religious movements and neither traces the beginnings of a common Bengali nationalism or evidence of a common culture.

As R.C. Majumdar recognizes in his *History of the Freedom Movement in India* (Volume 1), the nationalism that manifested itself during the 19th century. not only in Bengal but also in western India was wholly Hindu in character. Nabogopal, one of its early exponents, maintained that the basis of national unity was Hindu religion. To quote his actual words. "Hindu nationality is not confined to Bengal. It embraces all of Hindu name and Hindu faith throughout the length and breadth of Hindustan; neither geographical position nor the language is counted a disability. The Hindus are destined to be a religious nation.

This is clear and frank, free from political cant and hypoerisy. The incompatibility of the two cultures. Hindu and Muslim, was noted over a thousand years ago by Al-Briruni in his classic on the subcontinent. No scholar has been able to prove that the differences between the two were superficial. Tarachand who made a study of the influence of Islam on Hinduism did not advance the view that in the course of centuries they had come so close as to lose their distinct identity. It was the Hindu politicians who sometimes, especially after the founding of the National Congress, pooh-poohed the idea that there was really any insuperable gulf between them. Jawaharlal Nehru in his Autobiography, written in 1935, astonished his readers by asserting that the only difference between Hindu and Muslim culture that he could notice concerned the shape of the utensils they used ! Yet in his *Discovery of India* published in the midforties, he equated Indian culture with the ancient pre-Muslim culture of the subcontinent.

The absurdity of the thesis which the editors of *History of Bangladesh* take to be axiomatic haunts them on every page.

To read this book is to be reminded from time to time of a famous poem by Racis Thomposon, a nineties poet, called 'The Hound of Heaven', it tells the story of how he was led to faith by the Hound of Heaven which 'with unhurrying feet' pursued him till he surrendered. The editors of *History of Bangladesh* do not surrender, indeed they had resolved not to recognize Islam as a factor in the history of Bengal, but no matter what they do they find it impossible to escape the shadow of that reality. The only course open to them was to suppress facts or to give them a false slant. I shall limit myself to two egregious instances among many others.

One of the major economic reforms attempted by the British was the Permanent Settlement of 1793. More than anything else it was responsible for the ruination of the Muslim aristocracy overnight; practically all landed estates were transfered to the Hindus when the Muslim landlords failed to understand the implications of the sunset law which required them to pay their dues to the government by a certain date. The estates were put up to auction and sold to new bidders who were Hindus. The effect so graphically described by Hunter in his *Indian*

*Mussulmans* resulted in a fundamental change in Bengal's political and cultural landscape, and goes a long way to account for the backwardness of the Muslim community.But to admit that the Settlement caused a shift of economic power from Muslims to Hindus would mean admitting the reality of a group conscious of themselves as a separate entity. This Sirajul Islam would not let himself do. Instead he treats the whole episode as a mere economic event without an impact on the relation between the two major communities. All he says is 'Every issue of the Calcutta Gazette appeared with a long list of estates on sale all over Bengal. The hardest hit section among the Zamindars was the families who controlled about half of the landed resources of Bengal in terms of revenue payable to government. To have mentioned the fact that the families were Muslim would have upset his Marxist interpretation of history.

The Permanent Settlement goes a long way also to explain why the Muslims came to be treated as a political minority in an area where demographically they were preponderant. This was true of Bengal until the Reforms of 1935. All they had dared to ask for under the Bengal pact proposed by C.R. Das was equality in parliament and the services. But even this seemed to the followers of Das so extravagant that no sooner had he died than they repudiated the agreement.

Here is another example of the kind of the distortion that Sirajul Islam's followers employ to give the impression that a common culture had evolved in Bengal. Writing on the Vaishnava movement launched by Chaitanya (1486-1530). Syed Jamil Ahmed of Chittagong University observes '16th century Bengal was swept by the Vaishnava movement of Chaitanya (1486-1530) which brought about revolutionary changes in the social order of the country. It was defiance against Brahmanical ritualism, oppressive caste system and the onslaught of foreign (Turkish) dominance, and propagated a simple yet inspiring faith that love is God. Chaitanya's Vaishnavism had mustered enough support from the people and the elite.' That observation occurs on page 476 in the third volume.

Any outsider who was not familiar with Bengal's history from other sources would suppose that the Sultans who ruled Bengal in the 16th century were still regarded by the population as

foreigners in spite of the fact that they had been in the country for nearly three hundred years and had completely identified themselves with its fortunes that the reform movement of Chaitanya had gained acceptance among all sections including Muslims that Vaishnavism was a more inspiring faith than Islam, both simpler and more egalitarian.

In other words the success of the movement, such as it was, was a reflection of the failure of Islam to offer the population of Bengal a nobler ideal of life than they had known previously.

This judgment is at cross-purposes with the verdict given by Jadunath Sarkar who in the second volume of *Dacca University History of Bengal* argues that the oposite was the truth. Mohar Ali in his observations on the same phenomenon attributes the rise of Vaishnavism to the influence of Islam. He writes 'The impact of Islam on the Hindu society was deep and far-reaching.... Such influcnces led to some reform movements in Hinduism. The most notable of such movements was the Vaishnava movement of Chaitanya during the early sixteenth century (10th century H.). Chaitanya's movement was remarkably influenced by Sufism...' (vol. II. page 975).

The contrast between the two quotations illuminates the technique employed to play down Islam as a force in the history of Bengal.

As I have said, one cannot be sure what the term 'Bangladesh' as used in the book means. Where necessary the writers use it to signify the whole of pre-British Bengal, and sometimes the smaller territory which bears this name politically today. But do what they will, in the final chapters, some myths about Bengal's proverbial prosperity are exploded. P.J. Marshall of London University finds no evidence in his survey of 'General Economic Conditions under the East India Company' to support the view that Bengal was a land overflowing with milk and honey. Akbar Ali Khan also considers the theory of a Golden Bengal to be nothing but a myth. But the contention in Rehman Sobhan's chapter is a tale of unrelieved exploitation which robbed the country (this time, meaning only the present Banglaesh) of all its wealth.

An ambitious project designed to highlight the emergence of Bangladesh as an independent country as an expression of Bengali nationalism, the book fails to carry conviction for a number of reasons.

First, the nationalism they have theorized about has no existence except in the form of two antagonistic nationalism, a Hindu nationalism and a Muslim nationalism whose interplay has coloured the fabric of the life of the areas subsumed under the geographical description of Bengal. It was this fact which led the Muslims to welcome the creation of Eastern Bengal and Assam in 1905 as a means of escaping the oppression of Hindu landlords; it was also the same sentiment which crystallized into the Pakistan movement of the forties. The authors ignore a much simpler explanation of the separatist movement of the seventies which resulted in Bangladesh in 1971. That separatism was an expression of regionalism, a phenomenon also noticeable elsewhere. The Muslims of India had the feeling that they formed one nation, as did the Hindus, but among each group there existed linguistic and ethnic differences, like the difference which divide the Arabs of Syria form those of Saudi Arabia or the Arabs of Morocco from those of Egypt. They all share the same language and the same religion, but their geographical experience is not the same. Neither Hindu nor Muslim nationalism could entirely transcend or outweigh the regional differences which in the case of Pakistan were accentuated by geographical distance. Advantage was taken of this fact by Pakistan's enemies and also by subversive forces within to fuel regional feeling which tore Pakistan apart.

The same forces of regionalism have made their appearance in parts of India, in Nagaland and neighbouring areas and also in the south. The India has not fallen victim to the fate of Pakistan yet is due to the existence of a strong central authority and also the fact that the regions are geographically contiguous. But it must be borne in mind that the demographic composition of the Indian Union, its diversity of language and races, does not materially differ from the composition of Pakistan, neither before the emergence of Bangladesh nor after it. Both states rest upon a nationalism which is derived from religion. Just as the Indians of the south feel themselves to be part of the same organism as the Hindus of the month because of their common loyality to Hinduism, the Muslims of East Pakistan used to have the same feeling towards the Punjab and Sind.

No sooner had Bangladesh been established, and in spite of attempts by those immediately in power in the early seventies to

emphasize the primacy of a conmmon Bengali nationalism, difficulties arose when it was discovered that the appeal to Bengali nationalism inspired no enthusiasm among the Muslim masses, Basant Chatterjee, the Indian journalist who visited Bangladesh in 1972 was struck by the folly of invoking Bengali nationalism and at the same time speaking of the right of Bangladesh to retain its identity as a separate state outside India where a large section of Bengalis lived. He said so in his book 'Inside Bangladesh' and challenged the right of the Muslims to call themselves Bengalis at all. The Bengali language, he declared, had been used as political weapon in the struggle against Pakistan, and with the establishment of Bangladesh its usefulness had been exhausted. The Muslims, he went on to say, had made no contribution to the culture called Bengali culture which was essentially an upper caste Hindu culture. He said that it would be impossible for Banglaesh to preserve its sovereignty by insisting on the Bengali-ness of its political character. He prophesied that if the state really wanted to stay outside the political and cultural orbit of India it would be forced to adopt Urdu of all languages as its national language !

When Ziaur Rahman came to power in 1975, he understood the paradox at the root of Bangladesh's ideological foundations and offered Bangladeshi nationalism as he solution.

Bangladeshi nationalism as a description of the feeling of political cohesion which inspires Bangladeshis to be pround of their separateness could only mean the nationalism of its Muslims who constitute more than 85 percent of the country's population. This was an excellent compromise between those secularists who would not favour any description which savoured of religion and those who understood that when a nationalism is linked to the name of a country it can only mean the nationalism of the majority of its population. French nationalism implies not the nationalism of Algerian immigrants settled in France but the national feeling of those Frenchmen who once were affiliated to the Catholic Church.

It is on the basis of Ziaur Rahman's compromise that Bangladesh has been able to achieve a measure of stability. But even this indirect acceptance of the reality of Bangladesh's character as a Muslim country with Muslim traditions in art, literature and social life, is not to the liking of the authors of Sirajul Islam's History. The reader notices with surprise that

Bangladeshi nationalism is not mentioned at all. This ambiguity in their intentions vitiates their handling of facts and accounts for deliberate attempts such as those I have instanced to distort its history.

The second important reason why this book would not carry conviction is that the constant shifts of perspective from the narrow boundaries of present-day Bangladsh to several phases of historical Bengal rob the book of unity of outlook and expose the tricks they, I mean the authors, have resorted to to disguise the truth that since the 13th century Islam has been the single most important factor in its politics culture and social life.

The third reason why this book seems a pitiful accademic excreise is that even from the point of view that Mallick and Sirajul Islam appear to have tried to project, it has not been well planned. The contributor contradict one another in their treatment of economic, political and social history. On the one hand they insist on the existence of a common Bengali nationalism, on the other hand they are obliged to refer to differences between Hindu and Muslim cultures.

One of the significant ironies concerning the book is that it is dedicated to the memory of the late Fazlur Rahman who was one of the key figures in the Muslim League movement in Bengal. The book is a plain repudiation of everything that Fazlur Rahman stood for. He was Pakistan's first eduction minister after its establishment and never wavered in his loyalty to the Quaid-i-Azam or the Two-Nation theory. The thesis that Sirajul Islam has tried to advance would make him squirm in his grave. But his sons. Sohail Rahman and Salman Rahman who paid the entire cost of the book's publication amounting to several hundred thousand Taka have or appear to have so changed their political and cultural loyalties that they thought it no affront to their father's memory to pay for a book which misinterprets everything that Fazlur Rahman believed in. This is an irony, no doubt, but an irony symptomatic of the change that has occurred in this country's psychological landscape.

Syed Sajjad Hussain

The Muslim world Book Review, vol 14, no. 2, Winter, 1994. (The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, Leicester, U.K.)

# পরিশিষ্ট : ৬

হামিদুল হক চৌধুরী ও মাহমুদ আলী হানাদার পাকিস্তানীদের পক্ষে প্রচারের জন্য বিদেশ গিয়েছিলেন। লন্ডনে প্যাকিস্তানী দূতাবাস থেকে তাদের যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার রশিদ।

No. MOC/7/71
11th August, 1971

The following further payments may be made to Mr. Hamidul Haq Choudhury and Mr. Mahmood Ali.

a) £. 75/- each as contingencies for entertertainment chargeable to the Government.

b) £. 50/- each to be refunded in Pakistan currency on their return.

c) D.A. for transit and stay at London as admissible to catogery 1 officitals.

2. Sanction in respect of admisssibility of TA & DA at category I officiale is SSP/69/71 dated 19th June 1971.

3. Sanctin for payment of refundable and non-refundable foreign exchange has not been received but instructions are contained in telegram No. 5981 dated 10th August 1971 for the Ministry of Foreign Affairs.

4. Expenture is debitable to 35-FA. B-2-Dalegation to UN and Other International Conferences etc.

(Bakhtiar Ali)
Head of Chan

## পরিশিষ্ট : ৭

### জেনারেল ফরমান আলীর ডায়েরির একটি পাতা

**COMD**

{1. Nizamuddin — motivated news + [API.]
{2.

13/12/71

✓ Requisitioning — Payments

~~3. [illegible] — [illegible]~~

4. Provincial Info Board

**COMD**

5. Offrs / employees to be used for watching
Volunteer Police / Union members to be involved

6. Fictitious Identity Cards. Old Identity Cards to be counter-signed Issuing authority to be responsible

Minister Shamsul Haque
— A. R. Director —     Major Rushtaq, Sector 6.

Lt Col – Web[illegible] (Col (Gen)) 1230 hrs.

7. Capt Tahir Vehicle for Al-Badar
8 Razakars — being killed
Better arms Police to be withdrawn
9. Use of Al-Badar —
10 IB

# পরিশিষ্ট : ৮

আলবদর বাহিনীর হাইকমাণ্ডের সদস্য আশরাফুজ্জামানের ডায়েরির একটি পাতা

APRIL 1971

9 Friday

Md. Shahidur Rahman
Hydrographic Sec.
IWTA Dacca.
Moon Mansion
4th floor.

Wasil Ahmad Bengali
36E UQ
Dr. Faizul Mohi IER
10 Saturday 35-G UQ
Dr. Latif IER
31E UQ
Munir Chy. Bengali
Kabir Chy.
Dr. Muniruzzaman Geography
Sadruddin Sociology
16 D UQ

APRIL 1971

11 Sunday

A.N.M. Shahidullah Mathematics
12 D UQ
Dr. Serajul Islam [illegible] History
Dr. Murtaza
14 A UQ
Dr. Akhtar Ahmed IER
11-D UQ
Dr. Abul Khair History
25 B
Giasuddin History
12 Monday
Zahirul Haque Philosophy
H.H. Hall
Ahsanul Haque English
Dr. Serajul Islam Chy.
M. Haider Chy. Bengali
14-F
Anwar Pasha
30-E
Rashidul Hasan English
Abu Hena Mostafa Kamal [illegible] Bengali

PERSONAL MEMORANDA

The Diary belongs to
Name Md. Abdul Bari
Address Bagrakal, Jamalpur

28-11-71

[illegible]

The Daily Progress of Pakistan Islami Chhatra Sangha, Jamal pur Unit.
Date- 26-11-71. Friday.

MD. ABDUL BARI
Pakistan Islami Chhatra Sangha.
Jamal pur, Mymensingh.

## পরিশিষ্ট : ৯

### জিলা রাজাকার প্রধানের নির্দেশ

MOVEMENT ORDER.

Mvi. Md. Serjul Islam is hereby detailed to report to Taltola camp immediately to impart motivation training to the embodied Razakars to the camp.

This issues with the approval of the A. S. M. L. A. Tangail, Raz. Md. Habibullah Bahar S/O Serajul Islam is also directed.

## পরিশিষ্ট : ১০

### জনৈক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারের সনদপত্র

EASTERN COMMAND
RAZAKAR BATTLE TRANING SCHOOL
PRORICIENCY CERTIFICATE

This is to certify that Razakar No.... Name RAKIBUDDIN... S/O late. HAJI TUFAZUDDIN MULLA, P.S. DAULATPUR... Sub div. KHULNA SADAR District. KHULNA attended RAZAKAR PLATOON JESSORE COMMANDERS COURSE held at Army Battle School from 03 Nov. 71 to 17 Nov. 81.

1. General Remarks
Well motivated, hardworking and religious minded student who is expected to do well as pl comd.
2. Standard achieved
Fit to be Razakar P/Comd.
3. Grading
Average

Sd/-
Major
Comdt
Initials of Student—(Rokibuddin)Army Battle School
(Nazar Hussain)

[ পরিশিষ্ট ১—৫ ও ৭—১০-এর উৎস আবু সইয়িদ রচিত *সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম*'–ঢাকা। ]

# পরিশিষ্ট : ১১

[ হাইকোর্টের বিচারপতিদের রায়ের অংশ। হাইকোর্ট খালেক মজুমদারকে খালাসের নির্দেশ দিয়েছিল ]

(b) Not a single witness to whom allegedly P.W.1 and 2 had stated that they recognised the face of one miscreant was examined.

(c) The independent witnesses P.Ws. 4,5 and 6 did not say that P.W. 1, 2 or 7, 8 and 9 had stated to them that they recognised one by face.

(d) Publication of photograph of Abdul Khaleque on 23rd December, 1971 has dominated the mind and judgment of the witness and therefore deposing at a much later period in July 1972 they were obsessed with the idea that this was the man who must have committed the murder.

(e) That Abdul Khaleque had a beard or a mole on his cheek was not mentioned by evidence save and except P.W. 9 that he had a mole on his cheek. We do not like to hazard any opinion but apparently from the photograph it seems that Abdul Khaleque had a mole on his cheek. Then the beard of Abdul Khaleque had a busy beard and if Abdul Khaleque was a man who came to kidnap Shahidullah Kaiser then it is beyond comprehention as to why the prosecution witnesses did not mention in the F.I.R. that one bearded man was with the kidnappers.

(f) Circumstances showing that Abdul Khaleque was a member of Jamat-e-Islami dominated the mind and judgment of the prosecution witnesses because impresion was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the liberation. Be that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasoning of the witness.

(g) Publication by the newspaper as to how he was arrested where he was arrested and what he stated and what he did not say had a cumulative effect which reflected in the evidence of the prosecution witnesses.

(h) Possession of licence of revolver by Abdul Khaleque and evidence of Habibur Rahman that he pointed out at him while he was late in opening the door was responsible for a knowledge that Abdul Khaleque was man of desparete characer. Even assuming that Abdul Khaleque was a man of such disposition the question is whether he displayed such attitude with whle kidnapping the accused Shahidullah Kaiser. Not a single witness stated that a bearded man was armed with revolver. Then the probable argument could he advanced fixing the identity of the accused. The trial court itself has found that there was no other over act by Abdul Khaleqne which would show that he acted as a culprit within the meaning of P.O.

(i) None of the witnesses have proved that he was Al-Badar Bahini.

(j) None of the members of Mukti Bahini who apprehended the accused at Malibag was examined and therefore the evidence that P Ws. 1 and 2 had identified on the spot remains uncorroborated.

In the circumstances, therefore, the opinion is that doubt has crept in into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give him benefit of doubt and the accused appellant is acquitted and it is directed that he be set at liberty if not wanted in any other connection.

In the result the appeal is allowed.

The Rule of enhancement being criminal Revision No. 220 of 972 is accordingly disposed of.

Badrul Haider Chowdhury

SIDDIQUE AHMED CHOWDHURY, J.

Quader/11.8.76. I agree.

Siddique Ahmed Chowdhury.

উৎস খালেক মজুমদার, শিকলপরার দিনগুলো, দ্বিতীয় খণ্ড।

# পরিশিষ্ট : ১২

## কেন্দ্রিয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আইনউদ্দিনের চিঠি

No. 588 C.P.C. Dated 13.9.71
To
Captain M. Ilyas Khan
Rajshahi University Campus,

Dear Sir,

I write to state on Mvi. Ibrahim of Ramchandrapur, P.S. Paba, Rajshahi, is a very notorious type of Awami Leagor, who worked against Pakistan, instigated to fight against Pak-Army, created hatred between local and non-local Muslims. He was one of the greatest exponent of "Joy Bangla. He along with his followers created panic throughout the entire area by threat and intimedation. He and his followers killed our relatives of the Peace Committee. They also attacked and set fire to the house of Chairman, Parila Union Peace Committee and looted away everything. After this incident, you were kind enough to send a group of Mujahid who went there and arrested said Ibrahim Moulvi and handed him over to you. But he was latter released from the University, went back to Ramchandrapur, called a public meeting and decided to launch movement against the present govt. It is reliapty learnt that he and his followers are responsible in darmaging the Rly. Track near University, set fire to the T.D.R. office at Kharkhari day before yesterday. Last night also they have destroyed the Union Council office at Ramchandrapur and attacked Rahanhat villlage. Rahanhat village people apprehend that they may attacked their village this night.

I threfore, request you to be good enough to send a group of Mujahid to the said village and direct them to arrest the following persons

1) Moulvi Ibrahim of Koipukuria.

2) Ajmat Ali of Palashbari, Secretary, Union Council, Parila.
3) Abdus Sattar of Parila.
4) Abdullah of Saranpur.
5) Abdul Baki of Parila.
6) Ataur Rahman of Parila.
7) Nurul Islam of Parila
8) Kamal of Parila.
9) Abasar of Saranpur.
10) Rahman, S/O. Soleman of Ramchandrapur, all of p.s. Paba, Dist. Rajshahi.

Thanking you,
Yours faithfully,
(Md. Ayenuddin)
Chairman,
Central Peace Committee, Rajshahi.
13.9.71.

From
Md. Ayenuddin
Chairman
Central peace committee. Rajshahi.
No. C.P.c. Date. 29-7-71.

To
The Asstt. Director,
Central Intelligance Branch, Kumarpara,
Rajshahi.

Dear Sir,

Enclosed please find an annanymous pitition which will speak for itself.

Yours faithfully,
(Md. Ayenuddin)
Chairman.
Central Peace Committe, Rajshahi.
29-7-71.

English translation of a letter received from a Muslim Leagor.

"On the appeal of Mr. Ayenuddin we casted our votes in favour of Muslim league. The result is that our houss have looted and took away cash Rs. 900/=. Still we were living some how,

but now it is not possible to live there for cruelty of Awami Leagors and so-called 'Mukti Fous. All peace Committee Members and Muslim Leagors have been killed. We do not want Joy Bangla. Only 2% people want Joy Bangla. of one 1/2 is Muktifous and the rest half is their helpers so. called Refugees from Mursidabad the heirs of Mirzafar. It is suggested that all transistors be withdrawn from their houses so that they may not hear Air India.

Villagers of Dashmari and Khujapura, P.s. Paba.

(মরহুম আতাউর রহমানের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

*উৎস : মনসুর আহমদ খান সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী, ঢাকা, ১৯৯৪।*

# পরিশিষ্ট : ১৩

৩ জন শান্তিকমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যানের কাছে ১৩-৬-৭১ লিখিত রাজশাহী কেন্দ্রিয় শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আইনউদ্দীনের চিঠি।

Never try to mixup wrong with right and do not'try to conceat the truth Intentionally-Al-Quran.

From. Ayenuddin

Chairman,

CENTRAL PEACE COMMITEE, RAJSHAHI.

Date

**Never try to mixup wrong with right and do not try to conceal the truth intentionally — Al-Quran.-**

**From .** *Ayenuddin*
***Chairman,***

**CENTRAL PEACE COMMITEE, RAJSHAHI.**

Date 13/6/71

To

(1) Mr. Selabuddin Ahmed, Advocate
Member, Paba Thana peace committee.

(2) Abdul Kabir Chowdhury
Chairman, Haragram Union peace Committee

(3) Abdul Haque
Member, Haragram P.C.

you are requested kindly to round up the following persons and to produce them before Captain Ilias in University Campus.

you are further authorised to search houses of these persons.

(1) Dargai Shamsuddin of
(2) Abdul Aziz Munshi of Murari
P.S. Paba, Rajshahi.

Md. Ayenuddin

উৎস ঃ মনসুর আহমদ খান, মুক্তিযুদ্ধ রাজশাহী, ঢাকা, ১৯৯৪।

## পরিশিষ্ট : ১৪

জাতীয় গণতদন্ত কমিশন, একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট (সংক্ষিপ্ত ভাষ্য)-এ আব্বাস আলী খান সম্পর্কিত রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৯৪।

আব্বাস আলী খান জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর। গোলাম অআযমকে প্রকাশ্যে আমীর ঘোষণা করার আগে তিনি জামাতের ভারপ্রাপ্ত আমীর–এর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্বাস আলী খানের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং বাঙালী জাতিসত্তা বিরোধী। তিনি তখন পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর সহকারী প্রধান ছিলেন। এই সময় আব্বাস আলী খান মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যে গঠিত আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সকল বাহিনীর সহযোগিতায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ৩০ লক্ষ নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিকামী মানুষকে হত্যা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্বাস আলী খান বহু সভা, সমাবেশ, মিছিল করে, পত্রিকায় বিবৃতি বক্তব্য প্রদান এবং নিবন্ধ রচনা করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে সমর্থন ও প্ররোচিত করেছেন। পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনী যে শান্তি কমিটির সহযোগিতায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে আব্বাস আলী খান সেই শান্তি কমিটিরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার নেতৃত্বাধীন রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ সামরিক বাহিনীর সদস্যের সমান ক্ষমতা দিয়ে সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রশিক্ষণের পরে তারা গ্রামে গিয়ে ব্যাপক লুটতরাজ করতো, নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করতো এবং নারী নির্যাতন চালাতো।

১৯৭১ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্র–পত্রিকা এবং সমকালীন ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধে আব্বাস আলী খানের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে জানা গেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বগুড়ার আব্বাস আলী খান ইয়াহিয়া খানের তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং মালেক মন্ত্রিসভার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি এই মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একাত্তরের অন্যতম প্রধান যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা গোলাম আযম এই মন্ত্রীসভাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'শান্তি কমিটি এতদিন এ ব্যাপারে যা করতে পেরেছে, মন্ত্রিগণ তার চেয়েও অধিক কাজ করতে পারে বলে আমি আশা করি।' (তথ্যসূত্র ঃ ১৯৭১ ঘাতক দালালদের বক্তৃতা ও বিবৃতি, সাঈদুজ্জামান রওশন, পৃঃ ৪৫)। ২৫ সেপ্টেম্বর হোটেল এম্পায়ারে ঢাকা শহর জামাতের দেয়া সংবর্ধনা সভায় গোলাম আযম মন্ত্রিপরিষদকে অভিনন্দন জানিয়ে আরো বলেন, 'জামাতে ইসলামী পাকিস্তান ও ইসলামকে এক ও অভিন্ন মনে করে। পাকিস্তান সারা বিশ্ব মুসলিমের ঘর। কাজেই পাকিস্তান যদি না থাকে, তাহলে জামাতের কর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা মনে করে না। তাই জামাতের কর্মীরা জীবন বিপন্ন করে

পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার কাজ শান্তি কমিটির মাধ্যমে, রাজাকার ও আলবদরে নেতা পাঠিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে। এবং একই উদ্দেশ্যে দু'জন সিনিয়ার নেতাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণেও বাধ্য করেছে। এই মন্ত্রীরা যেন জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সব কিছু করেন।' (তথ্যসূত্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭)। গোলাম আযমের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে দলীয় প্রধানের নির্দেশ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আব্বাস আলী খান একই দিনে বলেন, 'প্রতি কারবালার পরই ইসলাম জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমাদের সামনে আরও কারবালা আছে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭)।

আব্বাস আলী খান ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহসিন হল পরিদর্শন করতে গিয়ে, ২২ সেপ্টেম্বর জামাতীদের দেয়া সংবর্ধনা সভায় এবং ২৪ সেপ্টেম্বর তেজগাঁর অপর এক সংবর্ধনা সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী বক্তব্য রাখেন। ২৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এতে আর কোন সন্দেহ নাই যে, তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার হীন মতলবে ভারতীয় সেনাবাহিনী কয়েকটি ফ্রন্টে নির্লজ্জ হামলা শুরু করেছে। সশস্ত্র বাহিনী একাই কোন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না। প্রিয় পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের জওয়ানদের হাতকে শক্তিশালী করা এ সময়ে প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।' স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে। এদেরকে নির্মূল করার ব্যাপারে আপনারা সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটিসমূহকে সহায়তা করুন।' (প্রাগুক্ত)। ১০ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ শুরু করার মাত্র চারদিন আগে তিনি এক ভাষণে বলেন, 'বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২১৩ জন। বিপক্ষ কুরাইশদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। তের কোটি মানুষ এই পুণ্যভূমি রক্ষার জন্য প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আছে।....গুজব রটনাকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, হিন্দুস্থান অথবা কল্পনা রাজ্যের তথাকথিত বাংলাদেশের স্বপক্ষে প্রচারণাকারীরা আমাদের দুশমন। তাদের পতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। প্রথম সুযোগেই তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিন। আমাদের রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনীগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ রক্ষার কাজে নেমে পড় ন।.....

আল্লাহতালা অমাদের মদদ করুন।' (প্রাগুক্ত)।

ডিসেম্বরে ডাঃ মালেকের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের সভায় 'যুদ্ধ প্রচেস্টা' জোরদার করার লক্ষ্যে কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। আব্বাস আলী খান ও এস এম সোলায়মানকে নিয়ে তথ্যবিষয়ক সাবকমিটি গঠন করা হয়।

একাত্তরের ঘাতকদের অন্যতম নেতা আব্বাস আলী খান মুক্তিযুদ্ধের পরেও বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্য এবং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৮০ সালে দলের পক্ষে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে একাত্তরে তার অপতৎপরতার কাজের জন্যে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়ে বরং ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন, '৭১ এ আমরা যা করেছি ঠিক করেছি।' (একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, পৃঃ ৬৩)। আব্বাস আলী খান এখনও একাত্তরের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বাঙালী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন এবং বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে রূপান্তরিত করতে চাইছেন।